মরণের পরে কি হবে?
বা
দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি

মূল

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)

ও

মাওলানা মুফতী মোঃ আশেকে এলাহী বুলন্দশহ্‌রী
মোহাজেরে মদনী

বাংলা রূপায়ন

আবু সাঈদ মোঃ হাবিবুল্লাহ খান এম. এম

শর্মিণা লাইব্রেরী

বুক্‌স এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

অধমের প্রমাতামহ, যার নাম আপন অঙ্গে ধারণ করে,
পাক ভারতের অসংখ্য প্রতিষ্ঠান হয়েছে ধন্য।

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রীযুক্ত নামের, ধুতি পরা অজস্র কুসংস্কারচ্ছন্ন, অজ্ঞ মুসলমান যার পরশে হয়েছে, ইসলামের এক একজন সাচ্চা মোবাল্লেগ ও মরদে মুজাহীদ।

সেই অমিততেজা কর্মবীর, মহান সাধক ও সংস্কারক শর্ষীণার মরহুম দাদা হুজুর "আলহাজ্জ হযরত মাওঃ শাহ্ সূফী নেছার উদ্দীন আহমদ সাহেব (রহঃ)" কে—

ইয়া আল্লাহ! তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।
আমীন!

بسم الله الرحمن الرحيم

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم *

মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহের বদৌলতে তরুন যুবা বয়সেই এ অধম লেখা লেখিতে হাতে খড়ি নেই। সে সময়ে প্রথমে "আহওয়ালে বরযখ (কবরের জীবন)" এর দু'বছর পর "আহওয়ালে জাহান্নাম (দোযখের পকৃতি)" নামক দু'টি পুস্তিকা প্রণয়ন করি। অতঃপর বেশ কয়েক বছর পর "আহওয়ালে ইয়াওমুল কিয়ামাহ (কেয়ামত ও হাশরের ময়দান)" এবং অবশেষে এর দু'চার বছর পর "জান্নাত কি নেআ'মতী (বেহেশতের সুখ শান্তি)" নামক আরো দু'টো পুস্তক সঙ্কলন করি। এ চার পস্তিকায় মুত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অবস্থাসমূহ সবিস্তারিত সঙ্কলিত হয়েছে। বিশ্ব বিধাতা মহান আল্লাহ তাআ'লার অশেষ শুকরিয়া; অন্তদৃষ্টি অর্জন ও উপদেশ আহরণের জন্য এ এক উৎকৃষ্টতর অনন্য উপঢৌকনে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এ পুস্তকগুলোতে যা কিছু সমাবেশ ঘটিয়েছি, তা সবই বিজ্ঞানপূর্ণ কোরআন ও রাসূল (সঃ)-এর পবিত্র হাদীস ভিন্ন আর কিছু নয়। মহান আল্লাহ তাআ'লার অপার মহানুভবতা যে, তিনি আমায় কোরআন ও হাদীস অধ্যায়ন এবং তদ্দ্বারা কিছু কিছু সংকলন ও সাহিত্য চর্চার সামর্থ্য যুগিয়ে এরূপ গ্রন্থাবলী প্রণয়নের সক্ষমতা দান করেছেন, যা সুধি মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমি আশান্বিত যে, আমার এ প্রয়াসগুলো মহান সত্ত্বা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সমীপেও স্বীকৃতি লাভে ধন্য হবে ইন্‌শাআ'ল্লাহ।

আলোচিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সমন্বিতরূপ "মরণের পরে কি হবে (বা দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি)" পাক ভারতের বহুসংখ্যক প্রকাশকই প্রকাশ করে চলেছেন। তবে সাথে সাথে এও পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, কিছু কিছু প্রকাশক এতে বেশ কম করাও শুরু করেছেন। কেউ এর কিছু অংশ ছেড়ে দিচ্ছেন, কেউ বা নিজেদের খেয়াল খুশি মত অন্য কিছু জুড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত মূল বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তন করে ফেলছেন।

এমতাবস্থায় আমার ইচ্ছা হল, উক্ত চারটি পুস্তকের পুনঃ সংস্কার করি এবং পূর্বোলিখিত উদ্ধৃতিসমূদয় পূণর্স্থাপন করে গ্রন্থের পূর্বতন রূপাকৃতি ফিরিয়ে আনি।

আর প্রকাশের জন্য এমনসব প্রকাশকদের দায়িত্বভার অর্পণ করি, যাদের সংকোচন কিংবা সংযোজনের অভিলাস নেই।

গ্রন্থ প্রণয়নের প্রথমাবস্থায় সূত্র উপস্থাপনে হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থের শুধু নাম উল্লেখ করেছিলাম, পৃষ্ঠা উল্লেখের প্রতি খুব একটা মনোনিবেশ করিনি। তবে এ সংস্করণে সূত্র গ্রন্থগুলোর জেল্দ ও পৃষ্ঠা নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশের ক্ষেত্রে তাফসীর গ্রন্থ— তাফসীরে ইবনে কাছীর, দুররে মানসূর ও বয়ানুল কোরআন এবং হাদীস গ্রন্থ– মেশকাতুল মাসাবীহ ও আত্তারগীব অত্তারহীব থেকে চয়ন করেছি। আর আহ্ওয়ালে বরযখের প্রায় অর্ধাংশ পর্যন্ত আল্লামা সুয়ূতী (রহ)-এর শরহে সুদূরের উদ্ধৃতিই পেশ করেছি এবং এর সব সূত্রই উল্লেখ করেছি। মেশকাতুল মাসাবীহ ও আত্তারগীব অত্তারহীব গ্রন্থদ্বয় যেহেতু প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পাঠ্য হাদীস গ্রন্থ, তাই সূত্র উল্লেখের সময় এর পৃষ্ঠাও লিখে দিয়েছি। আর এ গ্রন্থ দু'য়ের প্রণেতাদ্বয় যেসব গ্রন্থ থেকে হাদীসগুলো সংগ্রহ করেছেন, তারও নাম উল্লেখ করেছি। যাতে সুধি পাঠকমণ্ডলী সরাসরি সেসব গ্রন্থও অধ্যায়ন করতে পারেন।

এ গ্রন্থের ধারা বিন্যাস হবে এরূপ– প্রথমে "আহ্ওয়ালে বরযখ (কবরের জীবন)," এর পর "ময়দানে হাশর (কেয়ামত ও হাশরের ময়দান)," অতঃপর "আহ্ওয়ালে জাহান্নাম (দোযখের আযাব)," সবশেষে "জান্নাতের নেআ'মত (বেহেশতের সুখ শান্তি)।"

এ গ্রন্থ নিজে এবং প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে বেশি বেশি পাঠ করুণ। মজলিস ও মাহ্ফিলে আলোচনা করুণ। মহান আল্লাহ তাঁর সেবকের এ পরিশ্রমটুকু কবুল করুন এবং সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে পারলৌকিক চিন্তার অবকাশ প্রদান করুণ। আমীন! وبالله التوفيق

নগণ্য বান্দা

মোঃ আশেকে এলাহী বুলন্দ শহ্‌রী

মদীনা মোনাওয়ারা

৪ঠা রবিউ'ল আউওয়াল

১৪০৬ হিঃ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আহওয়ালে বরযখ বা কবরের জীবন

কবর জীবনে যা হবে

দ্বিতীয় অধ্যায়
কেয়ামত ও হাশরের ময়দান

তৃতীয় অধ্যায়

আহওয়ালে জাহান্নাম বা দোযখের আযাব

চতুর্থ অধ্যায়
জান্নাতের নেয়াআ'মত বা বেহেশতের সুখ শান্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

মরণের পরে কি হবে?
বা
দোযখের আযাব ও বেহেশতের সুখ শান্তি

প্রথম অধ্যায়
আহ্ওয়ালে বরযখ বা কবরের জীবন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ *

সকল প্রশংসা পরওয়ারদেগারে আ'লম আল্লাহ্ তাআ'লার জন্য নিবেদিত। আর সালাত ও সালাম পেশ করছি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ মানব আমাদের এবং সব নবী-রাসূলের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি। আর কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর অনুসারী হবেন তাদের প্রতি।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, যদিও মৃত্যুর পর মানুষকে আমরা পচনশীল লাশ মনে করি, আসলে তারা লাশ নয় বরং জীবিতই থাকে। তবে তাদের জীবন আমাদের এ পার্থিব জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃতের হাড় ভাঙ্গা জীবিতদের হাড় ভাঙ্গার মতই।" —মেশকাত, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও মালেক।

মহানবী (সঃ) কোন এক সময় আমর ইবনে হযম (রা)-কে একটি কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ "এ কবরে সমাহিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না।" —মেশকাত।

মৃত্যুর পর মানুষ এ পার্থিব জগৎ হতে পরজগতে চলে যায়। তাকে কবরে সমাহিত করা না হলে, বা চিতার আগুনে জ্বালান না হলেও তার স্থান হয় পরলোকে। সেখানে অবস্থানকালে তার চেতনা উপলব্ধিও থাকে বিদ্যমান।

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত লাশ চৌখাটে রেখে কবরস্থানে নেয়ার জন্য মানুষ যখন তা কাঁধে বহন করে, তখন সে পুণ্যবান হলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তাহলে স্বীয় পরিবার পরিজনকে বলে, হায়! আমার ধ্বংস, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া প্রত্যেক প্রাণী তার একথা শুনতে পায়। আর মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তবে অবশ্যই সে বেহুশ হয়ে পরত।" —বোখারী।

মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যে সময়কাল অতিবাহিত হয়, একে বরযখ বা কবরের জীবন বলা হয়। বরযখ শব্দের আভিধানিক অর্থ– পর্দা বা আড়াল। যেহেতু এ সময় কালটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল বিশেষ, এজন্যই একে বরযখ বলা হয়।

সাধারণত মানুষ যেহেতু তাদের মৃতদেরকে কবরে সমাহিত করে, সেহেতু হাদীসের ভাষায় বরযখকালের শান্তি ও শাস্তিকে কবর আযাব নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মর্ম এ নয় যে, যেসব মৃতকে আগুনে জ্বালান হয়, বা গভীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, তারা বরযখের সময়কালে জীবন্ত থাকে না। আসলে তারাও বরযখে জীবন্ত কাল কাটায়। তারা হয় শান্তিতে, অথবা শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকে। যারা কাফের ও মুশরেক অবস্থায় মারা যায়, তারা বরযখের জীবনে কোন আরাম বা শান্তি ভোগ করতে পারে না। তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি আর শাস্তি। আল্লাহ্ তাআ'লা মানব দেহের জলন্ত ভস্ম একত্রিত করেও শান্তি বা শাস্তি দিতে পুরো মাত্রায় সক্ষম। হাদীসে আছে, পূর্ব যমানায় এক ব্যক্তি খুবই গুনাহের কাজ করত। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে সে পুত্রগণকে এ ওসিয়ত করল যে, তোমরা আমার মরদেহটি আগুনে জালিয়ে দেবে, আর আমার ছাইভস্মের অর্ধেক বায়ুমণ্ডলে উড়িয়ে দেবে এবং বাকী অর্ধেক সমুদ্রের গভীর পানিতে মিশিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। এরপর সে আরো বলল, আল্লাহ্ তাআ'লা যদি এরপরও আমাকে জীবিত করতে সক্ষম হন, তাহলে অবশ্যই আমাকে এমন কঠোর শাস্তি দেবেন, যা আমাকে ছাড়া ত্রিভুবনে আর কাউকে দেবেন না।

লোকটির মৃত্যুর পর পুত্রগণ পিতার অন্তিমকালের ওসিয়তমত কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা সমুদ্রকে ঐ ব্যক্তির দেহ ভস্মগুলোকে একত্রিত করার নির্দেশ দিলে সমুদ্র তা একত্রিত করল। এমনিভাবে স্থলভাগের বায়ুমণ্ডলকে ভস্মগুলো একত্রিত করার নির্দেশ দিলে সে-ও তা একত্রিত করল। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা উভয় স্থানের ভস্ম একত্রিত করে তাকে জীবিত করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এমন ওসিয়ত কেন করলে? সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি যে তোমার শাস্তির ভয়ে এরূপ করেছি, তাতো তুমি ভালভাবেই অবগত আছ। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা একে ক্ষমা করে দেন।

—বোখারী, মুসলিম।

হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এও জানা যায় যে, মৃত্যুর পর মুমিন বান্দাগণ একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন। আর নবাগত মৃত মুমিন ব্যক্তির কাছে অপরাপর মুমিন ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করে– অমুকের অবস্থা কি, সে কি অবস্থায় আছে?

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলতেন, কারো মৃত্যু হলে কবরের জীবনে তার মৃত সন্তানগণ তাকে এমনভবে সম্বর্ধনা জানায়, যেরূপ পার্থিব জীবনে কোন বহিরাগত লোককে সম্বর্ধনা জানান হয়। —শরহে সুদুর।

হযরত ছাবেত বানানী (র) বলেছেন, কারো মৃত্যুর পর কবর জীবনে তার পূর্বে মৃত নিকটাত্মীয়গণ তার কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরে। তারা পরস্পর এত বেশী খুশী হয়, যেমন পার্থিব জীবনে বহিরাগত কারো আগমন হলে তার সাথে সাক্ষাতে খুশী হয়ে থাকে। —শরহে সুদূর।

হযরত কায়েস ইবনে কোবায়সাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ কেউ মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ না করলে তাকে অন্যান্য মৃতদের সাথে কথোপকথনের অনুমতি দেয়া হয় না। জনৈক সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মৃতের সাথে কি অন্যান্য মৃতরাও কথা বলতে পারে ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হাঁ কথা তো বলেই, তদুপরি তাদের পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাতও হয়। —শরহে সুদুর, বুশরাল কাতীব বিলিকায়েল হাবীব– সুয়ুতী।

নবীপত্নী হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তার কবরের পাশে বসে, কবরে সমাহিত ব্যক্তি তাকে তার সালামের জওয়াব দেয় এবং যিয়ারত কারী চলে আসা পর্যন্ত তাকে চিনতে ও বুঝতে সক্ষম হয়। —ইবনে আবি দুনিয়া ও শরহে সুদূর।

হযরত উম্মে বাশার (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারে ? তিনি বললেন ঃ তোমার কল্যাণ হোক, মুতমাঈন আত্মা (বা যেসব মুমিনের আত্মা আল্লাহ্ তাআ'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তা) জান্নাতে সবুজ পাখীর হৃদয় অভ্যন্তরে অবস্থান করে। এখন বুঝে নাও পাখীরা যদি বৃক্ষে থাকতে একে অপরকে চিনতে পারে, তাহলে মুমিনের আত্মাসমূহও একে অপরকে চিনে নিতে পারবে। —ইবনে সায়াদ, শরহে সুদুর।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোরআন মজীদ পাঠ শিক্ষা শুরু করে শেষ করার পূর্বেই মারা যায়, কবরে একজন ফেরেশতা তাকে কোরআন মজীদ শিক্ষা দেন। আর সে আল্লাহ তাআ'লার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন সে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদের হাফেজ হবে। —শরহে সুদুর।

যারা এ পার্থিব জীবন পুণ্যময় কর্মে অতিবাহিত করেন এবং মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, এ দুনিয়ার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। তারা ইহলোকের চেয়ে পরলোকের জীবনকেই প্রাধান্য দেন। আর যারা পার্থিব জীবনকে খারাপ ও অন্যায় কাজে অতিবাহিত করে, তারা মৃত্যুর কথা স্মরণেই ভয় পায়।

সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক আবু হাযেম (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মৃত্যু সম্পর্কে ভীত হই কেন বলবেন কি ? তিনি বললেন, এর কারণ হচ্ছে, তোমরা দুনিয়াকে খুব সুন্দরভাবে আবাদ কর এবং পরকালকে বরবাদ কর। সুতরাং আবাদকৃত জায়গা হতে বরবাদকৃত স্থানে যাওয়া পছন্দ হয় না। সোলায়মান বললেন, আপনি যথার্থই বলেছেন।

—ফিকাতুস সাফওয়াহ, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ।

কবর জীবনের প্রতি যে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং নিজের পুণ্যময় কর্মের প্রতিদানে সেখানে ভাল অবস্থায় থাকার আশা পোষণ করে। আর মনে করে যে, এ পার্থিব জগতের ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তারা কবরের জীবনেও আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত লাভ করবে। সুতরাং মৃত্যুকে তারা কেন ভয় পাবে? আর এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনকে কেনই বা কবর জীবনের উপর প্রাধান্য দেবে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

يُحِبُّ الْاِنْسَانُ الْحَيٰوةَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّنَفْسِهٖ *

"মানুষ এ পার্থিব জীবনকে খুব পছন্দ করে ও ভালবাসে। অথচ মৃত্যুই হচ্ছে তার জন্য উত্তম।" —বায়হাকী– শোয়াবুল ঈমান।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুমিনের জন্য মৃত্যুকে উপঢৌকন বলেছেন। (বায়হাকী ও মেশকাত)। তিনি এও বলেছেন ঃ যে, মানুষ মৃত্যুকে খারাপ জানে ও অপছন্দ করে, অথচ দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ ও আল্লাহর পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার চেয়ে তার জন্য মৃত্যুই উত্তম। মৃত্যু যত তাড়াতাড়ি হবে, ততো তাড়াতাড়ী দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ হওয়া যাবে।

—শরহে সুদুর।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মানুষের দুনিয়া হতে ইনতেকাল করে পরকালে চলে যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে– শিশু যেমন মায়ের সংকীর্ণ ও অন্ধকার জঠোর হতে জন্মলাভ করে পার্থিব জগতের আলো-বাতাসের আরামপ্রদ ও সুন্দর পরিবেশে চলে আসে, অনুরূপভাবে মানুষ দুনিয়ার অশান্তিময় জীবন হতে ইনতেকাল করে, এক বিরাট প্রশস্তময় জীবনে পদার্পণ করে। মোট কথা মুমিনের জন্য মৃত্যু খুবই উত্তম বিষয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে তার জীবন হতে

হবে পুণ্যময় জীবন এবং তার ও আল্লাহ তাআ'লার মধ্যকার সম্পর্ক সঠিক ও সুন্দর রাখতে হবে। আল্লাহ তাআ'লার যেসব বান্দা পুণ্যময় কর্মে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁরা মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের উপর প্রধান্য দেন। পার্থিব জীবনের বিপদাপদ, ফেৎনা ও অস্থিরতাপূর্ণ জীবন থেকে বের হয়ে খুব তাড়াতাড়ি পরকালের চিরশান্তি ও সুখময় জীবনে পদার্পণ করতে আগ্রহী থাকেন।

কোন এক সময় হযরত আবু হোরায়রা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। তখন তিনি বললেন ঃ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্য মৃত্যু ক্রয় করে নিয়ে আসবে। —ইবনে আবু শায়বা, বায়হাকী।

এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে– এ দুনিয়ায় বসবাস করা আমার পছন্দ নয়। যদি মূল্য দ্বারাও মৃত্যু ক্রয় করা যায়, তবে তা ক্রয় করে নেব।

হযরত খালেদ ইবনে মায়াদান (রা) বলতেন, যদি কেউ একথা বলে, অমুক জিনিস যে স্পর্শ করবে, তৎক্ষণাত সে মারা যাবে। তাহলে আমার পূর্বে কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। তবে কেউ যদি আমার চেয়ে বেশী দৌঁড়াতে পারে এবং আমার পূর্বেই তার নিকটে পৌঁছে যায়, তাহলে অন্যকথা। —ইবনে সায়াদ।

কবর জীবনে যা হবে

মৃত্যুর সময়ে ও মৃত্যুর পরে মুমিনের সম্মান

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তখনও লহদ বা কবর খনন করা হয়নি। এ কারণে নবী করীম (সঃ) সেখানে বসলেন, আমরাও তাঁর চতুর্দিকে আদবের সাথে এমনভাবে বসলাম, যেন, আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল, তা দ্বারা তিনি চিন্তাযুক্ত মানুষের ন্যায় মাটি খুঁড়ছিলেন। নবী করীম (সঃ) স্বীয় মাথা মোবারক উঠিয়ে বললেন ঃ কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাআ'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এ কথা তিনি দু' বা তিন বার বললেন। অতঃপর বললেন ঃ মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে পরকাল অভিমুখী হয়, তখন আকাশ হতে তার কাছে ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাদের চেহারা হচ্ছে সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও জান্নাতের সুঘ্রাণ। এ ফেরেশতাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে। অতঃপর মালাকুল মউত ফেরেশতার আগমণ হয় এবং সে এসে মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে বলে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমা ও মাগফেরাত এবং তার সন্তুষ্টির পানে দেহ থেকে বের হয়ে এস। তখন মুমিন ব্যক্তির আত্মা খুব সহজে এমনভাবে দেহ থেকে বের হয়, যেমন কলসী থেকে পানির ফোঁটা প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে। অনন্তর মালাকুল মউত তা বরণ করে নেন।

অতঃপর মালাকুল মউত হাতে নেয়ার পর তিনি তা দূরে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে ছেড়ে দিতে না দিতেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সে আত্মাকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধীতে জড়িয়ে আসমানের দিকে চলে যান। সে সুঘ্রাণ সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেন, পার্থিব জগতে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধী হচ্ছে মেশক, তাদের সাথে আনীত সুঘ্রাণও মেশকের মতই উত্তম।

অনন্তর নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ অতঃপর সে আত্মা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব গগন পানে চলতে থাকেন। তারা অন্যান্য যেসব ফেরেশতার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্রত্মা কার ? প্রত্যুত্তরে তারা দুনিয়ায় উচ্চারিত তার সুন্দর নাম উল্লেখ করে বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এভাবে তাঁরা প্রথম আকাশে পৌঁছলে প্রথম আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁরা এ আত্মাকে নিয়ে আরো উর্ধ্ব মার্গে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। এ সময় প্রত্যেক আকাশের প্রহরী ফেরেশতাগণ অন্য আকাশ পর্যন্ত এ আত্মাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। সপ্তম আকাশে উপনীত হলে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "আমার এ বান্দার নাম ইল্লিনের দফতরে লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে পুণরায় পৃথিবীতে নিয়ে যাও। কেননা আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই তাকে ফিরিয়ে দেব, আর সে মাটি থেকেই তাকে দ্বিতীয়বার উত্থিত করব।" অতঃপর আত্মাকে তার দেহ অবয়বে রাখা হয়। তারপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁরা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভূ কে ? সে বলে, আল্লাহ্ তাআ'লা আমার প্রতিপালক। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? সে বলে, আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, ইনি আল্লাহ্ তাআ'লার রাসূল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার আমল কি? সে বলে, আমি আল্লাহ তাআ'লার কিতাব পাঠ করেছি, আর তা বিশ্বাস ও সত্যারোপ করেছি।

এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেন, (আসলে যা আল্লাহর ঘোষণা) "আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের কাপড় পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও।" অতঃপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে দরজা পথে জান্নাতের সুঘ্রাণ এসে তার কাছে পৌঁছে। আর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর কবরকে প্রশস্ত করা হয়। এরপর খুব সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, উত্তম পোষাক পরিহিত এবং পবিত্র ও সুঘ্রাণ মাখা এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন ঃ তুমি সুখ ও আনন্দ এবং প্রশান্তির বিষয়ে সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ হচ্ছে সে দিন যেদিনের আগমন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি তখন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বাস্তবিকই তোমার চেহারা খুবই সুন্দর এবং উত্তম চেহারা বলার যোগ্য। প্রত্যুত্তরে সে বলে

ঃ আমি তোমার পুণ্যময় কর্ম। তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দচিত্বে বলে, হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন। হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি আমার পরিবার পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারি।

কাফেরদের লাঞ্ছনা ও অপমান

কোন অবিশ্বাসী কাফের যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয় এবং পরকাল অভিমুখী হয়, তখন তার কাছে আকাশ হতে কাল চেহারা বিশিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের সাথে থাকে চাটাই। তাঁরা মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দূরে গিয়ে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত ফেরেশতা তার শিয়রে এসে বলেন, হে পাপিষ্ট আত্মা! আল্লাহ তাআ'লার অসন্তুষ্টির পানে ধাবিত হও। মালাকুল মউতের একথা শুনে উক্ত আত্মা দেহের মধ্যে ছুটাছুটি করতে থাকে। অনন্তর মালাকুল মউত তার আত্মাকে দেহ থেকে এমন সজোরে টেনে বের করে আনেন, যেমন ভিজা তুলাকে লোহার চিরুণী দ্বারা আঁচড়িয়ে পরিষ্কার করা হয়। অর্থাৎ কাফেরের আত্মা দেহ থেকে এমন জোরে টেনে বের করা হয়, যেমন লোহার চিরুণী হতে ভিজা তুলাকে টেনে বের করা হয়। অতঃপর মালাকুল মউত উক্ত আত্মা নিজের হাতে নিয়ে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে দিতে না দিতেই তাঁরা আত্মাটি নিয়ে দুর্গন্ধময় চাটাইতে জড়ান। সে চাটাই থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যেমন পচা ও গলিত মরদেহের দুর্গন্ধে সমস্ত পরিবেশ দুর্গন্ধময় করে তোলে। ঐসব ফেরেশতা এ পাপিষ্ট আত্মা নিয়ে আকাশের পানে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে যেসব ফেরেশতার সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে, তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, এ পাপিষ্ট আত্মা কার ? ফেরেশতাগণ তখন দুনিয়ায় উচ্চারিত তার খারাপ নাম উল্লেখ করে বলেন, এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। তারা এ আত্মা নিয়ে প্রথম আকাশে উপনীত হয়ে আকাশের দরজা খোলতে চান, কিন্তু তা খোলা সম্ভব হয় না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "তাদের জন্য আকাশের দরজসমূহ খোলা হবে না, আর সুঁচের ছিদ্র পথে উট যাতায়ত না করা পর্যন্ত তারা কখনো জান্নাতে প্রবেশও করবে না।" —সূরা আরাফ।

(উট কখনো সুচের ছিদ্র পথে যাতায়াত করতে সক্ষম হবেনা, আর তাদেরও জান্নাতে যাওয়া হবে না।)

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আত্মা বহনকারী ফেরেশতাকে বলেন ঃ ভূতলের সর্বনিম্ন স্থান সিজ্জিন দফতরে এ আত্মার নাম নিবন্ধন কর। অনন্তর তার আত্মাকে সেখান থেকেই সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হয়। এর পর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ

اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ *

"আর যারা আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করে, তারা যেন আকাশ হতে পতিত হয়। অতঃপর হয় পাখী ঠোকর মেরে তার মাংস ভক্ষণ করে অথবা বাতাস তাকে দূর দূরান্তে নিয়ে নিক্ষেপ করে।" —সূরা হাজ্জ।

এরপর সিজ্জীন হতে আত্মাকে তার মরদেহে প্রবেশ করান হয় এবং দু'ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান আর জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার প্রভূ কে? সে বলে, আহা! আমার কিছু জানা নেই। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আহা! আমার কিছু জানা নেই। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? এবারো সে বলে, আহা! আমি তো একে চিনি না।

এ জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হওয়ার পর আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দেন ঃ এ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিপালক সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তাঁকে মানতো না। আর যে ধর্ম তাকে দেয়া হয়েছিল সেসম্পর্কেও সে জ্ঞাত ছিল, আর মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়াত সম্পর্কেও সে অবহিত। কিন্তু শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজকে সে মুর্খ ও অজ্ঞরূপে প্রকাশ করছে। অতএব তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের দিকে তার কবরে একটি দরজা খুলে দাও। অনন্তর জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খোলা হলে জাহান্নাম হতে প্রখর তপ্ত বায়ু তার কবরে প্রবাহিত হতে থাকে। আর তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয়, যার ফলে মাটির চাপে তার পাজরের হাড়গুলো পরস্পর বিপরীত দিকে প্রবেশ করে। অতঃপর কুৎসিত চেহারা ও দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিহিত এমন এক লোক তার কাছে আগমন করে, যার দেহ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে। সে এসে বলে, বিপদের সংবাদ শোন,এ দিনটি হচ্ছে সে দিন- যে সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? তোমার কুৎসতি চেহারাই বলে- তুমি খারাপ সংবাদ বয়ে এনেছ। সে বলে, আমি হচ্ছি তোমার পাপ কর্ম। তখন সে ভয়ে জড়সড় হয়ে বলে, হে আমার প্রতিপলক! তুমি কখোনো কেয়ামত কায়েম করো না। —মেশকাত।

আর এক বর্ণনায় আছে, মুমিন ব্যক্তির আত্মা যখন দেহ থেকে বের হয়, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকেন। তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক দ্বাররক্ষী ফেরেশতা এই বলে আল্লাহর তাআ'লার কাছে প্রার্থনা করেন যে, এ আত্মাকে আমাদের থেকে আরো উর্ধ্ব মণ্ডলে নিয়ে যাওয়া হোক। আর কাফেরের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার আত্মা গলদেশ থেকে অতিকষ্টে বের হয়। নভমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমস্ত ফেরেশতা তার প্রতি লা'নত বর্ষন করতে থাকে। তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রত্যেক দ্বাররক্ষী ফেরেশতা আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা জানায় যে, এ আত্মাকে যেন আমাদের থেকে নিয়ে উর্ধ্বমন্ডলে তুলে নেয়া না হয়। —আহমদ, মেশকাত।

কবরে মুমিনের নামাযের ধ্যান

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হলে তার মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হচ্ছে। অতঃপর তার দেহে পুণরায় আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়ার পর সে চোখ মেলে তাকায় এবং উঠে বসে। আর ফেরেশতাদেরকে বলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি এখন নামাজ পড়ব।" —ইবনে মাজা, মেশকাত।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) লেখেন, তখন মৃত বক্তি নিজকে দুনিয়াতেই আছে বলে ধারণা করতে থাকে। সে বলে, জিজ্ঞাসাবাদ এখন রেখে দাও। আমাকে ফরয আদায় করার সুযোগ দাও, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার নামাযও চলে যাবে। এ কথাগুলা তাঁরাই বলবে, যারা নামাযের অনুরাগী ছিল এবং যাদের মন সর্বদা নামাযেরই ধ্যানে নিমগ্ন থাকত।

এর দ্বারা বেনামাযীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উ্চিত এবং নিজের অবস্থা কি হবে তা অনুমান করা উচিত। গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, কবরে যখন হঠাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন কেমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার মধ্যে পড়তে হবে।

কবরে মুমিনদের নির্ভীক হওয়া ও তাঁদের সম্মুখে জান্নাত তুলে ধরা

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কবরে পৌঁছে নির্ভীক এবং শান্ত শিষ্ট ও চিন্তামুক্ত অবস্থায় উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কোন ধর্মে বিশ্বাসী ছিলে। প্রত্যুত্তরে সে বলে, আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তাঁর সম্পর্কে কি ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ)। তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। আমরা তাকে বিশ্বাস করেছি এবং তার প্রদর্শীত তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করেছি। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি আল্লাহ তাআ'লাকে কখনো দেখেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, দুনিয়ায় কোন লোকই আল্লাহ তাআ'লাকে দেখে না, অতএব আমি কিভাবে দেখব ?

অনন্তর তার কবরে জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়, তখন সে দেখতে পায়, জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার গুলো একটি অপরটিকে হজম করে ফেলছে। জাহান্নামের এরূপ বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করার পর তাকে বলা হয়, তুমি কি দেখেছ কিরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ হতে আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাকে রক্ষা করেছেন? অতঃপর তার কবরে জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। এ জানালা দিয়ে সে জান্নাতের অপরূপ শোভা ও অন্যান্য জিনিসগুলো অবলোকন করে। অনন্তর তাকে বলা হয়, এ জান্নাত হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। তুমি দুনিয়ায় ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে, আর কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ

পাকের ইচ্ছায় তুমি সে বিশ্বাসের সাথেই কবর থেকে উত্থিত হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ কাফের ও নাফরমানগণ কবরে খুব ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠে বসে। তখন তার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়ার জীবনে তুমি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলে? সে বলে, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি না। এরপর তার কাছে নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী ইনি কে ? সে বলে এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তা-ই বলতাম, যা অন্যান্যরা বলত। অতঃপর তার কবরে জান্নাতের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। এ জানালা পথে সে জান্নাতের নয়ানাভিরাম শোভা ও অন্যান্য জিনিস অবলোকন করে। তখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহ তাআ'লার অবাধ্য হওয়ার কারণে তিনি তোমাকে এ চির শান্তিময় নেয়ামত হতে বঞ্চিত করেছেন। এরপর তার কবরে জাহান্নামের দিকে একটি জানালা খুলে দেয়া হয়। সে তখন উক্ত জানালা পথে দেখতে পায় যে, জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার গুলো একে অন্যকে খেয়ে ফেলছে। অনন্তর তাকে বলা হয়, এ জাহান্নামই হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান। তুমি দুনিয়ার জীবনে এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে, আর সে সন্দেহ নিয়েই তোমার মৃত্যু হয়েছে, আর আল্লাহর ইচ্ছায় সে সন্দেহ নিয়েই তুমি কেয়ামতের দিন কবর থেকে উত্থিত হবে। —ইবনে মাজা, মেশকাত।

কবরে মুমিনগণের শান্তি ও কাফের মুনাফেকদের শাস্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করার পর তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে। তাঁদের দেহের বর্ণ কাল এবং আখিযুগল নীল। এদের একজনের নাম মুনকীর এবং অপর জনের নাম নাকীর। তাঁরা উভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে দুনিয়ায় কি বলতে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? মৃত ব্যক্তি মুমিন হলে প্রত্যুত্তরে সে বলে, ইনি হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআ'লার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লার বান্দা ও রাসূল। একথা শুনে ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা জানি তুমি এভাবেই উত্তর দেবে। অতঃপর তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত এবং নুরানী আলোয় আলোকিত করা হয়, আর তাকে বলা হয়, তুমি এখন শান্তিতে ঘুমাও। সে বলে, আমি আমার পরিবার পরিজনকে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য যাচ্ছি। তখন তারা বলেন ঃ এখানে কেউ আগমন করার পর পুণরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন বিধান নেই। তুমি অনুরূপভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেরূপ বাসর ঘরের নবদু'লা প্রশান্তি মনে ঘুমিয়ে পড়ে। যাকে তার স্ত্রী ছাড়া কেউ-ই জাগাতে পারে না। সুতরাং মুমিন ব্যাক্তি তখন কবরে খুব প্রশান্তিতে অবস্থান করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা কেয়ামতের দিন তাকে উক্ত কবর থেকেই উত্থিত করবেন।

আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তাহলে মুনকীর-নাকীরের প্রশ্নের উত্তরে বলে, মানুষকে আমি এ বক্তি সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলতাম, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন ঃ আমরাও ভালভাবে জানি যে, তুমি এভাবেই জওয়াব দেবে। অতঃপর মাটিকে বলা হয়, তুমি একে খুব জোরে চাপ দিয়ে শাস্তি দাও। মাটি তখন তাকে এমন জোরে চাপ দেবে যে, তার পাঁজরের একদিকের হাড় অন্য দিক দিয়ে বের হবে। এরপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে সেখান থেকে উথিত না করা পর্যন্ত উক্ত কবরেই সে সর্বদা শাস্তির মধ্যে নিপতিত থাকবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ঈমানদারগণ আলমে বরযখে অর্থাৎ কবরের জীবনে খুব সুখ-শান্তিতে থাকবেন, তাদের চেতনা অনুভূতিও থাকবে নিরাপদ। এমনকি তাদের মনে নামাযের কথাও স্মরণ হবে। তারা ফেরেশতাগণের প্রশ্নবানে কোনরূপ ভীত হবেন না। তারা যখন নিজের অবস্থা শুভ হওয়া সম্পর্কে অবহিত হবেন, তখন তারা নিজের পরিবার পরিজনকে এ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ফেরেশতাগণকে বলবেন, আমি এখন ঘুমাব না বরং পরিবার পরিজনকে আমার অবস্থা অবহিত করার জন্য যাচ্ছি। অতঃপর সে নিজের পরিণতি সীমাহীন সুখ ও শান্তি অবলোকন করে ফেরেশতাদের কাছে তৎক্ষণাৎই কেয়ামত সংঘটনের কথা বলবেন। যাতে সে খুব তাড়াতাড়ি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। যার প্রতি আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও করুণা হয়, তার চেতনা অনুভূতি ও জ্ঞান বহাল থাকে। আল্লাহ তাআ'লা তার দ্বারা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর প্রদানের তাওফীক প্রদান করেন। যেমন– কোরআন মাজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ *

"ঈমানদারগণকে আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়া ও আখেরাতের সেই সুদৃঢ় কথার (কলেমায়ে তায়্যেবার) উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। —সূরা ইবরাহীম (৪র্থ রুকু।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহু (স) হযরত ওমর (রা)-এর কাছে কবরে মৃত ব্যক্তি মুনকীর-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখিন হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করলেন। তখন সাহাবা (রা)গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তখন কি আমাদের হুঁশ জ্ঞান ফিরিয়ে দেয়া হবে ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, এখন যেরূপ হুশ জ্ঞান আছে, তখনও অনুরূপ থাকবে। একথা শুনে ওমর (রা) বললেন, তা হলে ওদের মুখে পাথর। অর্থাৎ যখন হুশ জ্ঞান থাকবে, আর ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ যখন সাথে থাকবে, তখন ভয় কিসের? তাঁদেরকে এমন জবাব দেব, যেন প্রশ্নকারীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। —তারগীব, আহমদ, তাবারানী

মুমিনের কাছে অন্যান্য কবরবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "ফেরেশতাগণ যখন মুমিন ব্যক্তির জান কবজ করে অন্যান্য মুমিনের আত্মার কাছে নিয়ে যান যাদের অনেক পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে, তখন সে আত্মাসমূহ এর আগমনে এমনভাবে খুশী হয়, যেমন এ দুনিয়ায় কেউ কোন অনুপস্থিত আপনজনের আগমনে খুশী হয়ে থাকে। তখন তারা এ আত্মার কাছে জিজ্ঞেস করে, অমুকের অবস্থা কি? অতঃপর তারা পরস্পর নিজেরাই বলে, ক্ষান্ত হও, যেহেতু সে দুনিয়ায় বিভিন্ন চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, তাই কিছু সময় বিশ্রাম করতে দাও। অতঃপর ঐ মৃত ব্যক্তি তাদেরকে বলে ঃ অমুকে এ অবস্থায় আছে, অমুকে এভাবে আছে। সে তার অনেক পূর্বে মৃত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলে, অনেক পূর্বেই সে মৃত্যু বরণ করেছে, সেকি তোমাদের কাছে আসেনি ? তারা বলে, যখন সে দুনিয়া ছেড়ে এসেছে এবং আমাদের কাছেও আসেনি, তাহলে অবশ্যই তাকে জাহান্নামে নেয়া হয়েছে। —আহমদ, নাসাঈ, মেশকাত।

কবরবাসীদের কাছে জীবিতদের আমল পেশ করা হয়

তাবারানী গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা দুনিয়া ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন, তাদের কাছে তোমাদের আমলসমূহ পেশ করা হয়। তা ভাল ও পুণ্যময় হলে তারা অত্যন্ত খুশী হয় এবং আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ দোয়া করে– হে আল্লাহ! এ আমল হচ্ছে তার প্রতি তোমার দয়া ও অনুগ্রহের ফলশ্রুতি। সুতরাং তাদের প্রতি আপনারর নেয়ামতকে পূর্ণ করুন এবং এমন পুণ্যময় আমলরত অবস্থাতেই তাদেরকে মৃত্যু দান করুন।" আর যদি তাদের সম্মুখে খারাপ আমল পেশ করা হয়, তবে তারা বলে– হে আল্লাহ! এর অন্তকরণে পুণ্যময়তা ঢেলে দিন, এবং আপনার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়, এমন আমল করার জন্য এর মনে আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করুন। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ।

মুমিনের প্রতি কবরের সুখকর চাপ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (রা) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যখন কবরে মুনকীর-নাকীরের বীভৎস কণ্ঠ এবং মৃত ব্যক্তিকে কঠোরভাবে চাপ দেয়ার কথা বলেছেন, তখন থেকে আমি কোন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না এবং কিছুতেই আমার মনের অস্থিরতা দূর হচ্ছে না। নবী করীম (সঃ) বললেন, ওহে আয়েশা! মুনকীর-নাকীরের কণ্ঠস্বর মুমিনের কাছে অনুরূপ সুখকর মনে হবে, সুরেলা কণ্ঠের আওয়াজ যেমন মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে। নয়ন যুগলে সুরমা ব্যবহার

করলে চোখে যেমন সুখ ও শান্তি অনুভুত হয়, কবরে মুমিনদের প্রতি মাটির চাপও অনুরূপ সুখকর ও শান্তিদায়ক হবে, কারো মাথা ব্যথা হলে যেমন তার স্নেহময়ী মা পুত্রের মাথা আস্তে আস্তে চাপতে থাকেন, আর পুত্র তখন খুব আরাম ও শান্তি অনুভব করতে থাকে। ওহে আয়েশা! মনে রাখবে, আল্লাহ তাআ'লা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীদের জন্য বড়-ই দুর্ভাগ্য। তাদেরকে কবরে এমনভাবে মাটির চাপ দেয়া হবে, যেমন ডিমের ওপর পাথর রেখে চাপ দেয়া হয়। —শরহে সুদূর।

মুমিনের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন

হযরত আনাস (রা) বলেন; রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের জন্য আকাশে দু'টি দ্বারপথ রয়েছে। এক পথে তার আমল উর্ধ্ব মণ্ডলে আরোহণ করে, আর অপর পথে তার জীবিকা নাযিল হয়। যখন মুমিনের মৃত্যু হয়, তখন ঐ পথ দু'টি তার জন্য ক্রন্দন করে করে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যখন কোন মুমিনের মৃত্যু হয়, তখন কবরস্থান নিজেই নিজকে সজ্জিত করে নেয়। আর কবরস্থানের প্রতিটি অংশই তাকে নিজের বুকে দাফন হওয়ার আশা পোষণ করতে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুমিনের মরণে যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত রোদন করে। (হাকেম, নুরুস সুদূর) তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। —আবু নাঈম।

হযরত আতাউল খোরাসানী (র) বলেছেন, কেউ মাটির কোন স্থানে সেজদা দিলে সেখানকার মাটি কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর দিনে তার জন্য কাঁদব। —আবু নাঈম।

পুণ্যবান সন্তান ও জনকল্যাণমূলক কাজের উপকারিতা

হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মরণের পরে মুমিন ব্যক্তি যেসব কাজের পুণ্য লাভ করে, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ইলমে দ্বীন, পার্থিব জীবনে সে যা প্রচার ও প্রসার করেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, পুণ্যবান সন্তান-সন্তুতি রেখে আসা। তৃতীয় হচ্ছে, কোরআন মাজিদ- যা সে উত্তরাধিকারীদের কাছে রেখে এসেছে। চতুর্থ হচ্ছে যদি সে মাসজিদ নির্মাণ করে এসে থাকে। পঞ্চম হচ্ছে, যদি সে পথিক ও মুসাফীরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে থাকে। স্বচ্ছ পানির অভাব দূর করার জন্য যদি সে নদী-নালা, খাল, পুকুর বা নল-কুপের সুব্যবস্থা করে থাকে। আর জীবনের সুস্থাবস্থায় যদি কোন ধন-সম্পদ দান করে থাকে। এসবের পুণ্য মরণের পরও সে লাভ করতে থাকে। —ইবনে মাজা, বায়হাকী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতে নেককারদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। তখন সে আরয করবে, হে আল্লাহ! এ মহান সম্মান ও মান-মর্যাদা আমি কিভাবে পেলাম? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানদের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে তোমাকে এ মান-মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। —আহমদ, মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন কিছু কিছু লোক পাহাড় সমান পুণ্যলাভ করবে। তা দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে- এত বিপুল পরিমাণ পুণ্য আমি কিভাবে পেলাম? তখন তাকে বলা হবে, তোমার সন্তানগণ তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করার ফলে তোমাকে এ সম্মান দান করা হয়েছে। —শরহে সুদূর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কবরে মৃত ব্যক্তি এমনভাবে অপরের মুখাপেক্ষী হয়, যেমন পানিতে ডুবতে থাকা ব্যক্তি হয়ে থাকে। তারা পিতা-মাতা, ভাই ও অন্যান্য লোকদের দোয়া লাভের জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনে। তাদের কাছে যখন এদের কারো কোন দোয়া পৌঁছে, তখন সমস্ত দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার তুলনায় সে দোয়া হয় তাদের কাছে বেশি প্রিয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা পৃথিবীর মানুষের দোয়া দ্বারা কবরবাসীদেরকে পাহাড় সমান পুণ্য দান করেন। মৃতদের জন্য জীবিতদের উপঢৌকন হচ্ছে তাদের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রাথনা করা।

—বায়হাকী, মেশকাত।

মুমিন ব্যক্তিকে মালাকুল মউতের সালাম

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "মালাকুল মউত ফেরেশতা যখন আল্লাহ তাআ'লার কোন প্রিয় বান্দার কাছে আসে, তখন তাঁকে সালাম করে আর বলে, হে আল্লাহ তাআ'লার বন্ধু! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সে ঘর থেকে তুমি বের হয়ে এস, যে ঘরকে তুমি নিজের চাহিদা জলাঞ্জলি দিয়েও নষ্ট করে দিয়েছ। আর সে ঘরের পানে চল, যে ঘরকে তুমি এবাদত-বন্দেগী দ্বারা আবাদ রেখেছ। —শরহে সুদূর।

দুনিয়ায় থাকতে মুমিনের অস্বীকার এবং তার প্রতি সুসংবাদ জ্ঞাপন

হযরত ইবনে জারীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় পত্নী হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ "মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি যখন ফেরেশতাগণকে দেখতে পায়, তখন তাঁরা তাকে বলেন ঃ আমরা কি তোমার জান কবজ না করে তোমাকে ফেরত পাঠাব? প্রত্যুত্তরে সে বলে, তোমরা কি আমাকে দুঃখ বিষাদ ও চিন্তাযুক্ত রেখে যেতে চাও ? এখন আর এখানে থাকব না। আমাকে তোমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে নিয়ে চল। —ইবনে জারীর, শরহে সুদূর।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেছেন, "মরণের সময় ফেরেশতাগণ মুমিন ব্যক্তির কাছে এসে সুসংবাদ জানায়। তারা বলেন ঃ এখন যেখানে যাচ্ছ সেখানে যেতে ভয় পেও না। সেখানে মুমিনের মনে কোন ভয়-ভীতিই থাকে না। তাঁরা তাকে একথাও বলেন ঃ দুনিয়া এবং দুনিয়াবাসীকে পরিত্যাগ করার জন্য দুঃখ করো না, জান্নাত লাভের সুসংবাদ নাও অতএব সে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, ইহলোকে থাকতেই আল্লাহ তার। মনকে খুশী ও প্রশান্তিতে ভরে দেন।
—ইবনে জারীর, শরহে সুদূর।

আল্লাহ্ তাআ'লার পক্ষ থেকে শহীদগণকে সম্বোধন

তাবেঈ হযরত মাসরুক (র) বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে কোরআন মজীদের এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলাম ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

"যারা আল্লাহর পথে জিহাদে নিহত হয়েছেন, তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তারা জীবিকা প্রাপ্ত হন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন– "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ "শহীদের আত্মা সবুজ পাখীর পক্ষপুটে অবস্থান করে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআ'লার আরশের নীচে ঝারবাতি ঝুলান আছে। তারা জান্নাতের যে কোনো স্থানে ভ্রমন করতে পারেন। অতঃপর তারা উক্ত ঝারবাতির কাছে এসে অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ "তোমরা আমার নিকট কিছু চাও? তারা বলেন, আমরা কি চাইব? আমরা তো জান্নাতের যে কোন স্থানে যাতায়াত করতে পারি। এভাবে তাদের ও আল্লাহ্ তাআ'লার মাঝে তিনবার কথোপকথন হয়। অতঃপর তারা যখন মনে করে যে, আমরা কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআ'লা এভাবে বলতেই থাকবেন। তখন তারা বলেন ঃ "আমরা চাই, আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমরা পুনরায় আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারি।" সুতরাং আল্লাহ্ তাআ'লা যখন বুঝবেন যে, তাদের কোন চাহিদা নেই, তখন তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করবেন। এরপর আর আল্লাহ্ তাআ'লা কখনো তাদের কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। অর্থাৎ, তারা পারলৌকিক কিছুই কামনা না করে বরং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার আবদার করল, যা নিয়ম বিরোধী, তাই তাদেরকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। —মুসলিম, মেশকাত।

সবুজ পাখীর পক্ষপুটে কেবল শহীদগণের আত্মাই অবস্থনের সুযোগ দেয়া হয় না, বরং অন্যান্য মুমিনদের আত্মাও তার মধ্যে অবস্থান করার সুযোগ পেয়ে জান্নাতে ভ্রমণ করে থাকে। যেমন হযরত ক্বায়াব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ *

"ঈমানদারগণের আত্মাও সবুজ পাখীর ডানার মধ্যে অবস্থান করে। আর সে পাখীগুলা জান্নাতের গাছপালার ফল ফলারী আহার করে। —মেশকাত।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে লেখেছেন ঃ এক হাদীসে আছে, মুমিনগণের আত্মা সবুজ পাখীর পক্ষপুটে অবস্থান করে জান্নাতের ফলফলারী আহার ও পানি পান করে। আর আরশের নীচে স্বর্ণের ঝারবাতির কাছে বিশ্রাম করে। —মেরকাত।

শহীদ হওয়ার কষ্ট পিপীলিকার কামড়ের ন্যায়

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট শুধু এটুকুই অনুভব করেন, তোমরা যেমন পিপীলিকার কামড়ের কষ্ট অনুভব করে থাক। —তিরমিযী, মেশকাত।

কবর আযাবের বিবরণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আকিদা অনুযায়ী কবরের আযাব সত্য ও বাস্তব। পুণ্যবান মুমিনগণ কবরে যেরূপ শান্তি লাভ করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত সুখ-শান্তিতে অবস্থান করেন, তেমনিভাবে কাফের বেঈমান ও গুনাহগারও কবরে শাস্তি ভোগ করে। অসংখ্য হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত। হযরত আয়শা (রা)-এর কাছে জনৈক ইহুদী মহিলা এসে কবর আযাব প্রসঙ্গে আলোচনা করল এবং বলল, আল্লাহ তোমাকে কবর আযাব থেকে নিরাপদে রাখুন। অতঃপর আয়েশা (রা) কবর আযাব সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ হাঁ, কবর আযাবের বিষয়টি সত্য ও বাস্তব। আয়েশা (রা) বলেন, এর পর যখনই নবী করীম (সঃ) নামায পড়তেন, তখনই নামায শেষে আল্লাহ তাআ'লার কাছে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত ওসমান (রা) যখনই কোন কবরের কাছে দাঁড়াতেন, তখনই তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারায় তার শুশ্রুমণ্ডলী ভিজে যেত। জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা হলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দেখে এত কাঁদেন কেন ? হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "নিঃসন্দেহে কবর হচ্ছে পরকালের মনজিল সমূহের মধ্যে প্রথম

মনযিল। সুতরাং কবর আযাব হতে নাজাত পেলে তার পরবর্তী মনজিলগুলো তারচেয়ে অনেক সহজ হয়। আর যদি কবর আযাব হতে নাজাত না পায়, তা হলে পরবর্তী মনজিলগুলো তার তুলনায় অনেক কঠিন হয়।" —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

কবরে বিষধর সাপের দংশন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কাফের ও বেঈমানদের কবরে অবশ্যই বিষধর সর্প নিয়োজিত করা হয়, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকে। সাপগুলোর বিষ এত মারাত্মক হবে যে, তার একটি সাপও যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তাহলে তার বিষক্রিয়ায় পৃথিবীতে একগাছা ঘাসও জন্মানোর যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে না।" আধুনিক যুগের এটম বোমার কথা চিন্তা করলে নবী করীম (সঃ)-এর এ হাদীসের মর্ম অনুধাবন করতে আদৌ কোন কষ্ট হয় না। কারণ এটম বোমার বিক্রিয়ায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে মাটির উর্বরা ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে ফেলে। যেমন– হিরোশিমা ও নাগাশাকি শহর দু'টিতে হয়েছিল।

কবরে শাস্তির যন্ত্রাণায় মৃতের চিৎকার করা এবং লোহার মুগুর দ্বারা পেটান

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কবরে কাফের ব্যক্তি যখন মুনকীর-নাকীরের জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, হায়! আমি কিছু জানি না, তখন আকাশ হতে একজন ঘোষক বলেন, "এ লোক মিথ্যা বলছে, তার জন্য আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে আগুনের পোশাক পরিধান করাও, তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।" অতঃপর জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হলে সে দরজা পথে তার কবরে জাহান্নামের তপ্ত লু হাওয়া প্রবাহিত হতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে এত সংকুচিত করা হয় যে, মাটির চাপে তার উভয় পাঁজরে হাড় পরস্পর বিপরীত দিকে বের হয়ে পড়ে। তারপর একে সর্বদা শাস্তি দেয়ার জন্য এমন একজন ফেরেশতা মোতায়েন করা হয়, যে অন্ধ ও বধির। তার হাতে থাকে বিরাট এক লোহার গদা। যার প্রকৃতি এমন যে, যদি তা দিয়ে পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয়, তবে পাহাড়ও মাটির সাথে মিশে যাবে। এ গদা দ্বারা একবার আঘাত করলে মানুষ ও জ্বিন ছাড়া পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত প্রাণী তার চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়। আর একবার আঘাত করলে কাফের ব্যক্তি মাটির সাথে মিশে যায়। অতঃপর তাকে পূনরায় জীবিত করা হয়।"

—আহমদ, আবু দাউদ।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে, এ লোহার গদা দ্বারা আঘাত করলে কাফের ব্যক্তি এমন জোরে চিৎকার দেয়, যার শব্দ তার নিকটবর্তী মানুষ ও জ্বিন ছাড়া প্রতিটি বস্তু শুনতে পায়। —মেশকাত।

এখানে এ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় যে, মৃতকে মারার এবং তার চিৎকার দেয়ার শব্দ মানুষ ও জ্বিনদেরকে কেন শোনান হয় না?

এর জওয়াবে বলা হয়, মানুষ ও জ্বিনদের সাথে আলমে বরযখের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদেরকে যদি কবর আযাব দেখানো হয়, অথবা তারা যদি সেখানে বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির চিৎকার শুনতে পায়, তাহলে তারা আল্লাহ তাআ'লার পতি ঈমান আনবে এবং পুণ্যময় কাজ করবে। কিন্তু কথা হল আল্লাহ তাআ'লা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন, সেরূপ ঈমানই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শুনে তা বুঝে আসুক বা না আসুক, তা সঠিক বলে বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলা হয়। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ *

"যারা স্বীয় প্রতিপালককে না দেখে অদৃশ্যভাবে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান। —সূরা মূলক, ১ম রুকু।

জান্নাত-জাহান্নাম ও কবরের অবস্থা ও দৃশ্য যদি অবলোকন করান হয়, তাহলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা হয় না। আল্লাহ' তাআ'লার কাছে চাক্ষুষ দেখে ঈমান গ্রহণ কবুল হয় না। এজন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমীন হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তখন তো আযাবের ফেরেশতাকে দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْ بَاْسَنَا *

"তারা যখন আমার শাস্তি অবলোকন করে, তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবে না।" —সূরা মুমিন– শেষ রুকু।

কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন করার পর সবা-ই ঈমান আনবে এবং নবী-রাসূলগণকে সত্য মানাবে, কিন্তু সে সময়ে বিশ্বাস স্থাপনে কোন ফল লাভ হবে না। তখনকার ঈমান আল্লাহ তাআ'লার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মানুষকে কবর আযাব না দেখান এবং কবরে মৃত ব্যক্তির চিৎকার না শোনানোর মধ্যে এ কল্যাণও নিহিত রয়েছে যে, তারা তা দেখলে ও শুনলে সহ্য করতে পারত না, তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারাবে, কোনক্রমেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "মানুষ যখন কাফেরের কফিন বহন করে চলে, তখন মৃত ব্যক্তি বলে ঃ হায়! আমার দুর্গতি, তোমরা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? তার একথা মানুষ ছাড়া সমস্ত প্রাণীই শুনতে পায়। এ কথা যদি কোন মানুষ শুনতে পেত, তবে তৎক্ষনাত সে অচেতন হয়ে পড়ত। —বোখারী, মেশকাত।

অবশ্য আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসূল (সঃ)-কে কবরের অবস্থা সম্পর্কে শুধু অবহিতই করেননি বরং তা দেখিয়েছেনও। কেননা, তাঁর এসব শাস্তি অবলোকন করে সহ্য করার ক্ষমতা ছিল। এমনকি জাহান্নামের দৃশ্য দেখার পর কান্না সম্বরণ এবং স্বীয় সাহাবাদের সাথে চলাফেরা এবং পানাহার করণে তাঁর কোনো ব্যাঘাতই সৃষ্টি হয়নি। হযরত আবু আইউব (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (সঃ) কোন এক সময় মদীনায় থাকাকালে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শহরের বাইরে গেলেন। এমন সময় তিনি এক বিরাট বিকট শব্দ শুনে বললেন, ইহুদীগণকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সময় স্বীয় খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে বনু নাজ্জারের বাগানে যেতে ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ নবী করীম (সঃ)-এর খচ্চরটি লাফ দিয়ে উঠল। এমন লাফ দিল যে নবী করীম (সঃ) স্বীয় খচ্চরের পিঠ হতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। সেখানে পাঁচ অথবা ছ'টি কবর ছিল। নবী করীম (সঃ) সমাহিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এদেরকে কি তোমরা চিনতে?" এক লোক বলল, আমি তাদেরকে চিনতাম। নবী করীম (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এরা কখন মারা গেছে?" সে বলল, এরা শেরিকী যমানায় মরেছে। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ "এদেরকে কবরে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তোমরা মৃত ব্যক্তিদের দাফন পরিত্যাগ করার আশংকা না হলে, আমি আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ দোয়া করতাম, তোমাদেরকেও যেন এ কবরের শাস্তির কিছু অংশ শুনান– যা আমি এখন শুনছি। —মুসলিম।

চোগলখোরী ও পেশাবের ছিটা হতে আত্মরক্ষা না করায় কবর আযাব

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টি কবরের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন ঃ "এ কবর দু'টিতে সমাহিত ব্যক্তিদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বড় কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না বরং খুবই সাধারণ কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে। ইচ্ছা করলে তারা একাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারত। কাজ দু'টি হচ্ছে– একজন পেশাব করা কালে পর্দা করত না। আর এক বর্ণনায় আছে, পেশাবের ছিটা হতে পবিত্র হত না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– কুটনামী ও চোগলখোরী করত। অতঃপর নবী করীম (সঃ) একটি কাঁচা খেজুর ডাল আনিয়ে তা দু'ভাগ করে একটি করে সে কবর দু'টিতে পোঁতে রাখলেন। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কেন ? এতে কি ফায়দা হবে ? তিনি বললেন ঃ "আমি আশা করি, এ ডাল দু'টি না শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে। এর ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম বলেছেন, তাজা ডালের আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠের কারণে শাস্তি হ্রাস পাওয়ার আশায় তিনি এরূপ করেছেন। —বোখারী, মুসলিম।

কবরে বিশেষ কিছু কাজের বিশেষ বিশেষ আযাব

বোখারী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি স্বপনের বিবরণ বর্ণিত হয়েছ, যাতে কবর জগতের বিশেষ বিশেষ কিছু আযাবের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলছে। এ অবস্থায় আমি দেখছি যে, একজন লোক বসা রয়েছে, আর এক লোক লোহার এক চিমটা হাতে দাড়িয়ে আছে, সে ঐ চিমটা দ্বারা বসা ব্যক্তির গলা হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সম্মুখ ভাগে চিরছে। অতঃপর পেছন দিকে গলা হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত চিরছে। ইত্যাবসরে সম্মুখ দিকের চেরা ক্ষত ভাল হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার সম্মুখ দিক দিয়ে চিরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ব্যাপার? প্রত্যুত্তরে উভয়ে বললেন, সামনে চলুন। আমি চলতে চলতে এমন এক লোকের কাছে গিয়ে উপনীত হলাম, যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর তার শিয়রে এক লোক ভারী পাথর হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান। দণ্ডায়মান ব্যক্তি তার হাতের ভারী পাথর দ্বারা শোয়া লোকটির মাথায় স্বজোরে আঘাত করছে। আঘাতের পর পাথরটি দুরে ছিটকে পড়ছে। সে পাথরটি পুণরায় কুড়িয়ে আনছে। সে ফিরে আসার মধ্যেই তার মাথার আঘাত ভাল হয়ে পূর্ববৎ হয়ে যাচ্ছে। পূনরায় সে অনুরূপ করে চলছে। জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ব্যাপার ? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। অতঃপর আমি চলতে চলতে একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম, যা দেখতে উনুনের মত। এ গর্তের উপরিভাগ সরু কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত। তাতে আগুন জলছে এবং তার মধ্যে রয়ছে অনেক উলংগ নারী পুরুষ। আগুন যখন জ্বলে উপরের দিকে উঠে লোকগুলোও সাথে সাথে উপরে ওঠে আসে এবং বের হওয়ার উপক্রম করে। অতঃপর আগুন নিম্নদেশে যাওয়ার সাথে সাথে লোকগুলোও গর্তের নিম্নদেশে চলে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি ঘটনা? তাঁরা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমি সামনে চলতে চলতে একটি রক্তের নহরের কাছে এসে উপনীত হলাম। দেখলাম নহরে মাঝখানে এক লোক দাড়ান, আর নহরের তীরে দাড়ান আর এক লোক, যার সম্মুখে রয়েছে অনেকগুলো পাথর খন্ড। নহরের মাঝে দণ্ডায়মান ব্যক্তি যখন তীরে উঠতে চায়, তখন তীরে অবস্থিত ব্যক্তি তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে, ফলে সে তার পূর্বস্থানে যেতে বাধ্য হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কি হচ্ছে ? তাঁরা বলল, সামনে চলুন। এরপর আমি চলতে চলতে একটি সবুজ শ্যামল বাগানে গিয়ে উপনীত হলাম, সে বাগানে রয়েছে বিরাট এক বৃক্ষ, সে বৃক্ষের তলায় বসে রয়েছেন এক বৃদ্ধ এবং অনেক শিশু। এ বৃক্ষের নিকটেই বসে আছে আর এক লোক, যার সম্মুখে আগুন জ্বলছে এবং সে তাতে ফুক দিচ্ছে। অতঃপর ঐ দু'ব্যক্তি আমাকে উঠিয়ে বৃক্ষের উপরে নিয়ে গেল। সেখানে গাছপালার মধ্যে একটি সুন্দর ঘর বিদ্যমান। এর চেয়ে সুন্দর ঘর ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। সে ঘরে আমাকে

প্রবেশ করানো হল। সেখানে আমি অনেক বৃদ্ধ যুবক ও শিশু নর নারীকে দেখতে পেলাম। অতঃপর আমাকে ঐ ঘর থেকে বের করে আরও উপরের দিকে নেয়া হল। সেখানে পূর্বের ঘরের তুলনায় অনেক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আর একটি ঘর রয়েছে, সেখানে আমাকে নেয়া হল। তাতে অনেক বৃদ্ধ ও যুবক রয়েছে। আমি তাদের দুজনকে বললাম, তোমারা আমাকে সারা রাত চতুর্দিকে ঘুরালে, এখন বল আমি যা দেখেছি তার মর্ম কি ?

তাঁরা উভয়ে আমাকে বলল, আপনি প্রথমতঃ যে লোকের দেহ চিরতে দেখেছেন, সে লোকটি মিথ্যাবাদী। সে সমাজে মিথ্যা কথা বলে বেড়াত এবং তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এ লোকের সাথে কেয়ামত পর্যন্ত এ আচরণই করা হবে। আর যার মাথায় আঘাত করতে দেখেছেন, সে এমন এক লোক, যাকে আল্লাহ তাআ'লা কোরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে রাতের বেলায় কোরআন অধ্যয়ন না করে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনের বেলা কোরআন অনুযায়ী কোন কাজ করত না। কেয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ ব্যবহারই চলতে থাকেব। আর আগুনের গর্তে যেসব লোক দেখেছেন, তারা ব্যভিচারী বা অবৈধ যৌনাচারী। (তারাও কেয়ামত পর্যন্ত এভাবে আগুনের গর্তে থাকবে)। আর যাকে রক্তের নহরের মাঝে দেখেছেন, সে সুদখোর। আর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। আর তাঁর চতুর্দিকে যেসব শিশু দেখেছেন, তারা হচ্ছে মানুষের মৃত নাবালক সন্তান। আর যাকে আগুন ফুঁকাতে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন, জাহান্নামের প্রধান কর্মকর্তা মালেক ফেরেশতা। আর প্রথম যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, সে ঘর হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের ঘর। আর দ্বিতীয় ঘরটি হচ্ছে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন তাঁদের ঘর। আমি হচ্ছি জিবরাঈল ফেরেশতা এবং এ হচ্ছে মিকাঈল ফেরেশতা। অতঃপর আমাকে বলা হল– মাথা উর্ধ্বে তুলুন। আমি মাথা উর্ধ্বে তুললে এক খণ্ড সাদা মেঘ দেখতে পেলাম। বলা হল, এ হচ্ছে আপনার ঘর। আমি বললাম, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করব। তাঁরা বলল, এখনো আরপনার জীবন পূর্ণ হয়নি, অবশিষ্ট রয়ে আছে, যদি পূর্ণ হত তবে এখনি এ ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন। —মেশকাত।

ফায়দা ঃ নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন হচ্ছে অহী। এসব ঘটনা সবই সত্য। এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া গেল। একটি হচ্ছে– মিথ্যা কথার শাস্তি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– আমলহীন আলেমের শাস্তি। তৃতীয় হচ্ছে– যিনাকার ও ব্যভিচারীদের শাস্তি। চতুর্থ হচ্ছে– সুদখোরের শাস্তি। হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলমানকে এসব অশ্লীল গুনাহের কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

মৃতের সাথে কবরের কথোপকথন

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরের বাইরে গেলে কিছু লোককে দেখতে পেলেন যে, তারা খুব জোরে হাঃ হাঃ করে

হাসছে, যার কারণে তাদের দন্তরাজি বের হয়ে পড়ছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ "সাবধান! তোমরা যদি জীবন হরণকারী অর্থাৎ মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতাম না। সুতরাং তোমরা জীবন হরণকারী মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। কেননা কবর প্রতিদিন বলে আমি হচ্ছি বন্ধুহীন ব্যক্তির ঘর, আমি হচ্ছি একাকী থাকার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।" অতঃপর তিনি বললেন ঃ "যখন কোন মুমিন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে স্বাগতম, তুমি তোমার নিজের ঘরে এসেছ। যারা আমার বুকের উপর চলাচল করে, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তুমি আমার প্রিয় পাত্র। সুতরাং তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসেছ। অতএব তুমি আমার ব্যবহার দেখবে, দেখবে আমি তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করি। এরপর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। আর কবরে যখন কোন কাফের ও পাপাচারীকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন খুবই খারাপ এবং তুমি খারাপ জায়গায় এসেছ। তুমি এখন জানবে, আমার বুকের উপর চলাচল কারী সমস্ত লোকের মধ্যে তুমি ছিলে আমার কাছে কত ঘৃণিত। তোমাকে আজ আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তুমি আজ আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আজ তুমি ভালভাবে দেখবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করি। এরপর কবর তাকে এমন জোরে দু'দিক থেকে চাপ দেয়, যার ফলে তার ডান পাজরের হাড় বাম দিকে এবং বাম পাঁজড়ের হাড় ডান দিকে ঢুকে পড়ে।" এ অবস্থাকে নবী করীম (সঃ) এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর মুবারক ডান হাতের আঙ্গুলসমূহ বাম হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করালেন। —তিরমিযী, মেশকাত।

যারা কবর আযাব থেকে নিরাপদে থাকবেন

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর লোকেরা যখন কবর স্থান থেকে চলে আসে, তখন সে তাদের পথ চলার জুতার শব্দ শুনতে পায়। সে মুমিন হলে তার নামায এসে তখন শিয়রে দাঁড়ায়। তার রোযা এসে তাঁর ডান দিকে দাঁড়ায় এবং যাকাত এসে দাঁড়ায় তাঁর বাম দিকে। আর সে যত নফল কাজ করেছে, যেমন নফল নামায, দান-সদকা ও সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি কাজগুলো তার পদযুগলের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার শিয়রের দিক দিয়ে আযাবের আগমন ঘটলে তাঁর নামায বলে উঠে, আমার দিক দিয়ে তোমার যাবার কোন পথ নেই। অতঃপর আযাব মৃত ব্যক্তির ডান দিক থেকে আসার চেষ্টা করলে তাঁর রোযা বলে উঠে, আমার দিক দিয়ে তোমার কোন পথ নেই। অতঃপর বাম দিক দিয়ে আসার চেষ্টা করলে, তাঁর দেয়া যাকাত দণ্ডায়মান

হয়ে বলে, আমার দিক দিয়ে তোমার যাবার কোন পথ নেই। অবশেষে পদযুগলের দিক দিয়ে আযাব আসতে শুরু করলে তার নফল এবাদতসমূহ বলে, আমাদের দিক দিয়ে তোমার কোন পথ নেই। —তারগীব তারহীব, তাবারানী, ইবনে হেব্বান।

সূরা মূলক ও সূরা সেজদা পাঠকারীর অবস্থা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কোন এক কবরের উপর তাবু স্থাপন করলেন। তার জানা ছিল না যে, সেখানে কবর রয়েছে। তিনি তাবুর অভ্যন্তরে বসা ছিলেন। এমনি সময়ে হঠাৎ তিনি ভূতলে জনৈক ব্যক্তির কোরআন মজীদের সূরা মূলক পাঠের কণ্ঠ শুনলেন। সে সমস্ত সূরাটিই পাঠ করলেন। এ ঘটনা নবী করীম (সঃ)-কে অবগত করা হলে তিনি বললেন ঃ "এ সূরা কবর আযাবকে বাধা দান করে, আর ঐ লোককে আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ রাখছে।" —তিরমিযী।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোরআন মজীদে এমন একটি সূরা রয়েছে, যার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ। সে সুরাটি কারো জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে সুপারিশ করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। সে সূরাটি হচ্ছে সূরা মূলক (অর্থাৎ তাবা-রাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুল্‌কু)। —তিরমিযী, আবু দাউদ।

হযরত খালেক ইবনে মাদান (র) সূরা মূলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সেজদাহ্ প্রসঙ্গে বলতেন, এ সূরা দু'টি কবরে তার পাঠকদের পক্ষ নিয়ে আল্লাহ তাআ'লার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআ'লার কাছে বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের কালাম না হয়ে থাকি তাহলে আমাকে তোমার কিতাব হতে বিলীন করে দাও।" খালেদ ইবনে মাদান (র) আরো বলতেন, এ সূরাদ্বয় কবরে পাখীর ন্যায় ডানা মেলে তার পাঠককে ঢেকে রাখে, কবর আযাব থেকে রক্ষা করে। —দারেমী, মেশকাত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিয়মান হল যে, এ সূরা দু'টি পাঠের ফলে, কবর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) শয্যায় এ দু'টি সূরা পাঠ করা ছাড়া নিদ্রা যেতেন না। —তিরমিযী।

পেটের অসুস্থতায় মৃত্যু হলে

হযরত সোলায়মান ইবনে মুরাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ পেটের অসুস্থতায় যার মৃত্যু হয়, কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

—তিরমিযী, আহমদ।

পেটের অসুস্থতা অনেক ধরণের হতে পারে, তার কোন একটিতেই মৃত্যু হলে কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। হাদীসের এবক্তব্যের মধ্যে পেট সংক্রান্ত যাবতীয় অসুস্থতাই শামিল। যেমন কলেরা, বমি পেট বেদনা ইত্যাদি।

জুমআ'র রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান ব্যক্তির জুমআ'র রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে, আল্লাহ তাকে কবরের আযাব ও পরীক্ষা হতে নিরাপদে রাখেন। —তিরমিযী, আহমদ।

রমযান মাসে মৃত্যু হলে

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রমযান মাসে কবরে মৃতদের শাস্তি মূলতবী রাখা হয়। —বায়হাকী।

হযরত আনাস (রা) আরো বলেন, রাসূলল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন মুসলমান জুমআ'র দিনে ইনতেকাল করলে তাকে কবর আযাব হতে নিরাপদ রাখা হয়। —শরহে সুদূর, আবু ইয়ালা।

মুজাহিদ, সীমান্ত প্রহরী ও শহীদগণের মর্যাদা

হযরত মিকদাম ইবনে মায়াদ ইয়াকরাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লার কাছে শহীদগণের জন্য ছ'টি পুরস্কার রয়েছে। তা হল–

(১) রক্তের প্রথম ফোঁটা পতিত হওয়ার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করা হয়। আর জান্নাতে তাঁর যে বাসস্থান রয়েছে তা তাঁকে প্রদর্শন করা হয়।

(২) শহীদগণকে কবর আযাব হতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হবে।

(৩) শিংগা ফুঁকের সময় মানুষ যেভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তাঁরা তা থেকে নিরাপদ থাকবেন।

(৪) শহীদগণের মাথায় সম্মানের প্রতীক স্বরূপ এমন এক মূল্যবান তাজ পরান হবে, যার ইয়াকুত পাথরগুলো দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান ও উত্তম হবে।

(৫) জান্নাতে তাঁদের সঙ্গীরূপে বাহাত্তর জন অপরূপা হুর প্রদান করা হবে।

(৬) সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের সুপারিশকে কবুল করা হবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

হযরত সালমান ফারেসী (রা) বলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহর পথে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য সীমান্তের প্রহরায় একদিন এক রাত কাটানো, একমাস নফল রোযা এবং এক মাস রাতভর নফল নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম। প্রহরায় নিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে যে আমল করছিল, কেয়ামত পর্যন্ত তাকে সে আমলের ছওয়াব প্রদান করা হবে এবং শহীদদের ন্যায় তার জীবিকাও চলতে থাকবে, আর সে কবরের আযাব এবং পরীক্ষা হতেও নিরাপদ থাকবে। —মুসলিম।

হযরত আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থেকে নিহত হলে অথবা জয়ী হলে, তাকে কবরের পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় না। —নাসায়ী, তাবারানী।

কবর যে ব্যক্তির লাশ গ্রহণ করেনি

হযরত আনাস (রা) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তিকে নবী (সঃ)-এর লেখক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে ইসলাম ত্যাগ করে কাফের-মুশরেকদের দলে যোগদান করল। নবী করীম (সঃ) তার জন্য বদ্দোয়া করলেন যে, মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। অতঃপর তার মৃত্যু হলে হযরত আবু তালহা (রা) তার কবরের কাছে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে ব্যক্তির লাশ কবরের বাইরে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি সেখানকার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এ লাশ বাইরে কেন ? লোকেরা বলল, এ লাশ আমরা কয়েকবার দাফন করেছি, কিন্তু কবর, তা গ্রহণ করে না। প্রত্যেকবারই মাটি তাকে কবরের বাইরে ফেলে দেয়। তাই আমরাও লাশটি কবরের বাইরে রেখে দিয়েছি। —বোখারী, মুসলিম।

গ্রন্থকার বলেন, আমি এক ওস্তাদের জবানীতে শুনেছি যে, মদীনা শরীফের জনৈক আলেমের কবর বিশেষ প্রয়োজনে পুনরায় খনন করা হয়। খনন শেষে দেখা গেল উক্ত কবরে এক যুবতী নারীর লাশ রয়েছে। কেউ কেউ এ যুবতী মহিলাকে চিনত। তাদের জানা ছিল যে, এ যুবতী হচ্ছে অমুক শহরের এক খ্রিস্টানের কন্যা। সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে তার পিতা-মাতার কাছে ঘটনার রহস্য জানতে চাইল এবং এর কবর কোথায় তা-ও জিজ্ঞেস করল। তারা তার কবর দেখিয়ে বলল, সে আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিল, সে মনে মনে মদীনা শরীফে সমাহিত হওয়ার আশা পোষণ করত। অতঃপর তার কবর খনন করে দেখা গেল, তার কবরে মদীনা শরীফের সে আলেমের লাশ রয়েছে– যার কবরে এ যুবতীর লাশ পাওয়া গেছে। অতঃপর আলেমের স্ত্রীর কাছে তার আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সে বলল, আমার স্বামী ছিলেন খুব নেককার ও পরহেজগার ব্যক্তি। এতদস্বত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, খৃষ্টানধর্মে স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করার কোন বিধান নেই, এটা খুবই সহজতর নিয়ম। তখন লোকেরা মনে করল, খ্রিস্টান ধর্মের এ নীতি পছন্দ করার কারণেই তার লাশ খ্রিস্টান মহিলার কবরে পৌঁছেছে। আর আন্তরিকভাবে মুসলমানী আদর্শ পছন্দ করার কারণে ঐ যুবতীর লাশ মদীনার ঐ আলেমের কবরে এসেছে।

কবরে সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখান হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে কবরে সকাল-সন্ধ্যায় তার স্থায়ী নিবাস জান্নাত অথবা জাহান্নাম দেখান হয়। সে জান্নাতী হলে তার সম্মুখে জান্নাতের দৃশ্য

পেশ করা হয়। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামের দৃশ্য পেশ করা হয়। এ কবর হচ্ছে তোমার শান্তি অথবা শাস্তির নিবাস। অবশেষে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তোমাকে তোমার সেই চিরস্থায়ী নিবাসের কাছেই পুনরুত্থিত করবেন, সকাল সন্ধ্যায় তোমাকে যা দেখান হচ্ছে।

মৃত্যুর পর নবী-রাসূলগণ কবরে মানবদেহরূপেই জীবিত থাকেন

আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র) তার প্রণীত আম্বারুল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বীয়া পুস্তকে লেখেছেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণ যে, কবরে মানবদেহরূপে জীবিত রয়েছেন, আমরা তা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা অবগত হয়েছি। এ বিষয়টি প্রমাণাদির দ্বারা দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণিত।

ইমাম বায়হাকীও এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করে বলেছেন, নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। যেসব বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণ করা হয়, তন্মধ্যে এ হাদীসটি অন্যতম যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, নবী করীম (সঃ)-কে যে রাতে উর্ধ্বমণ্ডলে (মেরাজে) নেয়া হয়েছে, সে রাতে তিনি হযরত মুসা (আ)-এর কবরের নিকট দিয়ে গমন করেছেন। তাঁকে তিনি কবরে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। —মুসলিম।

মুহাদ্দিস হাফেজ আবু নাঈম (র) হিলইয়াতুল আওলিয়া কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত এক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) হযরত মুসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখেছেন।

হাফেজ আবু ইয়ালা স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (রঃ) হায়াতুল আম্বীয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "নবী রাসূলগণ স্ব স্ব কবরে মানবদেহ নিয়েই জীবিত আছেন। তাঁরা সেখানে নামায আদায় করেন। এ নামায আদায় করা তাঁদের প্রতি ফরয হিসেবে নয়। কেননা কবরের জীবনে কোন মানুষ শরীয়ত পালনে দায়িত্বশীল থাকে না। বরং এ নামায হচ্ছে তাঁদের আল্লাহ প্রেমের সুধা লাভ করার জন্য।

ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী (র) হযরত আউস ইবনে আউস ছাকাফী (রা) থেকে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমআ'র দিন। সুতরাং তোমরা ঐ দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে প্রেরণ করা হয়।" সাহাবী (রা) গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সালাত ও সালাম পাঠ আপনার কাছে কিভাবে প্রেরণ করা হবে ? আপনি তো তখন অণুতে পরিণত হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবেন! প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন ঃ "আল্লাহ তাআ'লা মাটির জন্য নবী-রাসূলদের দেহ মোবারক ভক্ষণ করা হারাম করেছেন।" —আবু দাউদ, হাকেম।

ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় গ্রন্থে লেখেছেন, নবী-রাসূলগণ মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি বহু বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তার মধ্যে মেরাজ রাতে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি অন্যতম। সে রাতে একদল নবী-রাসূল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং পরস্পরে কথাবার্তাও বলেছেন। —বোখারী।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সঃ) মেরাজের আলোচনায় বলেছেন ঃ "আমি নিজকে একদল নবী রাসূলের সমাবেশের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, হযরত মুসা (আ) দণ্ডায়মান হয়ে নামায পড়ছেন। তাঁর দেহ মোবারক হালকা ও ছিপছিপে এবং মাথার কেশরাজি কোকড়ানো। তাঁকে শানুয়াহ কবীলার লোক মনে হচ্ছিল। আমি হযরত ঈসা (আ)-কে দেখলাম, তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দাড়ান অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি। তাঁদের চেহারা আকৃতি অনেকটা তোমাদের সাথী মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মেলে। এ সময় নামাযের ওয়াক্ত হলে আমি তাদের ইমাম হয়ে নামায আদায় করি। —মুসলিম।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ আবু নাঈম (র) তার দালায়েলুন নবুয়ত গ্রন্থে এবং যুবায়ের ইবনে বক্কার তার আখবারে মদীনা গ্রন্থে এবং ইবনে সায়াদ (র) তাবকাত গ্রন্থে, আর দারেমী স্বীয় মসনদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ইয়াযীদের হুররাহ বাহিনী দ্বারা যখন মদীনা আক্রান্ত হয়, তখন সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (র) অনবরত মসজিদে নববীতেই অবস্থান করেন। তখন মসজিদের বাইরে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও রক্তারক্তি চলছিল। তিনি তখন মসজিদে নববী হতে আদৌ বের হলেন না। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আযান এবং ইকামত হয়নি। সাইয়্যেদ ইবনে মুসায়্যেব (র) বলেন, নামাযের সময় হলেই আমি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের দিক থেকে এক প্রকার বিশেষ আওয়াজ শুনতে পেতাম। যা দ্বারা আমি বুঝতাম যে, নামাযের সময় হয়েছে। এ দিনগুলোতে হযরত সাইয়্যেদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র) ছাড়া কোন লোকই মসজিদে নববীতে ছিল না।

—মেশকাত, দারেমী।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সমস্ত নবী-রাসূলই নিজ নিজ কবরে মানবদেহ রূপেই জীবিত আছেন। পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা শহীদগণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ *

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁদেরকে জীবিকা প্রদান করা হয়।"

শহীদগণ প্রসঙ্গেই যখন বলা হয়েছে যে, তোমরা তাঁদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তাঁরা জীবিত এবং তাঁদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকা লাভ করেন, তখন নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য হবে না কেন ?[১]

তাঁরা তো শহীদগণের তুলনায় অনেক অনেক গুণ সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। মোটকথা নবী-রাসূলগণ কবরে মানবদেহরূপে জীবিত থাকা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। সুতরাং বলা যায় যে, এ আয়াতের সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে নবী-রাসূলগণও শামিল।[২]

বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) মৃত্যুজনিত পীড়াকালে বলেছেন ঃ "আমি খায়বার অবস্থানকালে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আহার করেছিলাম, তার ক্রিয়া আমি প্রায়ই অনুভাব করি। সে সময় বিষক্রিয়ায় আমার হৃৎপিণ্ড সংশ্লিষ্ট শিরাটি কেটে নিয়েছে।[৩]

---

১. কোরআন মজীদে وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলনা।" আয়াতের ব্যাখ্যায় বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন শহীদগণ সম্পর্কে এ কথা বলা যে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে– যদিও জায়েয ও সঠিক। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্য লোকদের মৃত্যুর মত মনে করা ঠিক নয়। তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পর কবরের জীবনে প্রত্যেকের আত্মাই জীবিত থাকে। এর প্রতিই প্রতিদান প্রদান ও শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এরূপ জীবন ও শহীদগণের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট হচ্ছে শহীদগণের জীবন অন্যান্যদের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। এমনকি শহীদগণের জীবিত থাকার একটি নির্দশন হল সাধারণ মৃতদের দেহের চেয়ে তাদের দেহ অক্ষত অবস্থায় থাকে, পচে গলে না, মাটি তা আহার করেনা। জীবিতদের দেহের ন্যায় অক্ষত থাকে। যা বিভিন্ন হাদীস ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। এ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তাদেরকে অন্যান্য মৃত দেহের ন্যায় ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে। অপরদিকে শহীদগণের জীবিত থাকার তুলনায় নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকা অনেক বেশী স্বাতন্ত্র ও শক্তির অধিকারী। তাঁদের বাহ্যিক মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকার একটি নিদর্শন আমরা খুজে পাই শরীয়তের বিধানের মধ্যে। কোন জীবিত লোকের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপ নবী রাসূলগণের স্ত্রীগণকেও বিয়ে করা হারাম। তাদের পরিত্যাক্ত ধন সম্পদও মিরাছ হিসেবে বন্টন হয়না। সুতরাং বলা যায় যে, নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকা অন্যান্যদের তুলনা সবচেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত, তারপরে শহীদগণের জীবিত থাকার বিষয়। এরপর সাধারণ মানুষের স্তর।

২. শহীদগণ যে এ মান মর্যাদা লাভ করেন, তা নবী-রাসূলগণের আনুগত্যের ফলেই হয়েছে। নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করে জীবন যাপন না করলে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ না করলে তারা এরূপ মর্যাদার অধিকারী হতে পারতেন না। সুতরাং নবী-রাসূলগণের পরেই তাদের মর্যাদা।

৩. নবী করীম (সঃ)-কে বিষ পান করাবার ঘটনা– খায়বর বিজয়ের পর নবী করীম (সঃ) সেখানে অবস্থান করছিলেন। এক ইহুদী মহিলা ভুনা করা বকরীর মাংসের সাথে বিষ মিশিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করল। তিনি তা থেকে এক টুকরা আহার করলেন। তাঁর সাথে আরও কয়েকজন সাহাবীও আহার করলেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা এ গোশত আহার করা হতে বিরত থাক। অতঃপর ঐ মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বলল আপনাকে একথা কে বলেছে। নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার হাতের এ টুকরই আমাকে এ কথা বলেছে। মহিলা বলল, হা আমি বিষ মিশিয়েছি। নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমার এরূপ করার উদ্দেশ্য কি? মহিলা বলল, আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে পরীক্ষা করা, বাস্তবিকই আপনি যদি নবী হন তাহলে এ বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আপনি যদি তা না হন তাহলে আমরা আপনার থেকে মুক্তি পাব। অর্থাৎ এ গোশত আহারে আপনি মারা যাবেন। নবী করীম (সঃ) এ মহিলাকে ক্ষমা করলেন, তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। যেসব সাহাবা এ গোশত আহার করেছিলেন তারা মৃত্যুমুখে পতিত হল। সে সময় নবী করীম (সঃ) স্বীয় কাঁধে শিংগা লাগিয়ে ছিলেন যাতে বিষক্রিয়া দূর হয়। [পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রঃ]

ইমাম বায়হাকী (র) কিতাবুল ইতেকাদ গ্রন্থে লেখেছেন যে, নবী রাসূলগণের রূহ কবজ করার পর তা পুণরায় কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তাঁরা শহীদগণের মত তাঁদের প্রতিপালকের কাছে জীবিত আছেন।

আল্লামা কুরতুবী (র) স্বীয় কিতাবুত তাযকিরা গ্রন্থে লেখেছেন, মৃত্যু নিছক সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার নাম নয়, বরং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়াকে মৃত্যু বলা হয়। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, শহীদগণ নিহত হওয়ার পর কবরে জীবিত থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিকাও লাভ করেন, আর খুব আনন্দ চিত্তে সময় অতিবাহিত করেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য জীবিতদের মতই হয়ে থাকে। শহীদগণের অবস্থাই যখন এই, তখন নবী রাসূলগণের জীবিত থাকা আরো শত গুণে যুক্তি যুক্ত। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মাটি কখনো নবী-রাসূলগণের দেহ মোবারক ভক্ষণ করে না। আর নবী করীম (সঃ) যে, মেরাজ রাতে বায়তুল মোকাদ্দাসে অন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তা-ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর নভমণ্ডলে ভ্রমণকালেও নবী করীম (সঃ)-এর সাথে অন্যান্য কয়েকজন নবী-রাসূলের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়েছিল। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে কবরে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, তার প্রতি কেউ সালাত ও সালাম প্রেরণ করলে তিনি তার জবাব প্রদান করেন।

এছাড়া আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার সারাংশ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, নবী-রাসূলগণের মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে, তাঁদেরকে আমাদের থেকে গোপন করে রাখা, যাতে আমরা তাঁদের জীবিত থাকাটা অনুভব করতে না পারি। যদিও তাঁরা কবরে জীবিতই অবস্থান করছেন। তাঁদের অবস্থা হচ্ছে ফেরেশতাদের ন্যায়, তাঁরা সর্বদা জীবিত, কিন্তু আমরা তাঁদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। —আম্বরাউল আযিকিয়া।

এখানে আমরা আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (র)-এর আম্বারুল আম্বিয়া গ্রন্থ থেকে বিষয়টি সংক্ষেপ করে উল্লেখ করলাম। সে গ্রন্থে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ করে কবরে নবী-রাসূলগণের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। মূলতঃ আলমে বরযখ বা কবরের জীবন হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র জগৎ। তার বিষয়গুলো পার্থিব জগতে অবস্থান করে বুঝা যায় না। আমাদের শুধু এটুকুই বুঝতে হবে যে, এ জগতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। অনুরূপভাবে সেখানেও রয়েছে বিভিন্ন স্তর। সবচেয়ে শক্তিশালী জীবন হচ্ছে, নবী-রাসূলগণের জীবন। আর তারপর হচ্ছে শহীদগণের জীবন। এরপর অন্যান্য মৃতদের জীবন।

[পূববর্তী টিকার বাকী অংশ] কোন কোন বর্ণনায় আছে, পরে ঐ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল। সম্ভবত প্রথমাবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়নি। বিষ পানে যখন বাশার ইবনে মায়াবার (রা)-এর ইনতেকাল হয়, তখনই কিসাসের বিধান অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়। বিদায়া আননিহায়া গ্রন্থকার এ ঘটনা উল্লেখ করার পর লেখেছেন, এর পর নবী করীম (সঃ) তিন বছর জীবতি ছিলেন। এ বিষ ক্রিয়ার কারণে নবী করীম (সঃ)-এর শহীদী মৃত্যু হয়। কারণ যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁকে এ বিষ পান করান হয়েছিল। আর যুদ্ধাবস্থায় আহত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে মৃত্যু হলে সে যে, শহীদ হয়, তা ঐক্যবদ্ধভাবে সাব্যস্ত। নবী করীম (সঃ)-এর বেলায়ও তা-ই হয়েছিল।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মেরাজ রাতে হযরত মুসা (আ)-এর কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে কবরে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পেলেন। তাঁদেরকে সাথে নিয়ে নামাযের ইমামতী করলেন। অতঃপর তিনি নভমণ্ডলে পৌঁছলে সেখানেও কয়েকজন নবী-রাসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে ইতিপূর্বে কবরে নামায পড়তে-দেখেছিলেন। অতঃপর তাঁর সাথে ষষ্ঠ আকাশে সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) বারবার আল্লাহ তাআ'লার দরবারে গিয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে আনেন। নভমণ্ডলে যেসব নবী-রাসূলদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ)ও ছিলেন। যেহেতু হযরত ইসা (আ) এখন পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেননি, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এ দুনিয়াতে পুনরায় আগমন করবেন এবং কাফের দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ কারণেই তাঁকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

—আল ইসাবা ফি তামীযেস সাহাবা।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও ঈসা (আ) ইহজাগতিক রূপেই জীবিত ছিলেন। পরস্পর সাহাবী হওয়ার জন্য যা একান্ত অপরিহার্য। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ এ সময় আলমে বরযখ তথা কবরে জীবিত ছিলেন, যাদের সাথে মেরাজ রজনীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি এক সময় মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে নবী করীম (সঃ)-এর সাথে সফর করেছিলাম। এ সময় তিনি একটি উপত্যকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ কোন উপত্যকা ? উপস্থিত লোকেরা বলল, এ হচ্ছে আরযাক উপত্যকা। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি যেন হযরত মুসা (আ)-কে দেখছি।" একথা বলার পর তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর দেহের রং ও চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন, আর বললেন ঃ "আমি যেন তাকে দেখছি, তাঁর উভয় হাতের আঙ্গুলিসমূহ কানে দিয়ে আছেন, আর স্বীয় প্রতিপালকের নামে তালবীয়া পাঠ করতে করতে এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন।"

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এরপর আমরা সম্মুখে চলতে চলতে অন্য এক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলাম। এ উপত্যকা সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এ কোন্ উপত্যকা?" উপস্থিত লোকগণ বললেন, এ হচ্ছে হারশী উপত্যকা। তখন তিনি বললেন ঃ "আমি যেন হযরত ইউনুস (আ)-কে দেখছি, তিনি একটি লাল বর্ণের উটের পিঠে আরোহণ করে আছেন। তাঁর দেহে রয়েছে সুতার তৈরি জুব্বা আর উটের লাগামটি গাছের বাকল দ্বারা তৈরি। তিনি তালবীয়া পাঠ করতে করতে এ উপত্যকা অতিক্রম করছেন।"

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সঃ) তাঁদেরকে জাগ্রত অবস্থাতেই তালবীয়াহ পাঠ করতে দেখেছেন। বুঝা গেল নবী-রাসূলগণের কবরের জীবন এত শক্তিশালী, পূর্ণাঙ্গ ও উন্নত যে, তাঁরা এ দুনিয়াতেও (মৃত্যুর পরও) স্বশরীরে আগমন করতে পারেন এবং হজ্বের বিধানসমূহও সম্পাদন করতে পারেন। আর মানব চোখে তাঁদেরকে অবলোকন করাও সম্ভব। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল হক দেহলবী (র) মেশকাতের শরাহ 'আশরাতুল লুমাত' গ্রন্থে লেখেছেন ঃ "নবী-রাসূলগণ কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি সব বিশেষজ্ঞদের একটি ঐকমত্য বিষয়, এতে কারোই দ্বিমত নেই। তাঁদের এ জীবন পার্থিব জীবনের ন্যায় দৈহিকভাবে জীবন্ত জীবন। তাঁদের জীবনকে আধ্যাত্মিক ও মরমী জীবন ভাবা উচিত নয়।

আলমে বরযখ তথা কবরের জীবন হচ্ছে এ পার্থিব জীবন হতে ভিন্নতর জীবন এবং বিস্ময়করও বটে। সেখানকার অবস্থা পার্থিব অবস্থা দ্বারা কেয়াস বা অনুমান করা যায় না।

কবরে নবী করীম (সঃ)-এর কাছে উম্মতের আমল পেশ করা হয়

হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "আমার জীবন যেমন তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর, তেমনি আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর। আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার কাছে পেশ করা হবে। সুতরাং তোমাদের পুণ্যময় যে আমল আমি দেখব, তার জন্য আল্লাহ তাআ'লার প্রশংসা করব। আর তোমাদের খারাপ আমল দেখতে পেলে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।" —জামউল ফাওয়ায়েদ।

উম্মতের দরূদ ও সালাম ফেরেশতাগণ রাসূল (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে দেন

রওযা মেবারকের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করলে স্বয়ং হুযুর (সঃ) নিজ কানে তা শুনতে পান, আর দুর হতে কেউ পাঠ করলে ফেরেশতাগণ তা হুযুরের কাছে পৌঁছে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআ'লার অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন যারা দুনিয়াতে ঘোরাফেরা করেন, আর আমার প্রতি আমার উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেন।

—নাসাঈ, ইবনে হেব্বান, তারগীব ও তারহীব।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা যে কোন স্থানেই থাক না কেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। —তারগীব তারহীব, তাবারানী।

ইতিপূর্বে হযরত আউস ইবনে আউস (রা) হতে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের

দরূদ ও সালাম আপনার কাছে কিভাবে পেশ করা হবে ? আপনি তো তখন মাটির সাথে মিশে যাবেন! প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা মাটির জন্য নবী-রাসূলদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা জুমআ'র দিন আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করবে। কেননা এ দিনটি একটি ফযিলতপূর্ণ দিন। তোমাদের কেউ আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে সে এ কাজ হতে বিরত হওয়ার আগেই অবশ্যই তা আমার কাছে পেশ করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মৃত্যুর পরও কি আপনার কাছে দরূদ পৌঁছানো হবে ? তিনি বললেন ঃ "হাঁ মৃত্যুর পরও পৌঁছান হবে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা মাটির প্রতি নবী-রাসূলদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবীগণ কবরে জীবিতই থাকেন এবং তাদেরকে জীবিকাও প্রদান করা হয়।"

—নাসায়ী, তারগীব তারহীব, ইবনে মাজা, হাকেম।

রাসূল (সঃ)-এর রওজায় সাহাবায়ে কেরামগণের সালাম পেশ করা

তাবেঈ হযরত আব্দুলাহ ইবনে দিনার (র) বলেছেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ করেছেন এবং হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর জন্য দোয়া করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা) বিদেশ সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে এবং বিদেশ হতে ফিরে আসার সময় নবী করীম (সঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং দরূদ পাঠান্তে দোয়া করে চলে যেতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা) সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমতঃ নবী করীম (সঃ)-এর রওজা পাকের কাছে আসতেন। অতঃপর দরূদ পাঠ করতেন, কিন্তু রওজা মোবারক স্পর্শ করতেন না। তারপর আবু বকর (রা)-এর প্রতি সালাম দিতেন। আর স্বীয় পিতা ওমর (রা)-এর প্রতি সালামে বলতেন, হে আমার পিতা! আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি এভাবে সালাম বলতেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর শান্তি বর্ষিত হোক আবু বকর (রা)-এর প্রতি।[১]

—আল কাওলুল বাদিউ–২১০ পৃঃ।

কাজী আয়াজ (র) শিফাউত তারীফ ও হুকুকুল মোস্তফা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৯ পৃষ্ঠায় লেখেছেন, হযরত নাফেউ (রা) বলেছেন, আমি ইবনে ওমর (রা)-কে রওজা মোবারকের কাছে এসে একশ'বার বা তার চেয়েও অধিকবার এভাবে বলতে দেখেছি–

اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَلسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ *

"নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আমার পিতার প্রতিও বর্ষিত হোক শান্তি।" এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যেতেন।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে লেখেছেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) সফরে গমনকালে কিংবা সফর থেকে ফিরে এসে নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পতি দরূদ পাঠ করতেন এবং দোয়া করে চলে যেতেন। অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ (র) লেখেছেন, যারা মদীনা মোনাওয়ারায় উপস্থিত হয়, তাদের এভাবেই করা উচিত। মদীনায় উপস্থিত হলে রওজা মোবারকের কাছে গিয়ে দরূদ পাঠ করা উচিত। —মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ।

হাফেজ সাখাবী (র) "আল কাওলুল বাদিউ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হযরত আনাস (রাঃ)ও এরূপ আমল করেছেন। তিনি নবী করীম (সঃ)-এর রওজা পাকের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতি সালাম করে চলে যেতেন। কাজী আয়াজ (র)ও তাঁর আশশেফা গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। —আল কাওলুল বাদিউ।

অন্য লোকের মাধ্যমে রওজা মোবারকে সালাম পৌঁছান

হাফেজ শামসুদ্দিন সাখাবী (র) তদ্বীয় আল কাওলুল বাদিউ গ্রন্থে ইবনে আবী দুনিয়া এবং ইমাম বায়হাকী (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) ইয়াজীদ ইবনে আবু সাঈদ মাদানীকে বললেন ঃ তুমি যখন মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছবে, তখন নবী করীম (সঃ)-এর রওজা মোবারকে আমার সালাম পৌছাবে। —আর কাওলুল বাদিউ ৩১১ পৃঃ।

এ হাদীসটি শেফা গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। আরও লেখা হয়েছে যে, ওমরে ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) রওজা মোবারকে তাঁর সালাম পেশ করার জন্য দামেস্ক হতে দূত পাঠাতেন। —শেফায়া– দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ।

দুনিয়ার সামাজিক নিয়ম হচ্ছে মানুষ পরস্পরের সাক্ষাতে মুসাফাহা ও সালাম বিনিময় করে। মহান আল্লাহ তাআ'লাও দয়াপরবশে এ নিয়ম প্রচলিত রেখেছেন যে, কোন মুসলমান দুর-দূরান্ত হতে তাঁর নবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করলে ফেরেশতাদের দ্বারা তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর কার্যদি দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতা ছাড়াও মদীনায় আগমনকারী লোকদের মাধ্যমে রওজা পাকে সালাম প্রেরণ করা বৈধ।

এসব হাদীস দ্বারা একথাও অবহিত হওয়া যায় যে, নবী করীম (সঃ)-এর কবরের জীবনেও স্বীয় উম্মতদের সাথে সম্পর্ক বহাল রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা এ উম্মতদের সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তিনি এ মহৎ কাজের জন্য তাঁর ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা উম্মতের সালাম যথাসময় রাসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে দেন। ফেরেশতাগণকে সালাম পৌছাবার কাজে নিয়োজিত রাখা দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সঃ) হাজের ও নাজের নন। তিনি যদি সর্বত্র হাজের-নাজের হতেন, তাহলে ফেরেশতাগণকে সালাম পৌছাবার জন্য নিয়োগ করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। হুজুর (সঃ)ই যখন সর্বত্র হাজের নাজের নন, তখন অলীআল্লাহগণের ব্যাপারে সর্বত্র হাজের-নাজের থাকার ধারণা এবং এ আকিদা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সুতরাং বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করা উচিত।

ওহুদ যুদ্ধের কোন কোন শহীদের লাশ বহু বছর পরও অক্ষত থাকার প্রমাণ

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক গ্রন্থে আছে, হযরত আমর ইবনে জামুহ আনসারী (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর আনসারী (রা) উভয়ে ওহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হলে দু'জনকেই একই কবরে দাফন করা হয়। দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পার পানি প্রবাহের কারণে তাদের কবরটি ভেঙ্গে যায়। তখন অন্যস্থানে দাফন করার প্রয়োজনে তাদের কবর খনন করা হয়। খননান্তে তাদের লাশ দু'টি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, তাঁরা গতকাল শহীদ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের দেহে জখম ছিল এবং দাফনের পূর্বে যখমের স্থানটি তাঁর নিজ হাত দ্বারা চেপে ধরা ছিল। প্রথমবার এ অবস্থায়ই তাদেরকে দাফন করা হয়, দ্বিতীয়বার কবর খননের পর জখম হতে হাত সরান হয়েছিল, কিন্তু পুনরায় হাত নিজে নিজেই পূর্বের স্থানে এসে স্থাপিত হল। ওহুদ যুদ্ধ এবং এ ঘটনার মধ্যে ব্যবধান ছিল ছেচল্লিশ বছর। —মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক।

এ ঘটনাকে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) আল বিদায়া ওয়াননিহায়া গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণকে যে স্থানে দাফন করা হয়েছিল, সে স্থান দিয়ে মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে একটি নহর খননের পরিকল্পনা করা হল। তখন শহীদগণের লাশ মোবারক অন্যত্র সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সেখানে শহীগণের কবর খনন করেছি। আমি আমার পিতার লাশ এমন অবস্থায় পেলাম যে, মনে হয় তিনি যেন নিজের অভ্যাস মাফিক ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর কবরে তাঁর সাথে আমর ইবনে জামুহ আনসারী (রা)-কেও দাফন করা হয়েছিল। আমি তাকে দেখলাম, তাঁর হাত দ্বারা দেহের একটি যখম চেপে ধরা। হাতটি জখম হতে সরান হলে জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) লেখেছেন, এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে, তাদের কবর থেকে মেশকের সুঘ্রাণ পাওয়া গিয়েছিল। আর এ ঘটনা দাফন করা থেকে ছেচল্লিশ বছর পরের ঘটনা।

এছাড়া আল্লামা ইবনে কাছীর (র) মুহাদ্দিস বায়হাকী (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেছেন ঃ মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ওহুদ প্রান্তর দিয়ে নহর কাটার জন্য মাটি খনন করা হয়। খননকালে শহীদ হামযা (রা)-এর পায়ে গিয়ে কোদালের আঘাত লাগে। এর ফলে লাশের আহত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছিল।

—আল বিদায়া ওয়াননিহয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩ পৃঃ।

ওহুদের শহীদগণ ছাড়াও মুসলিম জাতির শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনী গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, দাফনের পর বহু বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁদের লাশ বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি।

নবী-রাসূলদের প্রসঙ্গে হাদীসে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁদের মোবারক দেহকে মাটি পচাতে বা গলাতে পারে না।

তবে নবী নয় এমন কোন ব্যক্তিকেও যদি আল্লাহ তাআ'লা এ সৌভাগ্য ও মর্যাদা দান করেন, তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমতার বাইরে কোন বিষয় নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কেয়ামত ও হাশরের ময়দান

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের জন্য নিবেদিত। আর সালাত ও সালাম প্রেরণ করছি আল্লাহর রাসূল আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাকুলের প্রতি।

পার্থিব এ জগতে যারাই আগমন করেছে তার প্রত্যেকেই এ জগৎ ছেড়ে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে। অর্থাৎ নিজের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করত পর জগতে গিয়ে উপনীত হয়েছে। কবর জগতে যেমন আছে সুখ ও শান্তি, তেমনি আছে দুঃখ ও অশান্তি। নিজ নিজ আমল অনুযায়ী কবর জগতের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। যারাই পার্থিব এ জগৎ হতে বিদায় নেয়, তারাই প্রথমে স্থান পায় কবর জগতে। মোটকথা প্রত্যেক আগমনকারীকেই এখানে থেকে বিদায় নিয়ে প্রত্যাগমন করতে হবে।

মানব এবং জ্বিন জাতির আয়ুষ্কাল যেমন নির্ধারিত, তেমনিভাবে এ পার্থিব জগত আলামের আয়ূও রয়েছে নির্ধারিত। এ জগতের আয়ু যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হঠাৎ সামগ্রিকভাবে এর মৃত্যু ঘটবে। এককভাবে মানুষের প্রত্যাগমনকে মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়, আর সৃষ্টিকুল ও পুরো জগৎ শেষ হওয়াকে কোরআনের পরিভাষায় কেয়ামত বলা হয় জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব রহস্য বর্ণনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا *

"যিনি এ জন্যই জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদেরকে পরখ করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কারা ভাল ও উত্তম আমল করে।" —সূরা মূলক।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কারা ভাল আর কারা মন্দ কাজ করে তা বিচার বিশ্লেষণ করার জন্যই রব্বুল আ'লামীন জীবন ও মৃত্যুর ধারা প্রচলন করেছেন। প্রথমে এ পার্থিব জীবনে ভাল কাজ করার সুযোগ দিয়ে এবং তার পথ জানিয়ে দিয়ে মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জীবন রাখা হয়েছে, যার কথা নবী রাসূলদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, ওহে মানব মণ্ডলী! তোমাদেরকে অবশ্যই মৃতবরণ করতে হবে এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে। জীবিত হওয়ার পর মহান সৃষ্টিকর্তা আসল মালিকের কাছে জীবনের হিসাব নিকাশ দিতে হবে। আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদে মানব সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ *

"অনন্তর এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। —সূরা মু'মিন।

অর্থাৎ এ জীবনই আসল জীবন নয়। জাগ্রত সচেতন, হাসি-খুশী ও বাকশক্তি সম্পন্ন এবং দৃষ্টিমান ও মরণশীল যে প্রাণ তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, সে জীবন চিরস্থায়ী জীবন নয়। মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করে আর একটি জীবনে তোমাদের পদার্পণ করতে হবেই। আর নিজের প্রিয় প্রাণ সহ জীবন দাতার দরবারে দাড়িয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমলের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়ার বাস্তব দৃশ্য তোমাদের অবলোকন করতে হবে।

আমাদের প্রতিদান লাভ অবশ্যম্ভাবী, এ ব্যাপারে সমস্ত সুধীমণ্ডলী ঐকমত্য পোষণ করেন। প্রচলিত কথায় যেমন বলা হয় যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমনি দুনিয়ায় মানুষ যে কাজ করে তার প্রতিদানও পরকালে দেওয়া হবে। কোরআন মজীদে কেয়ামতের দিনকে ইয়াওমুদ্দ্বীন (প্রতিদান লাভের দিন), ইয়াওমুল ফসল (মীমাংসার দিন) এবং ইয়াওমুল হিসাব (হিসাব নিকাশের দিন) বলা হয়েছে। এদিন আত্মীয়-স্বজন কোন উপকারে আসবে না, সেদিন শক্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকবে না, সেদিন মানুষ হবে সহায় সম্বলহীন। প্রত্যেকের সম্মুখে তাদের নিজ নিজ আমল পেশ করা হবে। ভাল মন্দ সবই তারা অবলোকন করবে। সূরা যিলযালে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"কেয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে যাতে তারা তাদের আমল দেখতে পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি অনু পরিমাণও পুণ্যময় কাজ করবে, তাকে তা দেখান হবে। আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণে খারাপ কাজ করবে, তাকেও তা দেখান হবে। —সূরা যিলযাল।

কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে নিজে একাকীই উপস্থিত হবে। কেউই সেদিন কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا *

"আল্লাহ তাআ'লার কাছে তাদের সংখ্যা গণনা করে রাখা হয়েছে, কেয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তাঁর সম্মুখে একাকী উপস্থিত হবে।"

—সূরা মরিয়ম– ৬ রুকু।

মানুষ এ জগতে যা কিছু করে, তার অধিকাংশই সে দুনিয়ায় থাকতেই ভুলে যায়, তারপর পরকালে তা কিভাবে স্মরণ রাখবে? কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত আমল সম্পর্কে তাকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ *

"যেদিন আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, সেদিন তিনি তাদের পার্থিব ক্রিয়াকর্মগুলো তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাআ'লা তা সবই সংরক্ষণ করে রেখেছেন, কিন্তু তারা তা ভুলে গেছে।"

—সূরা মুজাদিলা – ১ম রুকু।

এখন প্রশ্ন হল, ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যবস্থা কেয়ামতের দিন করলেন কেন? মৃত্যুর পরে সাথে সাথেই কবরে কেন চূড়ান্ত মীমাংসার ব্যবস্থা করলেন না? এর জবাবে বলা যায়, আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মহা কৌশলী ও মহা জ্ঞানী। তাঁর প্রজ্ঞা ও ভবিষ্যৎদর্শিতার ইচ্ছা হচ্ছে, চূড়ান্ত ফয়সালা ও প্রতিদানের জন্য কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানে এ বিষয়ে অনেক উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতা নিহিত। আমরা ভাসমান দৃষ্টি ও সীমিত জ্ঞানে যা কিছু বুঝি তা হচ্ছে– এজগতে মানুষের সাথেই মানুষের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টজীবের সাথেও রয়েছে তার সম্পর্ক। আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সাথে সদাচার ও উত্তম সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কারো জান ও মালের প্রতি যেন কোন জুলুম-অত্যাচার না করা হয়। এক সৃষ্টিকুলের প্রতি অন্য সৃষ্টিকুলের যে হক ও অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কেও শরীয়ত সকলকে অবহিত করেছে। মানুষের দায়িত্বে শুধুমাত্র অন্য মানুষের হক ও অধিকারই থাকে না বরং তার দায়িত্বে আল্লাহ তাআ'লারও অনেক হক ও অধিকার রয়েছে। সে হক ও অধিকারের বিশদ বিবরণ শরীয়তে বিদ্যমান। এ কথার পাশাপাশি আমাদেরকে এও বুঝতে হবে যে, নেক ও বদ আমল উভয়ই দু'শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথমতঃ মানুষ যেসব কাজ করে, তা করার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় এবং তা করার পর মানুষ পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, করার পর পরই তা শেষ হয়ে যায় না, বরং তার ফল বা ক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে। আর এ আমলের কারণে তার কর্তাও অনবরত পুরস্কার বা শাস্তি লাভের পাত্রে পরিণত হয়। যেমন কেউ বক্তৃতা বা লেখা দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করল। আর এ প্রচারের ফলে দুনিয়ায় পুণ্যময় কাজ ও পরিবেশ সৃষ্টি হল। অথবা কেউ পানির কূপ খনন করল অথবা সরাইখানা নির্মাণ করল, অথবা অন্য কোন কাজ করল, যার সওয়াব বহুদিন জারি থাকে। সুতরাং এসব কাজের পুণ্য চলমান থাকা অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তারপরও তার পুণ্য চলমান থাকবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে যদি কেউ খারাপ কাজ করে, অথবা কাউকে গুনাহের পথ বাতলে দেয়, অথবা এমন কোন পুস্তক প্রণয়ন করে যা মানুষকে গুনাহের কাজে উৎসাহিত করে। অথবা এমন কোন কাজ করে যার কারণে সর্বদা গুনাহ চলমান থাকে, তাহলে সর্বাবস্থায়ই তার আমলনামায় গুনাহ লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। এ ব্যক্তির মৃত্যু হলে পরও এর আমলনামায় গুনাহের পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং সে সর্বাধিক শাস্তির পাত্রে পরিণত হবে।

এর দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট হল যে, জীবিত থাকাকালে যেমন মানুষের আমল তার আমলনামায় সর্বদা লেখা হতে থাকে, অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরও ভাল হোক কি মন্দ হোক, তা তার আমলনামায় সংযোজিত হতে থাকে।

এখন বুঝা গেল, কবরের জীবনও একটি কর্মময় জীবন, যেসব আমলের কারণে পরকালে সে পুরস্কার বা শাস্তি পাবে, তা এখনও তার আমলনামায় জারি রয়েছে সুতরাং তার আমলনামায় লিখিত হয়ে চলেছে এমন আমলের পুরো প্রতিদান কিভাবে দেয়া যেতে পারে এবং চুড়ান্ত ফয়সালাও বা কিভাবে হতে পারে? এ ছাড়া মানুষের হক সম্পর্কীয় বিষয়েরও চুড়ান্ত ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই কেয়ামতকে চুড়ান্ত ফয়সালার দিন ধার্য করা হয়েছে। কেননা কবরের জীবনে সমস্ত হকদার ও পাওনাদার উপস্থিত থাকবে না। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময়টি ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক। কবর জগতে আজ সে ব্যক্তির আগমন হয়েছে যে অন্য লোকের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে, সে মজলুম ব্যক্তি এখনো জীবিত। সে হয়ত দশ বছর পর কবর জগতে গমন করবে। অথবা সে আরো যাদের প্রতি জুলুম করেছে, তারা হয়ত বিশ বছর পর পৌঁছবে। সুতরাং সুবিচারের দাবী হচ্ছে, ঘটনার বাদী ও বিবাদী উভয়ের ফয়সালা কালে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত থাকা। তা হলেই সুবিচার করা সম্ভব হয়। কেননা এটা না হলে কোন বা পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিচার করা হলে অন্য পক্ষ তখন অভিযোগ করার সুযোগ পায়। আর উভয়ের উপস্থিতিতে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হলে তখন কোন পক্ষই অবিচার বা তার হক ও পাওনা পুরাপুরি না দেয়ার অভিযোগ করতে পারে না। আর বিবাদীর একথাও বলার সুযোগ থাকে না যে, আমি উপস্থিত থাকলে হয়ত বাদী আমাকে ক্ষমা করতেন। মোটকথা বিভিন্ন উপযোগিতা ও কল্যাণকারিতার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআ'লা আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য কেয়ামতের দিনকে ধার্য করেছেন। এটা মানবকল্যানেরই দাবী। সুতরাং মানবকল্যাণ ও উপযোগিতার দাবী হল– প্রতিদান দেয়া ও ফয়সালার জন্য এমন এক নিদক্ষণ ধার্য হওয়া, যেদিন সকলে উপস্থিত থাকে। আর সেদিন সর্বপ্রকার আমল, তা নিজে করুক অথবা কোন বান্দার মাধ্যমে তার আমলনামায় যোগ হোক, লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়। আর এরূপ হলেই সকলের সম্মুখে ফয়সালা হতে পারে এবং সমস্ত আমলের প্রতিদানও পুরোপুরি দেয়া যায়। আর এ দিনক্ষণ তারিখকেই কেয়ামত বলা হয়। কেয়ামতের দিন এ পার্থিব জগৎ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে, সর্বপ্রকার আমল ও আমলের ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আগের পরের সকল মানুষকে জীবিত করে উপস্থিত করা হবে। সেদিনই হবে চুড়ান্ত ফয়সালা এবং সেদিন সকলে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে।

এখন আমাদের মনে যে প্রশ্নটি থেকে যায়, তা হচ্ছে– এ পার্থিব জগতেই কেন ফয়সালা হচ্ছে না এবং প্রতিদানও কেন দেয়া হচ্ছে না? এর জবাবে প্রথম কথা হচ্ছে, এ পার্থিব জগত হচ্ছে আমলের স্থান, এখানে মানুষকে পরীক্ষার জন্য আনা হয়। আমল করার স্থানেই যদি আমলের প্রতিদান দেয়া হয়, তাহলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্য জগত ও বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আর পরীক্ষার উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়। এ দুনিয়ায় মানুষের আমল সর্বদাই

চলমান থাকে। পুণ্যময় বহু আমল দ্বারা অনেক সগিরা গুনাহ্ ক্ষমা হয়। আর এখানে গুনাহ্ হতে তাওবা করারও অবকাশ থাকে। এ কারণেই এ জীবনের পর পরকালের জীবনে ফয়সালা হওয়া এবং আমলের প্রতিদান দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কেয়ামতের দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সকলের ফয়সালাও শেষ হয়ে যাবে। তখন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ পরিণতি অনুযায়ী হয় জাহান্নামে, অথবা জান্নাতে গিয়ে উপনীত হবে। যেসব মুমিন গুনাহগার লোক বদ আমলের কারণে জাহান্নামে যাবে, পরবর্তীতে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লার ইচ্ছায় জাহান্নাম হতে বের করে ঈমানের কল্যাণে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু কাউকেই জান্নাত হতে বের করে অন্য কোথাও পাঠান হবে না। কেয়ামতের ফয়সালার পর জান্নাত লাভের ফয়সালাই হচ্ছে মানব জীবনের আসল সাফল্য। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদণ করবে। আর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করান হবে, সে-ই হবে সফলকাম। এ পার্থিব জীবন প্রতারণাময় সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয।"

—সূরা আলে ইমরান- ১৯ রুকু।

মানুষের আমলের ফয়সালা কেয়ামতের দিন হওয়া এবং জান্নাত বা জাহান্নাম অর্জনের আকারে তা লাভ করার বিশদ বিরণ কোরআন ও হাদীসের পাতায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমান ছাড়া অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুর পর আমলের প্রতিদান লাভের বিষয়ে কিছু কিছু অনুমান ও ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের এ অনুমান ও ধারণা ভিত্তিহীন। এর মূলে সঠিক কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। এর কারণ হল, তারা এসব ধারণাসমূহকে নিজদের অলীক চিন্তা দ্বারা স্থির করে, যা আল্লাহ্ তাআ'লার রাসুলগণের শিক্ষা এবং তাদের বর্ণনাকৃত আকিদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন কোন কোন জাতির মধ্যে পুনর্জন্মবাদের চিন্তাধারা ও আকিদা বিশ্বাস প্রচলিত, যা সম্পূর্ণরূপে মানুষের মনগড়া বিষয়। তাদের ধারণা হচ্ছে, মৃত্যুর পর মানবাত্মা অন্য মানুষ বা প্রাণীর অবয়বে স্থান নিয়ে দুনিয়াতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। আর এটা সর্বাদাই হয়ে থাকে। তাদের ভাষায় একেই পুর্নজন্মবাদ বলা হয়। তারা এ আকিদা বিশ্বাসকে আল্লাহর রাসূলদের নিদের্শিত কথা মেনে নিয়ে রচনা করেছে তা নয়। বরং এ আকিদা বিশ্বাস রচনা করার কারণ হচ্ছে, তারা এ পার্থিব জগতে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর দেখতে পাচ্ছে। কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ধনশালী, কেউ গরীব, কেউ মনিব, কেউ ভৃত্য। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে অনেক ব্যবধান বিদ্যমান। এহেন শ্রেণী বিভিন্নতা ও উচু-নীচু হওয়ার কি কারণ? এ বিভিন্নতার মূল দর্শনটি তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা যদি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জারিকৃত জীবন বিধান তথা শরীয়তকে জানত, বুঝত, তাহলে এহেন শ্রেণী

বিভিন্নতার অনেক কারণ তাঁদের কাছে ধরা পড়ত। তাই তারা অপারগ হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে এ মনগড়া আকিদা রচনা করেছে যে, পূর্ব জন্মে যাদের প্রতি করুণা করা হয়েছে, তারই পরিণত ফল হচ্ছে এ ভাল ও মন্দ অবস্থা।

এসব গণ্ডমুর্খদের এ মনগড়া আকিদা বিভিন্ন দিক দিয়ে ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এ আকিদা বিশ্বাসকে কিছু সময়ের জন্য সমর্থন করলেই একজন সাধারণ বুঝমান লোকের কাছে এ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় যে, আমলের প্রতিদান মূলতঃ তাকেই বলা যায়, যার সম্পর্কে প্রতিদান গ্রহণকারী জ্ঞাত হয় এবং বিশ্বাস করে যে, এ শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট আমি অমুক অমুক আমলের কারনে পাচ্ছি। শান্তি বা শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি যদি না জানে যে, এটা অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তাহলে তাকে প্রতিদান বলা অর্থহীন। দুনিয়াতে যারা বর্তমান আছে, তারা যদি এটা জানতে না পারে যে, এ শান্তি বা শাস্তি অমুক স্থানের অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তাহলে দুনিয়ার সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তিকে পূর্বজন্মের পরিণতির ফল কিভাবে ভাবতে পারে ? ঐ শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তি যখনই জ্ঞাত হতে পারবে যে, এ শাস্তি অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তখনই সে হবে লজ্জিত ও অবনমিত। সে তখন অনুশোচনা করবে, হায়! আমি যদি এ আমল না করতাম।

মোট কথা আসল সত্য হচ্ছে তা-ই, যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যা কিছু বলেছেন সঠিক বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকেই বলেছেন, নিজের মনগড়া কিছু বলেননি। অনুমান, ধারণা ও কল্পনাকে তিনি স্থান দেননি। এসবকে তিনি ভ্রান্ত, অলীক ও অর্থহীন বলেছেন।

এখন আমরা কোরআন মজীদ ও মহানবী (সঃ)-এর হাদীসের আলোকে কেয়ামত বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো। কেয়ামতের এ বিবরণ সত্য ও বাস্তব। এটাকে সত্য মনে করে নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত।

কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কেউ তা স্বীকার করুক বা না করুক, মানুক, বা না মানুক, আল্লাহ কেয়ামত অনুষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য, অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে। কোরআন নাযিলের যমানাতেই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অনেক মানুষ অস্বীকার করত। আর বর্তমান যুগেও এ অবিসংবাদিত সত্য অস্বীকার করার অনেক লোকই বর্তমান। কোরআন নাযিলের যমানায় যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত; কোরআন মজীদ তার বিভিন্ন পাতায় তার জবাব দিয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মানুষ আমাদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করেছে এবং নিজের জন্মবিষয় ভুলে গেছে। সে বলছে, আমাদের হাড় অস্থিমজ্জাসহ মাটিতে বিলীন হওয়ার পর তা আবার কে পুনরুজ্জীবিত করবে? —সূরা ইয়াসীন, ৫ম রুকু।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআ'লা মানুষের অর্থহীন দাম্ভিকতার অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন, মানুষ আল্লাহ্ তাআ'লার অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে বলছে যে, আমাদের হাড়গুলো মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় তা জীবিত করবে কে? এ কথাগুলো বলার সময় মানুষের নিজের জন্মের ব্যাপারে একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। চিন্তা করলে তার মুখ থেকে এমন কথা প্রকাশ পেত না। কিন্তু সে নিজের সৃষ্টি ও জন্মের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। মানুষ তো এক ফোঁটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আর সে সৃষ্টির কর্তা তো আল্লাহ তাআ'লাই। তিনি যখন এক ফোঁটা পানি দ্বারা মানুষকে প্রথম বার সৃষ্টি করতে সমর্থ্য তখন দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা তার ক্ষমতার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। এটুকু চিন্তা করলেই মানুষ তার এ প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেত। তাই আল্লাহ তাআ'লা এ প্রশ্নের উত্তর দানে বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ *

"হে নবী! আপনি ওদেরকে বলে দিন, সে মহান সত্তাই তাদেরকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে পুরোমাত্রায় জ্ঞাত।" —সূরা ইয়াসীন, ৫ম রুকু।

অর্থাৎ যে মহান সত্তা প্রথমবার হাড়গুলোকে অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন এবং তাতে প্রাণ দিয়ে একটি জীবন্ত অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। তিনি সীমাহীন ক্ষমতাধর সত্তা। তার পক্ষে যেকোন কাজ করাই সহজ। দেহ ও হাড়ের অংশ এবং অস্থিমজ্জা যেখানেই থাক না কেন কিংবা বিলুপ্ত হোক না কেন, তার প্রতিটি অংশ ও অণু সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি পরিজ্ঞাত। তিনি যে কোনভাবে সৃষ্টি করতে পুরাপুরি সক্ষম। চিন্তা করার বিষয়, যে মহান সত্তা এক ফোটা বীর্যকে বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত করার পর একটি জীবন্ত অবয়ব গঠন করে তাকে প্রাণবন্ত করে তুললেন, তার পক্ষে মৃত লাশগুলো বা অস্থিমজ্জা ও হাড় মাটির মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা কি অসম্ভব? তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন না?

প্রথমবার অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে যিনি রূপ দান করেছেন, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার পূর্ণ অবয়বে জীবিত করা সহজ হওয়া তো মানব বোধজ্ঞানেরই দাবী। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ *

"আর তিনিই মহান সত্তা যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন। আবার তিনিই তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর এ পুনরুজ্জীবিতকরণ তার পক্ষে প্রাথমিক সৃষ্টি অপেক্ষা আরো সহজতর কাজ।" —সূরা রুম – ৩য় রুকু।

অর্থাৎ আত্ম উপলব্ধির ব্যাপার, যে মহান সত্তা কোন উদাহরণ, নকশা ও অবয়ব ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করলেন, তিনি কেন তাদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে সক্ষম হবেন না? তার পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি দু'ই সমান। সাভাবিক চেতনা অনুভূতির দিক দিয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় দ্বিতীয়বার পুনরায় সৃষ্টি করাই তো সহজ হওয়া উচিত। যিনি প্রথম জীবন্ত অস্তিত দিয়ে প্রাণবস্তু রূপ দান করলেন, মৃত্যুর পর তিনি তাকে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে না পারা তো বিস্ময়ের কথা। তাই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি নভমণ্ডল ও ভুমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করতে তিনি কিছু মাত্রও ক্লান্তি বোধ করেননি, বরং তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে পুরামাত্রায় সক্ষম। প্রত্যেক জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতাবান।" —সূরা আহযাব – ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় বড় বড় জিনিসগুলো আপন ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পক্ষে কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা অসম্ভব ও আর্শ্চাযের ব্যাপার? না, কখনো নয়, নিঃসন্দেহে তিনি তা করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা উপমা পেশ করে বিষয়টি আরো খোলাশা করে বলেন ঃ

"আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নির্দশন হচ্ছে, আপনি পৃথিবীকে দেখছেন, শুষ্ক হয়ে আছে। অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করি। ফলে তা আন্দোলিত ও উজ্জীবিত হয়। সুতরাং যিনি এ পৃথিবীকে জীবিত করেন, তিনিই মৃতকে জীবিত করে থাকেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

—সূরা হামীম সাজদা– ৫ম রুকু।

অর্থাৎ যে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ পৃথিবীর মাটি জীবিত করেন, তিনিই মৃতের দেহে দ্বিতীয়বার প্রাণ দিয়ে জীবত করবেন।

কোন এক সময় জনৈক সাহাবী নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআ'লা দ্বিতীয়বার তার সৃষ্টিকে কিভাবে জীবিত করবেন, বর্তমান সৃষ্টিকুলের মধ্যে কি এমন কোন উদাহরণ পাওয়া যায়? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বলেন, তোমার কি কখনো এমন হয়নি যে, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের বন-জঙ্গলে ভ্রমণ করেছ, যখন তা শুকিয়ে মরে গিয়েছে। তারপর তুমি পুনরায় সেখানে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলে যে, সে বনজঙ্গলের গাছ-পালা, তরুলতা জীবিত হয়ে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। সাহাবী (রা) বললেন, হ্যাঁ এমন সব বনজঙ্গলে আমার ভ্রমণ হয়েছে। নবী করীম (সঃ) বললেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে মৃতকে দ্বিতীয়বার জীবিত করার নির্দশন। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা মৃতদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করে থাকেন।

—মেশকাত।

কোরআন মজীদের কিছু কিছু স্থানে কেয়ামত অস্বীকাকারীদের প্রশ্ন উল্লেখ করে, তার জবাব দলিল প্রমাণ দ্বারা দেয়া হয়নি। বরং কেয়ামতে প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দাবীকে পুণর্ব্যক্ত করেছে। যেমন সূরা আস্‌সাফ্‌ফাতে প্রথমতঃ অস্বীকারকারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর জবাবে দাবীকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"যখন আমাদের মৃত্যু হবে এবং আমরা যখন মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো, তারপরও কি আমাদের জীবিত করে উঠান হবে ? আমাদের পূর্ব পুরুষ বাপ দাদাগণকেও কি উঠান হবে ? হে নবী আপনি বলুন, হাঁ; তোমাদেরকে উঠান হবে এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। নিঃসন্দেহে (উত্থিত হবার সময়) একটি প্রচণ্ড শব্দ হবে। আর তখনই তারা তা দেখতে পারবে। তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ, এটাই তো কর্মফল দিবস। এ-ই হচ্ছে ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।" —সূরা সাফ্‌ফাত, ১৬-২১।

সূরা সাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আর কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলব যিনি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেন যে, তোমরা ফেটে ও পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করছে না? অথবা সে পাগলের প্রবাদ বকছে। (সে কিছুই নয়) বরং যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না; তারা গভীর বিভ্রান্তি ও বিপদের মধ্যে নিপতিত।"

—সূরা সাবা, ১ম রুকু।

সারকথা হচ্ছে, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তাআ'লার যখন ইচ্ছে হবে, তখনই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। একে মিথ্যা বলার মত কাউকে পাওয়া যাবে না। কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়টি আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞানে নির্ধারিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে মানুষের সন্দেহ ও বির্তক করায় আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা প্রকাশ করবেন না। আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রশ্ন উল্লেখ করে প্রত্যুত্তরে বলেছেন ঃ

"তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে বল প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? হে নবী! আপনি বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তা একঘন্টা আগে অথবা পরেও হবে না।" —সূরা সাবা, ২য় রুকু।

এ অধম কিয়ামতের নিদর্শন ও আলামত বিষয়ে একখানা পুস্তিকা রচনা করেছে, যা 'নবী করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী নামে পরিচিত। কেয়ামতের আলামত জানার জন্য সে পুস্তিকা অধ্যয়ন করুন।

এখন কেয়ামত যাদের উপর সংঘটিত হবে এবং কেয়ামতের অবস্থার বিবরণ সম্পর্কে লেখব। আল্লাহ তাআ'লাই তাওফিক এনায়েত করে থাকেন।

যাদের বর্তমানে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত খারাপ ও দুষ্ট লোকদের বর্তমানে সংঘটিত হবে। তিনি আরো বলেন, তখনও পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতখন পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ বলার মত কোন লোক বর্তমান থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, এমন কোন মানুষের জীবদ্দশায় কেয়ামত হবে না, যে আল্লাহ আল্লাহ বলে। —মুসলিম, মেশকাত।

এক হাদীসে আছে, যেহেতু মুসলমানের বর্তমানে কেয়ামত হবে অনুষ্ঠিত না, সেহেতু কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে কোন একদিন আল্লাহ তাআ'লা এমন এক বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা মুসলমানদের বগলে লেগে প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণ হানি ঘটবে। তখন দুনিয়ায় শুধু খারাপ ও দুষ্ট লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। যারা (জনসম্মুখে প্রকাশ্যভাবে) নিলর্জ্জভাবে গাঁধার ন্যায় নারীদের সাথে ব্যভিচারি করবে। —তিরমিযী; মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দাজ্জালকে হত্যা করার পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে সাত বছর অবস্থান করবেন। এ যুগে দু' ব্যক্তির মধ্যে সামান্য পরিমাণও বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা সিরিয়ার দিক হতে এমন এক শীতল বায়ু প্রেরণ করবেন, যার কারণে সমস্ত মুসলমানের মৃত্যু ঘটবে। তখন ভুপৃষ্ঠে এমন কেউ বর্তমান থাকবে না, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাল বা ঈমান অবশিষ্ট আছে। এমনকি কোন মুসলমান যদি ঐ সময় কোন পাহাড়ের বদ্ধ গুহায় গিয়েও আশ্রয় নেয়, তাহলে সেখানেও ঐ শীতল বায়ু প্রবেশ করে তার জান কবজ করবে। এরপর দুনিয়ায় শুধু খারাপ ও দুষ্টলোক (কাফের-বেঈমান) ছাড়া কোন মানুষই থাকবে না। তাদের চরিত্র হবে পশু-পাখীর ন্যায়। অর্থাৎ পাখী ও পশুর ন্যায় তারা অন্যের রক্ত প্রবাহিত করবে। তাদের এ অবস্থা দেখে শয়তান মানব আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে এসে বলবে, আহ! তোমাদের হল কি? বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগে তোমাদের কি কিছুমাত্রও লজ্জা হয় না? তারা বলবে তুমিই বল, আমরা কি করব? তখন শয়তান তাদেরকে দেব-দেবী ও মূর্তি পূজা শিক্ষা দেবে এবং তারাও মূর্তি পূজায় আত্মনিমগ্ন হবে। তারা যখন খুব আনন্দ-উল্লাস ও আমোদ-ফুর্তির মধ্যে মহা সুখে জীবন যাপন করবে, তখনই হযরত ইস্রাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দেবেন। সবলোকই শিংগার শব্দ শুনতে পাবে। যারা শুনবে, তারা হয়রান ও অস্থির হয়ে একবার মাথা লুটিয়ে দেবে, আর একবার মাথা উত্তলন করবে।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সর্বাগ্রে যে লোক শিংগার শব্দ শুনবে, সে তখন উটের পানি পান করার হাউজে প্রলেপ দিতে থাকবে। এ লোক শিংগার আওয়াজ শুনে জ্ঞান হারাবে। এরপর অন্যান্য সব লোক বেহুঁশ হবে। এরপর আল্লাহ তাআ'লা শিশিরের ন্যায় গুড়ি গুড়ি বারি বর্ষণ করবেন। এ বৃষ্টির ফলে মানুষ কবরে দেহ সমেত জীবিত হবে।

অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁক দিলে সহসা সব মানুষ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। এরপর ঘোষণা করা হবে, ওহে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে চল। আর ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেয়া হবে– এদেরকে থামাও, এদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর ঘোষণা হবে, এ জনসমুদ্র হতে জাহান্নামীদেরকে পৃথক কর। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করবেন কতজন জাহান্নামী বের করব ? জওয়াব দেয়া হবে, প্রতি হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বই জনকে বের কর।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সেদিনটি এমন ভয়ংকর হবে, যার কারণে শিশুরাও বৃদ্ধে পরিণত হবে। এ দিনটি হবে খুবই বিপদ সংকুল দিন।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায়, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় এ দুনিয়াতে কোন মুসলমান জিবিত থাকবে না। এ ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে আল্লাহ তাআ'লা সেসব লোককেই নিরাপদ রাখবেন, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমানও ঈমান অবশিষ্ট থাকবে।

কেয়ামতের দিন খন কাউকেউ জানান হয়নি

কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। তিনি ছাড়া কোন প্রাণীই তা অবগত নয়। কোরআন মজীদে শুধু বলা হয়েছে যে, কেয়ামত হঠাৎ সংঘটিত হবে। কিন্তু তার নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে অবগত করান হয়নি। কোন এক সময় হযরত জিবরীল (আ) মানবরূপে আগমন করে সমবেত লোকজনের সম্মখে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, এ ব্যাপারে যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকর্তার তুলনায় বেশী কিছু অবগত নয়। অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমি এবং তুমি উভয়ই সমান। তা সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে আমার যেমন কোন ধারণা নেই, তেমনি তোমারও নেই।

একবার লোকেরা যখন নবী করীম (সঃ)-এর নিকট কেয়ামত কখন হবে জিজ্ঞেস করলো, তখন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে আদেশ এল ঃ

"আপনি . ঘোষণা করে দিন, এ বিষয়ে একমাত্র আমার প্রতিপালকই জানেন। তার সময় আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। তখন আকাশ ও পৃথিবীতে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তা তোমাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হবে। তারা কেয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে, মনে হয় যেন আপনি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করেছেন। আপনি বলুন, কেয়ামত হওয়ার সময় সম্পর্কে একমাত্রা আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" —সূরা আরাফ ২৩ রুকু।

কেয়ামত হঠাৎ অনুষ্ঠিত হবে

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "বরং কেয়ামত তাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হবে এবং তাদেরকে জ্ঞানহারা করবে। তখন তা প্রতিহত করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না। এবং তাদেরকে (ঈমান আনার জন্য) কোন অবকাশও দেয়া হবে না।" —সূরা আম্বিয়া–৩য় রুকু।

এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কেয়ামত হবে হঠাৎ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, তখন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য কাপড় খুলে দেখাশুনা করতে থাকবে। তখনো তা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটি চুড়ান্ত করে কাপড় ভাঁজ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, কেয়ামত অবশ্যই এমন অবস্থায় হবে যে, এক লোক তার উটের দুধ দোহন করে ফিরতে থাকবে, কিন্তু এখনও তা পান করেনি। কেয়ামত এমন অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে যে, মানুষ তার হাউজ মেরামত করতে থাকবে, কিন্তু এখনো পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারেনি। এমন অবস্থায় হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে যে, মানুষ আহারের জন্য গ্রাস তুলবে কিন্তু তখনও তা মুখে নিতে পারেনি।
—বোখারী মুসলিম, মেশকাত।

অর্থাৎ বর্তমান যুগে মানুষ কাজ-কারবারে খুবই ব্যস্ত থাকে। এমনিভাবে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনেও মানুষ দৈনন্দিন কাজ-কারবারের মধ্যে খুব ব্যস্ত থাকবে, তখন হঠাৎ কেয়ামত সংঘটিত হবে।

যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিনটি হবে শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমআ'র দিন। এ দিনেই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়েছে, এ দিনেই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর এ জুমআ'র দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে; রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জুমআ'র দিনই কেয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ তাআ'লার নিকটবর্তী প্রত্যেক ফেরেশতা এবং নভমণ্ডল ভূমণ্ডল, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র এরা সবই জুমআ'র দিনকে ভয় করে। কারণ তারা মনে করে, হয়ত আজই কেয়ামত হয় নাকি। —ইবনে মাজাহ।

কেয়ামতের দিন যা হবে

শিংগা ও শিংগায় ফুঁক

হযরত ইস্রাফীল (আ)-এর শিংগায় ফুঁকের দ্বারা কেয়ামতের সূচনা হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সূর হচ্ছে একটি শিংগা, যাতে ফুঁক দেয়া হবে।
—তিরমিযী।

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, শিংগায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা যখন শিংগায় ফুঁক দেয়ার জন্য তা মুখে নিয়ে অপেক্ষমাণ, তখন আমি মৃত্যুর পর কিভাবে জীবন অতিবাহিত করব? ফেরেশতা তো শিংগায় মুখ লাগিয়ে এবং কান পেতে ও মাথা অবনত করে অপেক্ষায় রয়েছে যে, কখন ফুঁকের নির্দেশ দেয়া হয়? —তিরমিযী, মেশকাত।

কোরআন মজীদে শিংগাকে নাকুর নামে অভিহিত করে বলা হয়েছে ঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ *

"অতএব যখন নাকুরে (শিংগায়) ফুঁক দেয়া হবে, তখন সেদিনটি হবে কাফেরদের জন্য খুবই কঠিন। সেদিনটি তাদের জন্য কিছু মাত্রও সহজ ও আরামপ্রদ হবে না।" —সূরা মুদ্দাসসির- ১ম রুকু।

কোরআন মজীদের অন্য এক সূরায় আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত প্রাণী রয়েছে তারা সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ্ যাকে চান (সে হবে না)। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে, সমস্ত মানুষ হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে এবং দেখতে থাকবে।"

—সূরা যুমার -৭ম রুকু।

কোরআন মজীদ ও হাদীসে দু'বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে চান সে বেহুঁশ হবে না। তারপর জীবিত সবার মৃত্যু হবে। আর পূর্বে যারা মারা গেছে, তাদের আত্মা অচেতন হয়ে পড়বে। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে মৃতদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হবে এবং যারা বেহুঁশ ছিল তাদের বেহুঁশী দূর হয়ে চেতনা ফিরে আসবে। —বয়ানুল কোরআন।

এ সময় সমস্ত মানুষ বিস্ময়কর ও অলৌকিক অবস্থা দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকবে। আর আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য খুব দ্রুত চলতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সহসা তারা কবর হতে উঠে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে দ্রুত পথ চলতে থাকবে। তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? প্রত্যুত্তরে বলা হবে, যা কিছু ঘটেছে তা পরম দয়ালু সত্তার প্রতিশ্রুতি, আর নবী-রাসূলগণ সত্য সংবাদই দিয়েছিলেন। অতঃপর হঠাৎ এক ভয়ংকার আওয়াজ হবে, এমনি সময়ে তাদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।" —সূরা ইয়াসীন, ৪র্থ রুকু।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যাপারে চল্লিশ সংখ্যার কথা বলেছেন। সমবেতগণ আবু

হোরায়রা (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ দ্বারা কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছুর বুঝান হয়েছে? প্রত্যুত্তরে হযরত আবু হোরায়রা (রা) নিজের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে বলেন, আমি জানি না (স্মরণ নেই) যে, নবী করীম (সঃ) চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর বলেছেন ?

দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর আল্লাহ্ তাআ'লা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করবেন। যার ফলে মানুষ কবর থেকে অনুরূপভাবে উথিত হবে যেমন মাটি হতে শাক-সবজী গজিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, মানব দেহের প্রতিটি অংশও যদি বিগলিত হয়ে মাটির সাথে মিশে যায়, কিন্তু একটি হাড়ও অবশিষ্ট থাকে, তবে কেয়ামতের দিন এ হাড়কে ভিত্তি করেই মানব দেহ গঠিত হবে। সে হাড়টি হচ্ছে মেরুদণ্ডের হাড়। —বোখারী, মুসলিম।

কোরআন মজীদের সূরা যুমারের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, শিংগায় ফুঁক দেয়ার কারণে সমস্ত প্রাণী বেহুশ হয়ে পড়বে, কিন্তু যাকে আল্লাহ্ চান সে হবে না। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারকদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

কেউ বলেছেন শহীদগণের বেহুঁশ না হওয়ার কথা বুঝান হয়েছেন। কেউ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ইস্রাফীল ও আজরাঈল (আ)-এর বেহুশ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরশবাহী ফেরেশতাগণকে এর অন্তভূর্ক্ত করেছেন।

কুরআন মজীদের لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ* "আজ কার রাজত্ব? আজ রাজত্ব তো একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর।" আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মুয়ালেমুত তানযীল গ্রন্থকার লেখেছেন, সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হওয়ার পর যখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আজ রাজত্ব কার? তখন এর উত্তরে দেয়ার কেউ-ই থাকবে না। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা নিজেই উত্তর দেবেন যে, আজকের রাজত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর, যিনি একক ও পরাক্রমশালী। অর্থাৎ আজ একমাত্র সে মহান আল্লাহ্ তাআ'লারই রাজত্ব ও শাসন বিদ্যমান। যার সম্মুখে সমস্ত শক্তি আজ পরাভূত, পার্থিব সমস্ত রাজত্ব ও সাম্রাজ্য তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তাদের সাথে আমিও হুশহারা হব। অনন্তর সর্বাগ্রে আমারই বেহুঁশী দূর হবে। তখন হঠাৎ আমি দেখতে পাব যে, হযরত মুসা (আ) আল্লাহ্ তাআ'লার আরশ ধরে এক পাশে দাড়িয়ে আছেন। আমি জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, না আদৌ জ্ঞান হারাননি। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন, إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ যাদের বেলায় আল্লাহ চান, তারা বেহুঁশ হবে না।" —বোখারী, মুসলিম।

সৃষ্টিকূল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়া

হযরত ইস্রাফীল (আ)-এর শিংগা ফুঁকের কারণে শুধু জীবিতগণই প্রাণ হারাবে না বরং সৃষ্টিকুলের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে তা ধ্বংসে পরিণত হবে। আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হবে, তারকারাজি খসে এবং আলোহীন হয়ে পড়বে। আর চন্দ্র সূর্যের আলোও বিলুপ্ত হবে। সমস্ত পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে এবং পাহাড়গুলো নিজ নিজ স্থান হতে উড়ে গিয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। কোরআন ও হাদীসের নিম্নলিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয়।

কেয়ামতের দিন পাহাড় পর্বতের অবস্থা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "মহা প্রলয়! মহা প্রলয় কি ? হে নবী! মহা প্রলয় কি তা আপনি জানেন কি? সেদিন সকল মানুষ দিশেহারা হয়ে পাগলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে। আর পাহাড়সমূহের অবস্থা হবে ধুর্নিত পশমের ন্যায়।

—সূরা আল কারিয়াহ।

উপরোক্ত আয়াতে আল কারিয়া (খট খট আওয়াজ করা) দ্বারা মহা প্রলয় বা কেয়ামতের কথা বুঝান হয়েছে। কারিয়া নামটি এজন্য রাখা হয়েছে যে, সেদিন ভয়-ভীতি এবং কঠিন আওয়াজে কান ঝনঝন করবে। সেদিন মানুষ দিশেহারা হয়ে কীটপতঙ্গের ন্যায় ছুটোছুটি করবে এবং অস্থির অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হওয়ার জন্য স্বজোরে চলতে থাকবে। তারা এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলবে, যেমন কীট পতঙ্গ ছুটাছুটি করে আগুনের আলোয় এসে পড়ে। আর পাহাড়গুলোর অবস্থা এমন হবে যে, তা যেন ধুনা পশম ও তুলা। সেগুলো ধুনার পর যেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অনুরূপভাবে পাহাড়গুলোও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উড়তে থাকবে।

সূরা মুরসিলাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * "আর পাহাড়গুলো যখন উড়তে থাকবে।"

সূরা নাবায় বলেন وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا* "আর পাহাড়গুলোকে পরিচালিত করা হবে এবং সে গুলো পরিণত হবে উজ্জল বালুকায়।"

সূরা নামলে বলেন ঃ "আর আপনি পাহাড়গুলো দেখছেন এবং মনে করছেন যে, এগুলো অটল ও স্থীর হয়ে হয়ে আছে, অথচ (কেয়ামতের দিন) সেগুলো মেঘমালার ন্যায় উড়তে থাকবে। এ কাজটি করবেন সে মহান আল্লাহ তাআ'লা, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সুদৃঢ় করে রেখেছেন।" —সূরা নামল, ৭ম রুকু।

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বিরাট বিরাট পাহাড় ও পর্বতমালাকে দেখে ভাবছেন যে, এগুলো অটল অনড় ও চির স্থীর, কখনোই স্থানচ্যুত হবে না। কিন্তু এমন

একদিন আসবে, যেদিন এসব পাহাড় পূর্বত আল্লাহ তাআ'লার ধ্বংসলীলায় ধুনো পশম বা তুলার ন্যায় চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে উড়তে থাকবে। উড়তে থাকবে আকাশে উড়ন্ত মেঘমালার ন্যায়। মহান আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক জিনিস যথোপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পাহাড় পর্বতমালাকে এমন ভারী ও স্থীর করে সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে পৃথিবী হেলতে দুলতে পারছে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ *

"আর তিনি পৃথিবীতে পাহাড়গুলো এজন্য বানিয়েছে, যাতে পৃর্থিবী তা নিয়ে হেলতে দুলতে না পারে।" অতঃপর এ পাহাড়গুলোকে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লা কেয়ামতের দিন চূর্ণ বিচুর্ণ করে বাতাসের সাথে খণ্ড খণ্ড মেঘমালার ন্যায় উড়াবেন। এ হবে সে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার ক্রিয়া কৌশল, যার কোন কাজই হেকমত বা প্রজ্ঞা শূন্য নয়। সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاۤءً مُّنْبَثًّا *

"আর পাহাড় পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে, অতঃপর তা পরিণত হবে উড়ান্ত ধুলো-বালির ন্যায়।"

আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা

কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিন আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হবে, তার বর্ণনায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "হে নবী! লোকেরা আপনার কাছে পাহাড় পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি তাদেরক বলুন, কেয়ামতরে দিন আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমুলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে পরিণত করবেন সমতল ময়দানে। যাতে আপনি কোন বক্রতা ও উচ্চতা দেখতে পাবেন না। —সূরা তাহা ১০৫-১০৭।

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন মহাপ্রলয়ের কারণে পাহাড়-পর্বতগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেয়া হবে। আর সমগ্র পৃথিবীকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে। কোথাও কোন অসমতল ভূমি থাকবে না, থাকবে না পাহাড় পর্বত, টিলা, উচ্চ ভূমি, মালভূমি ইত্যাদি। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীর দ্বারা পরিবর্তন করা হবে এবং আকাশকেও পরিবর্তন করা হবে। আর মানুষ দণ্ডায়মান হবে একক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে।" —সূরা ইবরাহীম- ৭ম রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বর্তমান আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হবে। তা বর্তমান অবয়ব ও রূপাকৃতিতে বহাল থাকবে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তন করা হলে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, মানুষ তখন পুলসেরাতের উপর থাকবে। —মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এ আয়াতেকারীমায় আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তন হওয়ার যে কথা উল্লেখ রয়েছে, তা হিসাব নিকাশ হওয়ার পর তখনই হবে, যখন মানুষ জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের জন্য পুলসেরাতে গিয়ে উপনীত হবে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে যে, পৃথিবীকে সমতল ময়দানে পরিণত করার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার পূর্বের অবস্থা। হযরত সাহল ইবনে সাআ'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ এমন ভূমিতে সমবেত হবে, যার বর্ণ হবে সাদা ও মেটে রং বিশিষ্ট। এ সময় ভূমি ময়দার রুটির ন্যায় হয়ে যাবে। তাতে কোন নির্দশন বা চিহ্ন থাকবে না।

—বোখারী, মুসলিম।

কেয়ামত সংঘটন কালে আকাশে এ পরিবর্তন সূচিত হবে যে, তার তারকারাজি খসে পড়বে এবং আলোহীন হয়ে যাবে। আর চন্দ্র-সূর্যের আলোও নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে তাতে দরজা সৃষ্টি হবে। যেমন সূরা নাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا *

"যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে হাশর ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসতে থাকবে। আর আকাশমণ্ডলী খুলে দেয়া হবে, তাতে থাকবে অনেক দরজা।" —সূরা নাবা – ১ম রুকু।

অর্থাৎ, সেদিন আকাশে ফাটল সৃষ্টি হয়ে এমন হবে যে, মনে হবে যেন অনেক দরজা সৃষ্টি হয়েছে। সূরা মুরসিলাতে বলা হয়েছে وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ "আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।" সূরা ফুরকানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا *

"যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাগণকে অবতরণ করান হবে।" —সূরা ফুরকান – ৩য় রুকু।

সূরা হাক্কায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "অতএব যখন শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেয়া হবে, তখন পৃথিবী ও পাহাড় উৎক্ষিপ্ত হবে এবং এক ধাক্কায় উভয়কে

চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, সেদিন ঘটবে মহাপ্রলয়'। আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে সেদিন তা বিযুক্ত হয়ে পড়বে। ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় অবস্থান করবে। আর আপনার প্রতিপালকের আরশ সেদিন আটজন ফেরেশতা বহন করবে।"

—সূরা হাক্কাহ – ১ম রুকু।

আকাশ যখন ফাটা শুরু করবে তখন ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে চলে যাবে। সূরা আর রহমানে আল্লাহ তাআ'লা আকাশের অবস্থা বর্ণনায় বলেন ঃ

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ *

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তখন তা হবে রক্ত গোলাপ বর্ণে রঞ্জিত চামড়ার ন্যায়।" —আর সূরা রহমান –৩৭।

সূরা মাআ'রিজে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, সেদিন আকাশ গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফাটল ধরার সাথে সাথে তার রংও বিবর্তন হয়ে লাল বর্ণ ধারণ করবে। সূরা তুরে বলা হয়েছে। يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا "সেদিন আকাশ থর থর করে কাঁপতে থাকবে।"

সূরা ইনশিকাকে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে। আর এ দু'টোই তার করণীয়। আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্য গর্ভ হয়ে পড়বে। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই হবে তার করণীয়। —সূরা ইনশিকাক – ১-৫।

আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং পৃথিবী সম্প্রসারিত হওয়ার নির্দেশ তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে দেয়া হবে। এরা উভয়ই আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্টি। আর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ পালন করাই সৃষ্টির অপরিহার্য কাজ। এরা উভয়ই আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ কার্যকরি করবে। এ কার্যকরি করাই হচ্ছে তাদের কর্তব্য। আর স্বীয় মালিকের সম্মুখে মাথা অবনত করে বিনাবাক্যে তার নির্দেশ মেনে চলাই হবে তাদের করণীয়।

পৃথিবীকে টেনে রবারের ন্যায় লম্বা করা হবে এবং দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব কিছু ধ্বংস করে তাকে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। যাতে পূর্বাপর সমস্ত মানুষ একই সময় দণ্ডায়মান হতে পারে, আর তাদের মধ্যে কোন ব্যবধান ও পর্দা না থাকে। পৃথিবী তার ভুগর্ভের সমুদয় জিনিস ও সম্পদ বাইরে উদগীরণ করে সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভুগর্ভে যত প্রকার খনিজ সম্পদ এবং মৃত লাশ ছিল তা সহ সেসব জিনিস সে উদগীরণ করে ফেলবে, যা মানুষের কর্মের প্রতিদানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির অবস্থা

হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুঁক দিলে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজিও তার বর্তমান বস্থায় স্থিতিশীল থাকবে না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ *

"সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে এবং তারকারাজি যখন ভেঙ্গেচুরে খসে পড়বে।" —সূরা তাকবীর।

আর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ *

" আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে এবং তারকারাজি যখন খসে পড়বে।"

—সূরা ইনফিতার।

এ আয়াতগুলো দ্বারা কেয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং তারকারসমূহ খসে পড়ার কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ *

"অতঃপর যখন তারকাসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।" —সূরা মুরসিলাত।

সূরা কেয়ামাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "মানুষ জিজ্ঞেস করে–কেয়ামতের (মহাপ্রলয়ের) দিন কোনটি? বলুন যখন নয়ন যুগল স্থির ও স্ফীত হবে এবং চন্দ্র হবে জ্যোতিহীন। জ্যোতিহীন হওয়ার কথা উল্লেখের পর বলা হয়েছে, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ "চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে।" অর্থাৎ চন্দ্রই শুধু জ্যোতিহীন হবে না, তার সাথে সূর্যকেও জ্যোতিহীন করা হবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হওয়ার ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হচ্ছে, আরবগণ চন্দ্রের হিসাব দ্বারা মাস ও দিনের হিসাব করতো। এ কারণে চন্দ্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন চন্দ্র সূর্যকে ম্লান করে দেয়া হবে। অর্থাৎ এ দু'য়ের উজ্জ্বলতাকে ম্রিয়মান করে দেয়া হবে। যার দরুন তা না আলো ছড়াবে, না তার আলো কোন বস্তুর উপর পতিত হবে।

ইমাম বায়হাকী (রা) 'আল বায়াছ আন নাশুর" গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) নবী করীম (সঃ)-এর একটি বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিহীন করে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। একথা শুনে হাসান বসরী (র) জিজ্ঞেস

করলেন, কি অপরাধে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? আবু হোরায়রা (রা) বললেন, আমি শুধুমাত্র নবী করীম (সঃ) এর বাণী প্রচার করছি, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু জানি না। একথা শুনে হাসান বসরী (র) চুপ হয়ে গেলেন।
—মেশকাত।

কবর থেকে মানুষের পুনঃরুউত্থিত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন জমিন ফাক করে সর্বাগ্রে আমাকে বের করা হবে। তারপর আবু বকর ও উমর (রা) কবর থেকে উঠবে। অতঃপর আমি বাকী কবরস্থানে যাব। তখন সে কবরস্থানের লোকদেরকে উঠিয়ে আমার সাথে জমায়েত করা হবে। তারপর আমি মক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করব। অবশেষে তাদেরকেও কবর থেকে উঠিয়ে আমার সাথী করা হবে। অতঃপর আমি মক্কা ও মদীনাবাসীদের মধ্যবর্তী স্থানে জমায়েত হব। —তিরমিযী।

যারা কবরে সমাহিত, তারা কাফের হোক বা মুসলমান, দ্বিতীয়বারের শিঙ্গার শব্দ শুনে কবর থেকে বের হয়ে উঠে দাড়াবে। আর যাদেরকে আগুনে জ্বালান হয়েছে অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে, কিম্বা যাদেরকে কোন হিংস্রপ্রাণী মেরে ফেলেছে, তাদের আত্মাকেও দেহ দান করা হবে। অবশেষে তারাও হাশর ময়দানে সমবেত হবে।

মানুষ কবর থেকে উলঙ্গ ও খাতনাহীন অবস্থায় উত্থিত হবে

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন মানুষকে উলঙ্গ পদে, উলঙ্গ দেহে এবং খাতনাহীন অবস্থায় কবর থেকে উঠিয়ে হাশর ময়দানে জমায়েত করা হবে। একথা শুনে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষ সকলেই কি উলঙ্গ হবে? তারা কি একে অপরের প্রতি তাকাবে? (এ রূপ হলে তো খুবই লজ্জার ব্যাপার।) উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! কেয়ামতের দিনটি এত কঠিন ও বিপদময় হবে যে, মানুষের মনে একে অপরের প্রতি তাকাবারও খেয়াল হবে না।
—বোখারী, মুসলিম।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমরা উলঙ্গ পদে, উলঙ্গ দেহে ও খাতনাহীন অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। একথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ "প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় আমি যেরূপ সুচনা করেছি দ্বিতীয়বারও আমি তাদেরকে অনুরূপভাবে সৃষ্টি করব।" অতঃপর বললেন, কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে সর্বাগ্রে পোশাক পরিধান করান হবে।

আলেমগণ লেখেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে এ কারণে সর্ব প্রথম কাপড় পড়ানো হবে যে, তিনি ফকীরকে সবার আগে প্রথম কাপড় দান করেছিলেন। অথবা এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কারণে কাফেরদের দ্বারা আগুনে নিক্ষেপ করার সময় সর্বাগ্রে উলঙ্গ হয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে যাকে পোশাক পরিধান করান হবে, তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমার বন্ধুকে পোশাক পরিধান করাও। অনন্তর জান্নাত হতে দু'খানা চিকন-পাতলা ও নরম কাপড় এনে তাঁকে পরিধান করান হবে। তারপর পোশাক পরিধান করান হবে আমাকে।

—দারেমী, মেশকাত।

কবর থেকে উঠে হাশর ময়দানের দিকে চলা

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ তিন প্রকারে পথ চলে হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। প্রথমঃ পায়ে হেটে চলা। দ্বিতীয়ঃ যানবাহনে আরোহন করে চলা, তৃতীয়ঃ একদল লোক অধঃমুখ হয়ে মুখের উপর ভর করে চলবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ রাসূল! তারা মুখের উপর ভর করে কিভাবে চলবে? উত্তরে তিনি বললেন, যে মহান সত্তা তাদেরকে পায়ের উপর ভর করে চলার শক্তি দেন, নিঃসন্দেহে তিনি তাদেরকে মুখের উপর ভর করে চলারও ক্ষমতা দেবেন। অতঃপর বললেন, তারা মুখের উপর ভর করে এমনভাবে চলবে যে, ভূমির উঁচুস্থান এবং কাঁটা হতে নিজেদেরকে মুখমণ্ডল দ্বারা নিরাপদ রাখবে।" —তিরমিযী, মেশকাত।

কাফেরদের এ অবস্থা হবে। কেননা দুনিয়ার জীবনে তারা নিজেদের মুখগুলকে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উপস্থিত করার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও উপেক্ষা করত। গৌরব ও দাম্ভিকতায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদার জন্য মাথা মাটিতে রাখতে অস্বীকার করত। এ কারণে কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল দ্বারা পদযুগলের কাজ নেয়া হবে, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। মুখমণ্ডলের মালিক ও সৃষ্টিকর্তাকে সেজদা করতে অস্বীকার করার মজা তখন তারা উপলব্ধি করতে পারবে। আল্লাহ তাআ'লা সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি তার সৃষ্টির দেহের প্রত্যেকটি অংশকে তার সেবার জন্য ব্যবহার করাতে পারেন। পার্থিব জগতে দেখা যায় যে, কিছু প্রাণী দু' পদে আর কিছু প্রাণী চার পদে ভর করে চলে। আর কোন কোন প্রাণী শুধু পেটে ভর করে চলে। যেমন কোরআন মজীদে আছে فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ "ওদের মধ্যে কিছু প্রাণী পেটে ভর করে চলে।"

যেসব লোকের একটি মাত্র হাত থাকে, তারা এক হাত দ্বারাই উভয় হাতের কাজ করে। আর যারা অন্ধ তাদের শ্রবণশক্তি ও অনুভূতি হয় খুব প্রখর ও

তীক্ষ্ণ। তারা তাদের দৃষ্টিক্ষমতার কাজ অনেকটা এর দ্বারাই সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফেরগণকে মুখের উপর ভর করে পরিচালানা করবেন, এটা যুক্তি ও বিবেকের কাছে অযৌক্তিক কিছু নয়।

কাফেরগণ কবর হতে অন্ধ, বধির ও বোবা অবস্থায় উঠবে

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا *

"আমি তাদেরকে কেয়ামতের দিন অন্ধ, বধির ও বোবা অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত করব।" —সূরা বনী ইস্রাঈল -১২তম রুকু।

সূরা তাহায় আল্লাহ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জীবন হবে খুব সংকীর্ণ। আর কেয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় হাশর করাব। সে তখন জিজ্ঞেস করবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কেন আমাকে অন্ধ করে কবর থেকে উঠিয়ে হাশর করালেন ? আমি তো দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলাম। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হাঁ; এভাবেই হবে, কেননা তোমার কাছে আমার আয়াত ও নিদর্শন এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। এমনিভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে। যারা সীমালংঘন করে এবং তার প্রতিপালকের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না, আমি তাদেরকে এমনিভাবেই প্রতিদান দেব। আর পরকালের শাস্তি খুবই কঠিন ও চিরস্থায়ী।"

—সূরা তাহা - ৭ম রুকু।

যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাআ'লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম থেকে মুখ ফিরায়ে রাখে এবং আসল মালিকের বাণী শোনার পর তা গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছে, শোনেও শোনেনি, দেখেও দেখেনি। এ কারণেই কেয়ামতের দিন তাদের শোনার, দেখার ও বলার শক্তি হরণ করে তাদেরকে বোবা-বধির ও অন্ধ করে উঠানো হবে। এটা হচ্ছে হাশর ময়দানের প্রাথমিক অবস্থা। এরপর হিসাব নিকাশ ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের অন্ধত্ব-বধিরতা ও নির্বাক অবস্থা দূর করা হবে, যাতে তারা হাশর ময়দানের কঠিন অবস্থা ও বিপদ-আপদ দেখে এবং বুঝে-শুনে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং হিসাব নিকাশের সময় কথা বলতে পারে।

কাফেরদের চোখ হবে নীল বর্ণ

কেয়ামতের দিন কাফেরদের চোখের বর্ণ নীল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন। "সেদিন আমি অপরাধীগণকে সমবেত করবো এমন অবস্থায় যে, তাদের চোখ নীল বর্ণ থাকবে। তারা পরস্পরে চুপে চুপে বলবে, তোমরা দুনিয়ায় শুধু দশ দিন অবস্থান করেছিলে। —সূরা তাহা - ৫ম রুকু।

অর্থাৎ কুৎসিত আকৃতি দেখাবার জন্য তাদের চোখ দু'টিকে নীল বর্ণ করা হবে।

দুনিয়াতে বসবাসের সময়ের অনুমান

হাশর ময়দানে লোকেরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আমরা দুনিয়ায় ক'দিন ছিলাম? সেখানে কতকাল বসবাস করেছি? উপরের আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা পরস্পর আস্তে আস্তে কথা বলবে। কেউ কেউ বলবে, আমরা দুনিয়াতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। পরকালের দীর্ঘতা এবং সেখানকার ভয়-ভীতিজনিত দৃশ্য অবলোকন করে দুনিয়ায় অবস্থান কালিন সময়কে এত কম মনে হবে যে, তারা ধারনা করবে, মাত্র দশদিনের বেশি অবস্থান করেনি। আর কতক লোক বলবে, আমরা দুনিয়াতে মাত্র এক দিনের বেশী ছিলাম না। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا *

"তারা যা কিছু বলছে, আমি তা ভালভাবেই অবগত আছি। তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের লোকেরা যখন বলে, তোমরা দুনিয়াতে এক দিনের বেশী ছিলে না।" —সূরা তাহা।

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও অভিমত দেয়ার যোগ্য, সে বলবে, দশদিন কোথায়? দুনিয়াতে মাত্র একদিনই ছিলাম। এ বক্তাকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলার কারণ হল– দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আখেরাতের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও কাঠিন্যকে সে অন্য লোকের চেয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পেরেছে। সূরা নাযিয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحٰهَا *

"তারা যখন কেয়ামত অবলোকন করবে, তখন তাদের মনে হবে যে, দুনিয়ায় শুধু এক বিকেল বা একটি সকাল অবস্থান করেছি।" —সূরা নাযিয়াত।

আর এখন দুনিয়াতে বসে তোমরা তো বলছ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ "তোমরা সত্যবাদী হলে এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে ?" এও বলছো যে, কেয়ামত কখন হবে ? কিন্তু কেয়ামত যখন হঠাৎ এসে পড়বে, তখন মনে হবে– কেয়ামত খুবই দ্রুত.এসে পরেছে, কিছু মাত্রও বিলম্ব হয়নি। আর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীগণ কসম করে বলবে, আমরা দুনিয়াতে এক ঘন্টার বেশী বসবাস করিনি। এমনিভাবে তারা উল্টো চলবে।" —সূরা রুম।

কেয়ামতের দিন কবর ও দুনিয়ায় অবস্থানের সময়কে খুবই স্বল্প মনে হবে। কেয়ামতের বিপদ মাথায় চেপে বসলেই মানুষ আফসোস করে বলবে, দুনিয়া ও কবরের জীবন খুবই দ্রুত অতিবাহিত হয়ে গেল। দুনিয়ায় আরও কিছু দিন থাকার সুযোগ পেলে এ দিনের জন্য কিছু সংগ্রহ করে রাখতে পারতাম। এখন তো বিপদ এসে মাথায় চড়েছে। তখন দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বিলাসিতা ও দীর্ঘকায় জীবনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। দুনিয়ার জীবনকে বিনা কাজে নষ্ট করা এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম, পদমর্যাদা, আরাম, আয়েশ ইত্যাদিতে যে যুগ যুগ অতিবাহিত করেছে, এত বড় জীবনকেও এক ঘণ্টার জীবন হিসেবে উল্লেখ করবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন كذالك كانوا يوفكون অর্থাৎ এভাবেই দুনিয়ার জীবনে তারা উল্টো কথা বলত, বেহুদা ও অলীক ধ্যান-ধারণা পোষাণ করত। দুনিয়ার জীবনে তারা না সত্যকে স্বীকার করত, না এখনও সত্য বলছে। আল্লাহ বলেন ঃ

যাদের এলম ও ঈমান আছে, কেয়ামতের দিন তারা ঐসব লোককে বলবে, কবরে তোমাদের বসবাস করাটা পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার কিতাবে নির্ধারিত ছিল। সুতরাং আজই হচ্ছে সেই পুনরুত্থান দিন, অথচ তোমরা তা জানতে না। —সূরা রুম- ৬ রুকু।

যারা ঈমানদার, তারা সেদিন ঐসব লোকদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলবে তোমরা মিথ্যা বলছ। এক ঘন্টা অবস্থানের কথাটা নিতান্ত ভুল। আল্লাহ তাআ'লার জ্ঞান ও লাওহে মাহফুজে লিখিত সময় অনুযায়ী তোমরা দুনিয়া ও কবরে অবস্থান করেছ। তার বিন্দু পরিমানও কমবেশী হয়নি। যার যত বয়স নির্ধারিত ছিল, সে ততো বয়সই পেয়েছে। তারপর কবরে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এখন হাশর ময়দানে সমুপস্থিত। আজ হচ্ছে সেই দিন, যে দিনের আগমন ছিল সুনিশ্চিত। যেদিন সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিল, কিন্তু তোমরা তা মানতে না এবং স্বীকার করতে না, এখন তা প্রত্যক্ষ করছ। দুনিয়াতে থাকতেই যদি এ দিনের বাস্তবতা সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করতে; তাহলে এখানকার জন্য ঈমান ও পূণ্যময় কাজ করে প্রস্তুত হয়ে আসতে।

কেয়ামতের দিনে মানুষের অস্থিরতা

কেয়ামতের দিন মানুষ অস্থির, ব্যাকুল ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "জালেমগণ যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে তুমি আল্লাহ তাআ'লাকে অমনোযোগী মনে করো না। তাদের শুধু সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হচ্ছে, যেদিন তাদের নয়ন যুগল হবে বিস্ফারিত এবং তারা মাথা উর্দ্ধে তুলে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দৃষ্টি তাদের নিজদের প্রতি ফিরে আসবে না। আর তাদের মন হবে তখন অস্থির, ব্যাকুল, অনুভুতিহীন।"

—সূরা ইবরাহীম- ৭ম রুকু।

কেয়ামতের দিন মানুষ কবর থেকে উত্থিত হয়ে কঠিন অস্থিরতা ও ব্যাকুলতায় উর্দ্ধমূখী হয়ে ভীতবিহবল অবস্থায় হাশর ময়দানে জমায়েত হবে। তারা বিস্ফারিতনেত্রে অবাক হয়ে দেখতে থাকবে অপলক ভাবে। তাদর মনে আদৌ কোন নিজস্ব অনুভূতি থাকবে না, তারা ভয়ভীতিতে জড়সর হয়ে থাকবে। সূরা হজ্জে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর। নিঃসন্দেহ কেয়ামতের দিনের কম্পন বড়ই ভীবিষিকাময়। যেদিন তুমি তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক দুগ্ধপানকারী স্বীয় দুগ্ধ পোষ্যকে ভুলে যাবে। আর প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত ঘটাবে। তুমি দেখবে, মানুষ নেশাখোরের মত পাগল পারা; আসলে তারা নেশাখোর নয়। তবে আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি বড়-ই কঠিন।
—সূরা হাজ্জ ১ম রুকু।

কেয়ামতের দিনে দু'বার ভীষণ কম্পন হবে।✪১ প্রথমতঃ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার কিছু পূর্বে, যা কেয়ামতের আলামতের মধ্যে পরিগণিত। আর দ্বিতীয় কম্পন হবে দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর; মানুষ যখন কবর হতে উত্থিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ আয়াতে যদি প্রথম ফুঁকের কথা বুঝান হয়ে থাকে, তাহলে দুগ্ধ পানকাররিণী স্বীয় শিশুর কথা ভুলা এবং গর্ভধারিণীর স্বীয় গর্ভপাত দ্বারা আসল মর্মই বুঝান হবে। আর দ্বিতীয় মর্ম বুঝান হলে হবে একটি উপমা বিশেষ। অর্থাৎ কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কাঠিন্যতা এত মর্মান্তিক হবে যে, এসময় যদি নারীদের গর্ভে সন্তান থাকে, তাহলে তাদের গর্ভপাত ঘটে যাবে। আর যদি তাদের কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকে, তাহলে তাকেও সে ভুলে যাবে। এ সময় মানুষ এত অস্থির ও ব্যাকুল হবে যে, কোন দর্শক তাদেরকে দেখলে মনে করবে, এরা নেশা পান করে মাতলামী করছে। অথচ সেখানে নেশা পানের কোন ব্যবস্থাই নেই, বরং বিপদের কাঠিন্যতা তাদেরকে জ্ঞান হারা করে দেবে।

কেয়ামতের কঠিন অবস্থার বর্ণনায় কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

✪ ১. তাফসীরে জালালাইনে زلزلة الساعة -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পর এক কঠিন ভূকম্পন সৃষ্টি হবে, যা হবে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়।

তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীলে বলা হয়েছে, যালযালার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত বিদ্যমান। আলকামা ও শায়াবী বলেছেন, এটা হচ্ছে কেয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। আরো কিছু কিছু লোক কেয়ামতের নিদর্শন বলে অভিমত দিয়েছেন। হাসান ও সুদ্দী (র) বলেছেন, এ ভূকম্পন হবে কেয়ামতের দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কেয়ামতের ভূকম্পন কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ভূকম্পন দুনিয়ায় সংঘটিত হবে। কেননা পুনরুত্থানের পর কোন গর্ভ হবে না। আর যাদের মতে কেয়ামতের দিন হবে, তারা বলেন, উদাহরণগুলোতে বর্ণিত বিষয় আসল নয় বরং উপমা বিশেষ নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে– ব্যাপারটা কোলের শিশুকে বৃদ্ধ করেছে। এর দ্বারা ঘটনার কাঠিন্যতা ও বিশেষ গুরুত্ব বুঝান হয়েছে।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا *

"তোমরা যদি কুফরী কর তাহলে সেদিনের বিপদ হতে কিভাবে বাচঁবে, যেদিন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করবে?" —সূরা মুযাম্মিল- ১ম রুকু।

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করে কুফরী করে যদিও দুনিয়ার জীবনে নিরাপদ থাকতে পার, কিন্তু সেদিন কিভাবে তোমরা বাচঁবে? যে দিনের বিপদ ও কাঠিন্যতা অথবা ঐ দিনের দীর্ঘস্থায়িত্ব শিশুকেও বৃদ্ধে পরিণত করবে। সেদিনটি হবে শিশুকে বৃদ্ধ বানাবার মত মহা বিপদসংকুল ও দীর্ঘস্থায়ী। মুলতঃ সেদিন শিশু বৃদ্ধ হবে না বটে, কিন্তু তা এমন মহা বিপদের ও দীর্ঘায়ী দিন হবে, যাতে শিশুও বৃদ্ধে পরিণত হয়ে যায়।

হাশর ময়দানে যা হবে

মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল ও কালিমাময় হওয়া

হাশর ময়দানে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমবেত হবে, কেউ-ই অনুপস্থিত থাকবে না। সেদিন ঈমানদার ও পুণ্যবানদের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল। তাদের মুখমণ্ডলে ভেসে উঠবে সুখ ও আনন্দের রক্তিমাভ আভা। পক্ষান্তরে যারা কাফের মুশরেক-মুনাফেক ও দুষ্ট-দুরাচার, তাদের চেহারা হবে কালীমাময়। তাদের মুখমণ্ডলে দুঃখ ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এ প্রসঙ্গে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন কিছু কিছু চেহারা হবে খুশীতে হাস্যোজ্জ্বল এবং কিছু লোকের চেহারা হবে কালীমাময়। তাদেরকে বলা হবে? তোমরা কি ঈমান গ্রহণের পর কাফের হয়েছিলে? সুতরাং আজ তোমরা কুফরী গ্রহণের কারণে শাস্তি ভোগ কর। আর যাদের চেহারা হবে হাস্যোজ্জ্বল, তারা থাকবে আল্লাহ তাআ'লার অবারিত রহমতের মধ্যে। আর সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী।

—সূরা আলে ইমরান -১১ রুকু।

হাশর ময়দানে কারো কারো চেহারায় ঈমান ও তাকওয়ার নূর উদ্ভাসিত হবে। তাদেরকে খুব সম্মানের সাথে খুশী ও আনন্দিত পরিলক্ষিত হবে। পক্ষান্তরে কারো কারো চেহারায় উদ্ভাসিত হবে কুফরী ও নেফাকীর কালিমা। তাদের মুখমণ্ডলে অপমান ও লাঞ্ছনার ভাব পরিলক্ষিত হবে। প্রত্যেকের বাহ্যিক অবস্থা হবে অভ্যন্তরীণ অবস্থার আয়না স্বরূপ। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

"সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। আর অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসর। যাকে কালীমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। আর তারাই হল কাফের ও পাপাচারী। —সূরা আবাসা- ৩৮-৪২।

হাশর ময়দানে আল্লাহর নেক বান্দাদের মুখমণ্ডল ঈমান ও পুণ্যময় কর্মের কারণে উজ্জ্বল হবে। তাদের চেহারা থেকে খুশী, আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ পেতে থাকবে। আর যেসব লোক দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাআ'লাকে ভুলে ঈমান গ্রহণ করেনি এবং ঈমানের ভিত্তিতে পুণ্যময় কাজও করেনি, বরং কুফরীর দুষ্টামী-নষ্টামী ও অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত ছিল। হাশর ময়দানে তাদের মুখমণ্ডল হবে ধূলো মলিন। তারা অপমান ও লাঞ্জনাসহ উপস্থিত হবে। নিজেদের খারাপ কর্মের দরুন তারা অস্থির ও ব্যাকুল হবে; তারা ভীতবিহবল চিত্তে ভাবতে থাকবে যে, এখানে আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মাথার উপর সে বিপদ ঝুলে আছে, যা আমাদেরকে পর্যদুস্ত করে ফেলবে। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ تَظُنُّ أَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَه "তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে বিপর্যয়মূলক ব্যবহার করা হবে।"

মহানবী (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আ) -এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ হবে। তখন আযরের মুখমণ্ডল হবে ধূল-মলিন ও কালিমায় আচ্ছন্ন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে বলেছিলাম না যে, আমার কথা মেনে চলুন, আমার অবাধ্য হয়েন না। প্রত্যুত্তরে তার পিতা বলবে, আজ আর আমি তোমার অবাধ্য হব না, যা বলবে তা-ই করবো। অনন্তর হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে আবেদন করবেন, হে আল্লাহ! আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মহা বিচারের দিন আপনি আমাকে অপমানিত ও লজ্জিত করবেন না। আজ আমার পিতা ধব্বংস হচ্ছে; এর চেয়ে আমার জন্য অধিক লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তোমার পিতা জাহান্নামের শাস্তি হতে কোনক্রমেই রেহাই পাবে না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পায়ে কি? তিনি তাকিয়ে দেখবেন, একটি শকুন তাঁর পা জড়িয়ে আছে। অতঃপর সে শকুনের পা ধরে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —বোখারী, মুসলিম।

আল্লাহ্ তাআ'লা নিজ কুদরতে আযরকে শুকুনের আকৃতিতে রূপান্তরিত করবেন, যেন হযরত ইবরাহীম (আ) অন্যান্যদের কাছে লজ্জা না পান এবং তিনি পিতাকে নাযেহাল অবস্থায় দেখে মর্মাহত না হন। সুবহানাল্লাহ! চিন্তার বিষয়, কার পিতার পরিণতি এরূপ হল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তাআ'লার বন্ধু। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে তার আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তিনিই আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করেছেন। তাঁর পিতার ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যেসব পীর-ফকীর ও মোল্লারা নিজেদের বংশীয় কৌলিন্যের জন্য গৌরব প্রর্দশন করে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজকে পৈতৃক সম্পর্ক দ্বারা আবৃত রেখে পরকালে ক্ষমালাভের আশা করে, তাদের অবস্থাটি এ হাদীসের আলোকে চিন্তা করার বিষয়।

হাশর ময়দানে ঘামের বিপদ

হযরত মেকদাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশর ময়দানের মহা বিচারের দিন সূর্য মানুষের এত নিকটবর্তী হবে যে, তাদের থেকে তা মাত্র এক মাইল দূরে থাকবে।✪১ আর মানুষ তাদের খারাপ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। সুতরাং কারো ঘাম হবে পায়ের/হাঁটু পর্যন্ত, কারো রানের উপর উরু পর্যন্ত, কারো হবে কোমর পর্যন্ত। আর কারো কারো অবস্থা এই হবে যে, পা হতে মুখ পর্যন্ত আপাদমস্তক তারা ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। তাদের ঘাম লাগামের ন্যায় মুখের মধ্যে প্রবেশ করবে। —মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশর ময়দানে মানুষের এত বেশী পরিমাণে ঘাম বের হবে যে, তা বের হওয়া কখনো শেষ হবে না। মানুষ তখন বলবে, হে প্রতিপালক! এ ঘামের বিপদের তুলনায় আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করাও অনেক সহজতর শাস্তি। হাশর ময়দানের কঠিন শাস্তি অবলোকন করে মানুষ এরূপ বলবে। অথচ জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা তাদের জানা আছে। —তারগীব তারহীব, মুস্তাদরেক হাকেম।

হাশর ময়দানে সমবেতদের বিভিন্ন অবস্থা

ভিখারীদের দুরাবস্থা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মানুষ মানুষের কাছে ভিক্ষা চেয়ে এ অবস্থায় পৌছে যে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্রও মাংসপেশী থাকবে না। —বোখারী, মুসলিম।

অর্থাৎ ভিখারীদেরকে কেয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত করার জন্য এ অবস্থা করা হবে। তাদের মুখমণ্ডলে হাড় ছাড়া আদৌ কোন মাংস থাকবে না। ফলে সমস্ত লোক তাদেরকে দেখে বুঝতে পারবে যে, এরা দুনিয়ার জীবনে ভিক্ষা করে নিজেদের মান-ইজ্জতকে বিনষ্ট করেছিল। আর আজকের দিনেও তাদের কোন মান-সম্মান নেই। তারা লাঞ্ছিত ও অপমাণিত অবস্থায় রয়েছে।

✪ ১. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য আলোহীন হবে। আকাশে ফাটল ধরবে। সুতরাং প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সূর্য আলোহীন হওয়ার পরও হাশর ময়দানের এক মাইল দূরবর্তীতে অবস্থান করে কিভাবে তাপ দিবে?

এ প্রশ্নের উত্তর হল প্রথম কথা সূর্য আলোহীন হওয়ায় তার তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া অপরিহার্য নয়। আর যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, আলোহীন হওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রারও পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাহলে দ্বিতীয় জওয়াব হল সূর্যকে হাশর ময়দানে পুনরায় আলো ও তাপ প্রদান করে মানুষের মাথার উপরে মাত্র একমাইল দূরে রাখা হবে, অবশেষে তাকে আলোহীন করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যাতে সূর্যের পূজারীগণের শিক্ষা হয় এবং তারা বুঝতে পারে যে, এটি যদি বাস্তবিকই পূজা লাভের যোগ্য হত, তাহলে সে জাহান্নামের অনল কুণ্ডে পতিত হত না। মোটকথা কোরআন ও হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখাই হচ্ছে আসল কথা– বাস্তব অবস্থা ও বিন্যাস যা-ই হোক না কেন।

স্ত্রীদের কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো দু'জন স্ত্রী থাকলে যদি সে তাদের মধ্যে ভারসাম্যমূলক সুবিচার ও আচরণ না করে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে একটি পাজর ভাঙ্গা অবস্থায় হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। —তিরমিযী।

কোরআন মজীদ শিখার পর ভুলে যাওয়ার পরিণতি ঃ

হযরত সায়াদ ইবনে উবায়দাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ কোরআন মজীদ পড়া শিখার পর অলসতার কারণে তা ভুলে গেলে, পরকালে সে হাত-কাটা অবস্থায় আল্লাহ তাআ'লার সাথে সাক্ষাৎ করবে। —আবু দাউদ।

আরবী ভাষায় ইজযাম শব্দটির অর্থ হচ্ছে, হাত ও পায়ের আংগুল বিনষ্ট হওয়া। কোন কোন সুধিজন বলেছেন, সে ব্যক্তির দন্তরাজি পড়ে যাবে। অর্থাৎ দাতহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। বাহ্যিক দিক দিয়ে শেষোক্ত মর্মটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা কোরআন মজীদ পাঠ করলেই স্মরণ থাকে। আর পাঠের কাজে জিহবা ও দাত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং দাত না থাকাটাই তার উপযুক্ত শাস্তি।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার কাছে আমার উম্মতের গুনাহের কাজগুলো পেশ করা হলে কোরআন মজীদের কোন সূরা বা আয়াত শিক্ষা নেয়ার পর তা বিস্মৃত হওয়ার তুলনায় বড় কোন গুনাহের কাজ দেখিনি। —তিরমিযী।

বেনামাযীর পরিণতি ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে না, পরকালে নামায তার জন্য নূর, দলিল এবং নাজাত লাভের উপকরণ হবে না। বরং কেয়ামতের দিন তার হাশর হবে ফেরআউন, কারুন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে। —আহমদ, দারেমী।

হত্যাকারী ও নিহতের পরিণতি ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে এমনভাবে পাকড়াও করবে যে, হত্যাকারীর মাথার চুল ও ললাট তার হাতে ধরা থাকবে। তখন নিহত ব্যক্তির গর্দানের শিরা থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। আর নিহত ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার দরবারে এই বলে অভিযোগ জানাবে যে, হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা করেছিল। এভাবে সে হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের কাছে পৌছবে। —তিরমিযী, নাসাঈ।

হত্যাকাণ্ডে সাহায্যকারীর পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন মুমিন ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডে সাধারণ একটা শব্দ উচ্চারণ করেও যদি সাহায্য করে

থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্ তাআ'লার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার নয়ন যুগলের মাঝখানে লেখা থাকবে ঃ

آئِسٌ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ *

অর্থাৎ এলোক আল্লাহ্ তাআ'লার রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে।

—ইবনে মাজা, মেশকাত।

ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গকারীর পরিণতি ঃ

হযরত সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য এক একটি নিশানা থাকবে। আর সে নিশানা তার গুজ্যদ্বারে লাগান থাকবে। —মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার প্রতারণা যত বড় হবে, তার নিশানও হবে সে পরিমাণে উন্নত। সাবধান! যে ব্যক্তি মানুষের সেবক পদে অধিষ্ঠিত হয়, তার প্রতারণা ও হটকারিতা থেকে বড় প্রতারণা আর কিছু নেই। কেননা সে প্রতারণা করলে সমস্ত জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে তার প্রতারণাই সর্বাপেক্ষা বড়।

শাসক ও রাজা-বাদশার পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি দশজন লোকের আমীর বা শাসক কিংবা পদস্থ অফিসার হলে, কেয়ামতের দিন হাত গর্দানের সাথে বাঁধা অবস্থায় সে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। যদি সে অধীনস্তদের সাথে সুবিচার করে থাকে, তাহলে সুবিচার এসে তার বাঁধা হাত বন্ধনমুক্ত করবে। আর যদি সে তাদের প্রতি জুলুম করে থাকে, তাহলে জুলুম এসে তাকে ধ্বংস করবে। —মেশকাত, দারেমী।

আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে শাসক মানুষের মধ্যে হুকুম করে বা শাসন করে, সে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, একজন ফেরেশতা তার গর্দান ধরে (টেনে-হেঁচড়ে) তাকে হাশর ময়দানে দাঁড় করাবে। অতঃপর সে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে আল্লাহ্ তাআ'লার হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে। আল্লাহ্ তাআ'লা যদি তাকে নীচে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন, তাহলে তাকে দোযখের এমন গহবরে ফেলা হবে, যার তলদেশে পৌছতে গড়াতে গড়াতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে। জালেম শাসকগণেরই এ দুরাবস্থা হবে। অতএব তাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।

—আহমদ, ইবনে মাজা।

যাকাত না দেয়ার পরিণতি ঃ

হযরত আবু হোরায়ারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ তাআ'লা ধন-সম্পদ দান করেন, কিন্তু সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করে না,

কেয়ামতের দিন তার ধন সম্পদকে মাথায় ঝুটি বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে। যার চোখের উপর দু'টি তিলক থাকবে। সে সাপকে কণ্ঠহার রূপে তার গলায় পরিধান করান হবে। অতঃপর সে সাপ তার উভয় গণ্ডে কামড় দিয়ে বলবে, আমিই তোমার ধন ভাণ্ডার, অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

যার অর্থ– "যারা আল্লাহ তাআ'লা প্রদত্ত ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এ (কৃপণতা) তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য খুবই অমঙ্গজনক। অতিসত্বর কেয়ামতের দিন একে কণ্ঠহার বানান হবে যাতে তারা কৃপণতা করছে।" —বোখারী, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেসব মালিক হক (যাকাত) আদায় করে না, তাদের সে স্বর্ণ ও রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে তখতী (পাত) বানান হবে। আর ঐ তখতী (পাত) জাহান্নামের আগুনে গরম করে তা দ্বারা তার পাঁজরে, ললাটে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। ঐ তখতী ঠাণ্ডা হলে পুনরায় তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে দাগ দেয়া হবে। এভাবে বারবার তাকে উক্ত তখতী দ্বারা দাগ দেয়া হবে। এ শাস্তি হবে সে দিনভর যেদিনটি হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অর্থাৎ হাশর ময়দানে ঐ দিনে সমস্ত মানুষের পরিণতির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার এ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর পরিশেষে এ বিপদ হতে মুক্তি পেয়ে সে হয় জান্নাত, অথবা জাহান্নামের আপন গন্তব্য পথে চলা শুরু করবে।

উপস্থিত সাহাবী (রা)দের মধ্য জনৈক সাহাবী (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উটের যাকাত না দিলে তার বিধান কি হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, উটের মালিক যদি তার উটের হক (যাকাত) আদায় না করে, তাহলে তারও কঠিন শাস্তি হবে। উটের হকসমূহের মধ্যে একটি হক হচ্ছে, যে দিন উটকে পানি পান করান হয়, সেদিন তার দুগ্ধও দোহন করতে হবে, তা হলে তাকে উন্মুক্ত হাশর ময়দানে ঐ উটের নীচে শোয়ান হবে। আর তার মোটা তাজা সমস্ত উটগুলো সেখানে উপস্থিত করা হবে, একটি বাচ্চা উটও সেখানে অনুপস্থিত থাকবে না। সেগুলো তাকে খুড় দ্বারা পাঁ দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এক পাল দলিত মথিত করে যাবার পর আর এক পাল এসে তাকে অনুরূপভাবে দলিত মথিত করতে থাকবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটিতে মানুষের মধ্যে চুড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেয়া হবে। অবশেষে হয় সে জাহান্নামে, অথবা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবার জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! গরু-ছাগলের যাকাত না দেয়া হলে তার শাস্তি কি হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, গরু-ছাগলের যে মালিক তার হক (যাকাত) আদায় করবে না; তাকে কেয়ামতের দিন উন্মুক্ত ময়দানে শোয়ান হবে। সেখানে তার গরু-ছাগলগুলো সব উপস্থিত হবে, কোন

একটিও অনুপস্থিত থাকবে না। আর সেগুলো শিংবিহীন এবং ভাঙ্গা শিংবিশিষ্টও হবে না। অতঃপর এ গরু-ছাগলগুলো তাকে পা দ্বারা দলিত এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে, আর পদযুগলের খুড় দ্বারা করবে দলিত মথিত। এক পাল এভাবে করে চলে যাবে, তারপর আর এক পাল এসে আবার তাকে দলিত মথিত এবং শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটিতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি এভাবে শাস্তি পেতে থাকবে। অবশেষে হয় সে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে —মেশকাত।

কেয়ামতের দিন সর্বাধিক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ঃ

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি ঢেকুর দিলে তিনি বললেন, তুমি কম কম– ঢেকুর দাও। কেননা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী সময় সে ব্যক্তিই ক্ষুধার্ত থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী সময় পেট ভরে রাখে। —শরহে সুন্নাহ, মেশকাত।

দু'মুখা ব্যক্তির শাস্তি ঃ

হযরত আম্মার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দু'চেহারা বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যে এক দলের কাছে যেয়ে তাদের প্রশংসা করে এবং অন্য দলের কুৎসা গায়। আবার অন্য দলের কাছে গিয়ে তাদের প্রশংসা করে এবং প্রথম দলের কুৎসা গায়। কেয়ামতের দিন তাকে দু'টি আগুনের জিহ্বা দেয়া হবে। —দারেমী, মেশকাত।

মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা এবং আড়ি পেতে গোপন কথা শোনার শাস্তি ঃ

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যে নিজের পক্ষ হতে রচনা করে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, তাকে কেয়ামতের দিন দু'টি চুলের মধ্যে গিরা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে কক্ষনোই গিরা দিতে সক্ষম হবে না। অতএব তাকে শাস্তির মধ্যে রাখা হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি কোন দলের এমন কোন কথা শোনার জন্য আড়ি পাতে যা তারা তাকে শোনাতে চায় না, তাহলে কেয়ামতের দিন তার কানে সিসা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হবে। আর কেউ কোন প্রাণীর ছবি অংকন বা বানালে কেয়ামতের দিন তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, আর তাকে ঐ প্রাণীর আত্মা দান করে জীবিত করার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে কক্ষণোই সে প্রাণীর আত্মা প্রদানে সক্ষম হবে না।" —বোখারী; মেশকাত।

জিল্লতি বা লাঞ্ছনার পোশাক ঃ

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় গর্ব-অহংকার করা ও খ্যাতিলাভের জন্য পোষাক পরিধান করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে লাঞ্ছনা ও জিল্লতির পোশাক পরিধান করাবেন।" —আহমদ, আবু দাউদ।

অন্যের ভূমি হরণকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুললাহ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ ভূমিও বিনা অধিকারে হরণ বা ভোগ দখল করে, কেয়ামতের দিন তাকে ভূমির সপ্ত স্তরের সর্বনিম্ন স্তরে ধসিয়ে দেয়া হবে। —বুখার-মেশকাত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে আধহাত পরিমাণ জমিও জবর দখল করে নিলে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে ভূতলের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের বিচার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার গলায় সপ্ত স্তরের ভুমি কণ্ঠহাররূপে ঝুলিয়ে দেয়া হবে।" —আহমদ, মেশকাত।

ইলমেদ্বীন গোপন করার শাস্তি ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো কাছে যদি কোন দ্বীনী এলমের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, আর তা জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন রাখে, তাহলে কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিধান করান হবে। —তিরমিযী, আবু দাউদ, আহমদ।

যেহেতু সে এলমের বিষয়ে না বলে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল, এ কারণে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি চয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ মুখে আগুনের লাগাম পরান হবে।

গোস্সা হজমকারীর পুরস্কার

হযরত সাহল (রা) স্বীয় পিতা মুয়াজ (রা) থেকে শুনে বলেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গোস্বাকে হজম করে, অথচ কারণ অনুযায়ী তা করার ক্ষমতা তার রয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মানুষের সামনে তাকে ডেকে বলবেন, তোমার মনে যে হুরকে পেতে চায়, তুমি তাকে গ্রহণ কর। —তিরমিযী, আবূ দাউদ।

মক্কা মদীনায় মৃত্যুবরণকারীর পুরস্কার ঃ

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় বসতি স্থাপন করে সেখানকার দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্যের সাথে বরণ করে নেয়; কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব এবং সুপারিশ করব। আর যে ব্যক্তি মক্কা বা মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিরাপদ ব্যক্তিদের মধ্যে সামিল করে উঠাবেন। —বায়হাকী –শোয়াবুল ঈমান।

হজ্জের সফরের সময় মৃত্যুবরণকারীর পুরস্কার ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক সাহাবী (রা) নবী করীম (সঃ)-এর সাথে হজ্জে গমন করে আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ বাহন থেকে পড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে মৃত্যু ঘটে। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা একে বড়ই পাতার পানি দ্বারা গোসল করাও। আর তার

এহরামের দু'খানা কাপড় দ্বারাই তাঁকে কাফন পরাও। কিন্তু তার দেহে সুগন্ধ লাগাবে না এবং তার মাথাও ঢাকবে না। কেননা কেয়ামতের দিন সে হজ্জের তালবিয়া (১) পাঠ করতে করতে কবর থেকে উঠে হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে। —বোখারী।

শহীদগণের মর্যাদা ও পুরস্কার ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর পথে (জিহাদে) কেউ আহত হলে, আর আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, কে তার পথে জখম হয়েছে। অর্থাৎ মনের নিয়তের অবস্থাটি আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। সে কেয়ামতের দিন ঐ কাঁচা জখমসহ এমনভাবে উত্থিত হবে যে, তার জখম হতে তখনো রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। আর সে রক্তের রং লাল বর্ণই হবে এবং তা থেকে মেশকের সুগন্ধ পাওয়া যাবে। —বোখারী, মুসলিম।

অন্ধকারে মসজিদে গমনকারীদের পুরুস্কার ঃ

হযরত বুরায়দাহ্ (রা) বলেন, রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "রাতের অন্ধকারে যারা মাসজিদে গমন করে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দাও যে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে পুরাপরিভাবে নূর দান করা হবে।"—তিরমিযী, আবু দাউদ।

মুয়াজ্জিনের পুরস্কার

হযরত মুয়াবীয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "নামাযের জন্য যারা আযান দেয়, কেয়ামতের দিন তাদের গর্দান সবার চেয়ে বেশী লম্বা হবে।"

—মুসলিম।

আল্লাহ প্রেমিকের পুরস্কার ঃ

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, "যারা আমার মহব্বতের কারণে একে অপরকে ভালবাসে, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য নূরের মিম্বর (আসন) হবে। তাদের এমন সম্মান ও মর্যাদা দর্শনে নবী এবং শহীদগণও লোভাতুর হবেন (কেননা তারা তো নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে নূরের মিম্বরে বসবেন। আর নবী-রাসূল ও শহীগণ অন্যান্য লোকদের সুপারিশের জন্য ব্যস্ত থাকবেন।")

—তিরমিযী মেশকাত।

আরশের ছায়ায় যারা থাকবেন ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তাআ'লা হাশর ময়দানে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যখন সে ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তারা হলেন ঃ

(১) মুসলমানদের সুবিচারক ও ইনসাফগার শাসক ও বাদশা।

(২) সেই যুবক যে আল্লাহ তাআ'লার বন্দেগীতে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

(৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মসজিদের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে। অর্থাৎ তার অন্তর থাকে মসজিদে, দেহ থাকে বাইরে।

(৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসেন এবং সেই মহব্বতের জন্যই তারা একত্রিত হন। এবং সেই মহব্বতের কথা স্মরণ রেখেই পরস্পর থেকে পৃথক হন।

(৫) যে ব্যক্তি নিভৃতে একাকী অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে এবং তার ভয়ে নয়ন যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

(৬) যে ব্যক্তিকে কোন পরমা সুন্দরী ও অভিজাত শ্রেণীর মহিলা ব্যভিচারের জন্য আহ্বান জানালে সে সুস্পষ্টভাষায় এ জওয়াব দেয় যে, আমি আল্লাহ তাআ'লা কে ভয় করি।

(৭) যে ব্যক্তি এমন সংগোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না তার ডান হাত কি দান করেছে। —বোখারী, মুসলিম।

নূরের টুপি যিনি পাবেন ঃ

হযরত মুয়াজ জুহায়নী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, কেয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন এক নূরের টুপি পরান হবে, যার জ্যোতি সূর্যের সেই কিরণের চেয়েও উত্তম হবে, যে কিরণ দুনিয়ার তোমাদের ঘরে প্রবেশ করে। এখন তোমরাই বল যে, তাদের পিতা-মাতার অবস্থাই যখন এমন হবে, তখন কোরআন মজীদ অধ্যয়ন করে তদানুযায়ী যে আমল করে, তার সম্মান ও মর্যাদা কত উন্নত হতে পারে? —আহমদ আবু দাউদ।

হালাল উপার্জকের পুরস্কার ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় এজন্য দুনিয়ার সহায়-সম্পদ রোযগার করে যে, সে নিজে ভিক্ষা করা থেকে বেঁচে থাকবে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করবে এবং নিজের পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করবে। সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে যে, তার চেহারা হবে চতুর্দশী পুর্ণিমার শশির ন্যায় আলোকউজ্জ্বল। আর কোন ব্যক্তি যদি বৈধ পন্থায় এ জন্য দুনিয়ার সহায় সম্পদ রোযগার করে যে, সে অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশি সম্পদ সঞ্চয় করবে এবং অন্যান্য লোকদের উপর গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করবে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লার সাথে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ হবে যে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত থাকবেন।

—বায়হাকী– শোয়াবুল ঈমান।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কোন উপকারে আসবেনা

হাশর ময়দানে প্রত্যেক লোকই থাকবে আত্মরক্ষার চিন্তায় বিভোর, কেউ কারো উপকারে আসবে না। একে অপর থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা দেবেন না পুত্রের কোন প্রতিদান।.আর পুত্রও পিতার কোন দাবী পূরণ করতে পারবে না।' সূরা লুকমান।

কেয়ামতের দিনটি হবে খুবই বিপদ সংকুল ও নিঃসঙ্গ দিন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে উপকারে আসে। কিন্তু কেউ যেন নির্বোধের ন্যায় মনে না করে যে, কেয়ামতের দি;নও এরা উপকারে আসবে। এ ধারণা নিতান্ত ভুল। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ *

"যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেনা।" —সূরা মুমিনুন।

সূরা আবাসায় আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ *

"সেদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মানুষ স্বীয় ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি থেকে পালিয়ে যাবে।' —সূরা আবাসা।

অর্থাৎ কারো প্রতি সহমর্মিতা-সমবেদনা প্রকাশ করা তো দূরের কথা আপন আপন নিকটাত্মীয় থেকেও তারা দূরে পালিয়ে যাবে।

বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হবে ঃ

মহা বিচারের দিন একমাত্র সৎকর্মই মানুষের উপকারে আসবে। মানুষ সব চেয়ে বেশি ভরসা করে নিজ আত্মীয়-স্বজনের উপর। উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষ মহাবিচারের দিন তার নিকটাত্মীয়দের থেকেও দূরে পালিয়ে যাবে। এরপর আসে বন্ধু-বান্ধবদের কথা। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ *

"এক বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করবে না, অথচ একজন অপর জনকে দেখবে।" —সূরা মায়ারিজ, ১ম রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ *

"আল্লাহভীরু লোক ব্যতীত বন্ধুরা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে।"
—সূরা যুখরফ- ষষ্ঠ রুকু।

মানুষ আত্মীয়-স্বজনসহ সবকিছু দিয়েও নাজাত পেতে চাবে ঃ

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিন অপরাধীরা নিজেদের শাস্তির পরিবর্তে নাজাতের জন্য নিজেদের সম্প্রদায়দেরকে, স্ত্রী, ভাই, এমনকি গোত্রীয় লোকজনকে যাদের সাথে সে বসবাস করত এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই মুক্তিপণরূপে দিতে চাইবে। কিন্তু তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।
—সূরা মায়ারিজ, ১ম রুকু।

অর্থাৎ মহা বিচারের দিন মানুষ নিজে বাঁচার জন্য আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ জাতি-গোষ্ঠী, এমনকি সমস্ত পৃথিবীটাকে মুক্তিপণরূপে দিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর তা দিতে সন্তুষ্ট চিত্তেই সম্মত থাকবে। কিন্তু তা কখনও করতে পারবে না। সেখানে আমল ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। সেদিন আত্মীয়-স্বজনরা কেন অপরের মুক্তির জন্য নিজেকে বিপদে ফেলতে চাইবে। মনে করুন কারো কাছে যদি কিছু থেকেও থাকে এবং অন্যকে বাঁচাবার জন্য কেউ যদি নিজকে উৎর্সগ করার জন্য প্রস্তুতও থাকে, তবু তা গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা কুফরী ধর্ম ও মতবাদ গ্রহণ করে কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের কেউ যদি মুক্তিপণ স্বরূপ পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দিয়েও নিজে রেহাই পেতে চায়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না। —সূরা আলে ইমরান।

পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসার আবেদন

আল্লাহ্ তাআ'লা মহাবিচার দিনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ "আপনি যদি সে সময় দেখতে পেতেন, যখন অপরাধীগণ নিজেদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা অবনত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সবকিছু দেখলাম এবং শুনলাম, আপনি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠান। আমরা সেখানে সৎকর্ম করব। আমাদের মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। (তখন আপনি এক মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করবেন।)

তাদেরকে কখনই দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হবে না। যদি পাঠানও হয় তাহলেও তারা পুনরায় দুনিয়ায় বসবাসকালে আল্লাহদ্রোহী আচরণ করবে। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ *

"যদি তাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হয়, তাহলে পুনরায় তারা গুনাহের কাজই করবে, যা নিষেধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা বড়ই মিথ্যাবাদী।"

নেতাদের প্রতি দোষারোপ ঃ

অবশেষে কাফেরগণ সবদিক বন্ধ দেখে তাদেরকে যেমন নেতা ও দলপতিগণ বিভ্রান্ত করেছে, তেমন তারাও তাদের প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে নবী! আপনি যদি সে সময়ের অবস্থাটি দেখতেন, যখন কাফের জালেমগণ নিজেদের প্রতিপালকের কাছে দাঁড়িয়ে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে। এদের মধ্যে যারা দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোক, তারা উচুশ্রেণী ও নেতৃস্থানীয়দেরকে বলবে, তোমরা যদি না থাকতে তবে দুনিয়ায় থাকাকালে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম। একথা শুনে নেতৃস্থানীয়রা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে যখন হেদায়েত ও দ্বীনের কথা এসেছে, তখন কি আমরা তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রেখেছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী হয়েছিলে। অতঃপর দুর্বল লোকেরা নেতৃস্থানীয়দেরকে বলবে- না, আমরা স্বেচ্ছায় অপরাধ করিনি বরং দিবা-রাতে তোমাদের প্রতারণা ও চালবাজিই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কুফরী করতে এবং তার সাথে শরীক করতে নির্দেশ দিতে। —সূরা সাবা, ৪র্থ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বাতিলের অনুসারী এবং কুফর ও শিরকী আদর্শের নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে পরকালে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে যে বিতর্ক হবে তা-ই আগাম তুলে ধরেছেন। অনুসারীরা নেতাদেরকে বলবে তোমরাই আমাদের সর্বনাশ করেছ। আমাদেরকে তোমরাই আল্লাহদ্রোহী বানিয়েছ। নেতারা বলবে, আমরা কখন তোমাদেরকে কুফরী ও শিরকী করার জন্য বাধ্য করেছি? তোমরা নিজেরাই তো কুফরী করেছ এবং নিজেরাই তো অপরাধী হয়েছ। একথা শুনে অনুসারীরা বলবে, তোমরা আমাদের বাধ্য করনি বা হাত ধরে বিরত রাখনি বটে। কিন্তু তোমাদের কারসাজি, প্রতারণা ও প্রচারণার কারণে আমরা সত্য গ্রহণ করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী হতে বিরত রয়েছি। আল্লাহ অন্যত্র বলেন-

"তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অনুসারীগণ তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের কাছে খুব ঘনঘন যাতায়াত করতে। (যার কারণে আমরা তোমাদের কথা মেনে চলেছি)। তখন নেতাগণ বলবে, (আমাদের দোষ কি) তোমরা বরং নিজেরাই ঈমান আননি। আমরা তো তোমাদের প্রতি কোন জোর জবরদস্তী করিনি, বরং তোমরা ছিলে একটি বিদ্রোহী সম্প্রদায়। সুতরাং আমাদের সকলের উপরই প্রতিপালকের বিধান প্রযোজ্য হয়েছে। আমাদের সবাকেই কর্মফলের স্বাদ নিতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি এবং আমরাও বিভ্রান্ত ছিলাম। —সূরা সাফফাত- ২য় রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে বির্তক ও অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও অনুসারীরা নেতাগণকে এ বলে

দোষারোপ করবে যে, তোমরা আমাদের কাছে খুব ঘন-ঘন্ যাতায়াত করতে এবং বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখা দ্বারা আমাদেরকে অসত্য গ্রহণ করতে প্ররোচিত করতে। বাতিলের দলে যোগদান করতে আহ্বান জানাতে এবং ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত রাখতে। প্রত্যুত্তরে নেতারা বলবে, আমরা তোমাদেরকে কিভাবে প্ররোচিত করলাম এবং কিভাবে ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত রাখলাম? আমরা তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশের পথে কোন বাধা দেইনি, বরং তোমরা নিজেরই জ্ঞান বুদ্ধি ও সুবিচারের সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা নসীহতকারীদের কথা মাননী। ফলে আমাদের বিভ্রান্তি ও ধূম্রজালে আবদ্ধ হয়েছ। পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে জ্ঞান খাটিয়ে কাজ করলে আমাদের কথায় কান দিতে না এবং আল্লাহ্ তাআ'লার নবী রাসূলদের কথা হতেও মুখ ফিরিয়ে থাকতে না। আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম। সুতরাং পথভ্রষ্টদের থেকে কি আশা করা যায়। তারা তো অন্যকে পথভ্রষ্ট করবে। এখন তোমরা আমরা উভয়ই শাস্তি ভোগ করব।

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের আর এক স্থানে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "সুতরাং তারা সকলেই সে দিন শাস্তিতে অংশ গ্রহণ করবে। আমি অপরাধীদের সাথে এমনই ব্যবহার করি। যখনই তাদের কাছে বলা হত যে, আল্লাহ্ তাআ'লা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তখনই তারা গৌরব-অহংকার করে (তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকত)। আর তারা বলতো, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মাবুদগণকে পরিত্যাগ করব?" —সূরা সাফফাত– ২য় রুকু।

নেতা হোক বা সাধারণ অনুসারী হোক যারাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' -এর মতবাদকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তাআ'লাকে মাবুদরূপে স্বীকার করাকে নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে। আর আল্লাহ তাআ'লার রাসূলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, কিংবা তাঁকে পাগল কবি বলেআখ্যায়িত করে, তাদের সকলকেই সেদিন চিরস্থায়ী কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করা হবে। এটা কখনো হবে না যে, পথভ্রষ্টকারী বেঈমান নেতাদেরকে শুধু শাস্তি দেয়া হবে, আর তাদের অনুসারী ও সাধারণ লোকদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। বরং নেতা; অনুসারী ও সাধারণ বেঈমান-কাফের সকলকেই জাহান্নামের অনলকুণ্ডলে চিরস্থায়ীভাবে নিক্ষেপ করা হবে।

নেতাদের দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ঃ

হাশর ময়দানে কাফেরদের নেতা তাদের অনুসারীদের দায়-দায়িত্ব বহন করতে অস্বীকার করবে। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ *

"যাদের কথা অনুযায়ী অন্যরা চলত অর্থাৎ নেতাগণ তাদের অনুসারীদের দায়-দায়িত্ব বহন করতে তখন অস্বীকার করবে, যখন তারা অশান্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর সেদিনই তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হবে।"—সূরা বাকারা– ১৬৬।

মহাবিচারের দিন নেতারা তাদের অনুসারীদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করবে। তারা তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না এবং তা করতে সক্ষমও হবে না। সেদিন নেতাদের কথায় যারা চলত এবং তাদের প্রস্তাবমালাকে যারা হাত নেড়ে সমর্থন জানাত, তারা নেতাদের প্রতি যারপর নেই গোস্সা হবে। যেমন কোরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুগামীদের ক্রুদ্ধ ও গোস্সার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

"সাধারণ অনুসারীরা বলবে, আমাদের যদি একবার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন হয়, তাহলে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব; যেমন আজ তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআ'লা তাদের কার্যাবলীকে পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন। তারা কখনো অনলকুণ্ড হতে বের হতে পারবে না।" —সূরা বাকারা – ১৬৭।

কোরআনে করীম হাশর ময়দানের বিভিন্ন অবস্থা ও সর্বনাশা অবস্থা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। সেখানে সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ তো দূরের কথা, একজন অপরজনকে দেখে দূরে পালাবে। তারাই হবে হতভাগা যারা কুরআনের দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি, মন দিয়ে তা শোনেনি এবং তার উপদেশাবলীকে জীবনে বাস্তবায়িত করেনি।

হাশর ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সর্বোচ্চ সম্মান লাভ

শাফাআ'ত, মাকামে মাহমুদ, উম্মতে মোহাম্মাদীর উচ্চাসন

হাশর ময়দানে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) শাফাআ'তের মর্যাদা ও মাকামে মাহমুদ লাভ করবেন এবং তৎসঙ্গে উম্মতে মুহাম্মদীও উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে।

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে আমিই হব সমস্ত আদম সন্তানের নেতা, কিন্তু এজন্য আমি কোন গৌরব ও অহংকারবোধ করছিনা। (বরং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তা বলা হল।) আমার হাতে থাকবে আল্লাহ তাআ'লার হামদের (প্রশংসার) ঝাণ্ডা। এজন্যও আমি গৌরব করছি না। সেদিন প্রত্যেক আদম সন্তান এবং অন্যান্য সবাই আমার ঝাণ্ডাতলে থাকবে। আর কেয়ামতের দিন কবর হতে সর্বাগ্রে আমিই উত্থিত হব। এটা আমি গৌরব অহংকার করার জন্য বলছি না (বরং সত্য প্রকাশ ও নেয়ামতের শুকরিয়ার জন্য বলছি)। —তিরমিযী, মেশকাত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন হাশর ময়দানে আমি হব নবীদের অগ্রগামী নেতা এবং তাদের মুখপাত্র ও শাফাআ'তের অধিকারী। এটা গৌরব অহংকার ছাড়াই বর্ণনা করছি। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কোন এক দাওয়াতের মজলিসে ছিলাম। নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে একখানা বকরীর রান পেশ করা হল। তিনি রানের গোশত পছন্দ করতেন। তা হতে তিনি কামড়িয়ে কিছু গ্রহণ করলেন আর বললেন, কেয়ামতের দিন আমি সমস্ত মানুষের নেতা হব। তা প্রকাশ হওয়ার পদ্ধতি তোমাদের জানা আছে কি? অতঃপর তিনি নিজেই প্রত্যুত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে একটি উন্মুক্ত ময়দানে জমায়েত করবেন। তখন একজন দর্শক সবাইকে দেখতে পাবেন এবং একজন ঘোষক তার আহবান সবাইকে শোনাতে পারবেন। তখন আকাশের সূর্য হবে তাদের নিকটবর্তী। এ সময় মানুষ এত কঠিন বিপদ ও অস্থিরতার মধ্যে থাকবে যা ধৈর্য-সহিষ্ণুতার অতীত।

এহেন ব্যাকুলতা ও অস্থির অবস্থায় মানুষ পরস্পর বলাবলি করবে, তোমরা কিরূপ বিপদগ্রস্ত তা সুস্পষ্ট, অতএব তোমাদের কেউ কি এমন কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সন্ধান করে আনতে পারে না, যে প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর একজন অপরজনকে বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে আবেদন কর। অতএব তাঁর কাছে এসে লোকেরা বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানুষের আদি পিতা। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তাঁর আত্মাকে ফুঁকিয়ে দিয়েছেন। আর ফেরেশতাগণকে আপনার প্রতি সম্মান প্রর্দশনের নির্দেশ দিলে তারা আপনাকে সেজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেন। সুতরাং, আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি নিজেই তো দেখছেন যে, আমরা কত মর্মান্তিক বিপদে রয়েছি। তখন আদম (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্সা অবস্থায় আছেন যে, এর পূর্বে বা পরে কখনো তিনি এত গোস্সা হননি। আমার প্রতিপালক আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমার দ্বারা তার আদেশ লংঘন হয়েছে। (তাই আজ আমি নিজের চিন্তায় অস্থির।) আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে গেলে তিনি হয়তো তোমাদের উপকার করতে পারেন।

অতঃপর লোকেরা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে গিয়ে আবেদন করবে, আপনি হচ্ছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার প্রথম রাসূল। আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে শোকর গুজার বান্দা বানিয়েছেন। আপনি নিজেই

দেখছেন যে, আমরা কত মর্মান্তিক বিপদে আছি এবং আমাদের অবস্থা কত শোচনীয়। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন ?

হযরত নূহ (আঃ) প্রত্যুত্তরে বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্সা হয়েছেন যে পূর্বে তিনি কখনো এত গোস্সা হননি। আর আজকের পরও তিনি কখনো এতটা গোস্বা হবেন না। আর এটাও বাস্তব কথা যে, আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদ্দোয়া করেছিলাম, এজন্য আমার জবাবদিহির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। হযরত ইবরাহীমের (আ) কাছে গেলে হয়ত তিনি তোমাদের উপকার করতে পারেন। এরপর লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে এবং তাঁকে বলবে, আপনি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর নির্বাচিত বন্ধু। আমাদের জন্য আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি নিজেই আমাদের দুরাবস্থা অবলোকন করছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজ এতটা গোস্সা হয়েছেন যা এর পূর্বে কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। আমি দ্বীনি প্রয়োজনে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আমি ভয় করছি যে, এজন্য কখন আমাকে ধরা হয়। একথা বলে তিনি তার মিথ্যা বলার বিষয়গুলো উল্লেখ করবেন। অবশেষে তিনি বলবেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে যাও। হয়ত তার দ্বারা তোমরা উপকৃত হতে পারবে। তখন লোকেরা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, হে মূসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনাকে আল্লাহ তাআ'লা রিসালত দান করে এবং আপনার সাথে বাক্যালাপ করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি নিজেই তো আমাদের দুরাবস্থা দেখছেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমার প্রতিপালক আজকের ন্যায় এতটা গোস্সা আর কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও এমন গোস্সা কখনো হবেন না। বাস্তব কথা হল আমি এক লোককে হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দেননি। সুতরাং আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আল্লাহ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। হয়ত তিনি তোমাদেরকে উপকার করতে পারেন। অতঃপর লোকেরা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে এবং তাকে বলবে, হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি আপনার মাতা মরিমের কাছে পৌঁছায়েছেন। আপনি দোলনায় থাকতেই মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এটা আপনার শ্রেষ্ঠত্ব। আপনি আমাদের দুরাবস্থা নিজ চোখেই দেখছেন। আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি

বলবেন, তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহ তাআ'লা আজ এতটা গোস্সা হয়েছেন, যা ইতিপূর্বে কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। একথা বলার পর নবী করীম (সঃ) হযরত ঈসা (আ)-এর কোন পদস্খলনের কথা উল্লেখ করেননি; যা স্মরণ করে তিনি সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন। বরং হযরত ঈসা (আ) বলবেন, হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে যাও (তিনি তোমাদের উপকার অবশ্যই করবেন)। নবী করীম করীম (সঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা আমার কাছে আসবে এবং বলবে হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীকুলের শেষ নবী (সঃ), আল্লাহ তাআ'লা আপনার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেছেন। আমরা দুরাবস্থায় আছি তাতো আপনি নিজেই দেখছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। একথা শুনে আমি রওয়ানা হব এবং আরশের নিম্নদেশে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় রত হব। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমার কাছে তাঁর উত্তম প্রশংসা ও নীতিবাক্য তুলে ধরবেন, যা আমার পূর্বে কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর এবং তোমার যা ইচ্ছে প্রার্থনা কর, তোমার দাবী পূরণ করা হবে। আর তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশও গ্রহণ করা হবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করে, আবেদন করব; হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের যেসব লোকের কোন হিসাব নিকাশ নেই তাদেরকে নিয়ে জান্নাতের ডান দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও। এ দরজা ছাড়া অন্য দরজা পথেও প্রবেশ করা তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ! জান্নাতের দরজা এতটা প্রশস্ত হবে যে, মক্কা-মদীনার মধ্যে যতটা ব্যবধান। অর্থাৎ মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব সমান হবে জান্নাতের প্রশস্ততা। অথবা তিনি বলেছেন, মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানের সমান জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা। —বোখারী, মুসলিম, আত্তারগীব আত্তারহীব।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) শাফায়াতের বিবরণ দান করার পর কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ করেনঃ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا* (অতিসত্বর আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমুদের দণ্ডায়মান করাবেন।) অতঃপর বললেন, এটাই হচ্ছে সে মাকামে মাহমুদা যা তোমাদের নবীর সাথে তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। —বোখারী, মুসলিম।

উম্মতের মুহাম্মদীর পরিচিতি ঃ

হযরত আবুদ্‌দারদা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল হযরত নূহ (আ)-এর উম্মত হতে শুরু করে আপনার উম্মত পর্যন্ত দুনিয়ায় বিপুল মানুষের আগমন হয়েছে। এত মানুষের মধ্যে কেয়ামতের ময়দানে আপনার উম্মতকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন? জবাবে হযরত করীম (সঃ) বললেন, অযুর প্রভাবে তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং হস্ত ও পদযুগল হবে শুভ্র। উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া এমন নির্দশন অন্য কোন উম্মতের হবে না। আমি তাদেরকে এ কারণে চিনতে পারব যে, তাদের আমলনামা সর্বাগ্রে তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। আরও চিনবার নির্দশন হল, তাদের মৃত নাবালক সন্তানেরা তাদের সম্মুখে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকবে।

—আহমদ, মেশকাত।

হাউজে কাওছার

হাশর ময়দানে বিপুল সংখ্যক বড় বড় হাউজ থাকবে। নবী করীম (সঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই এক একটি হাউজ থাকবে। আর প্রত্যেক নবীই যার পানকারীদের সংখ্যা বেশি হবে সেজন্য গৌরব বোধ করবেন। প্রত্যেক নবীর হাউজ থেকে তার নিজ নিজ উম্মতগণ পানি পান করবে। আমি আশা করি সর্বাধিক সংখ্যক লোক আমার কাছে পানি পান করার জন্য আসবে (কারণ অন্যান্য নবীর উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক)।

—তিরমিযী।

হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কেয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, হাঁ; আমি তোমার জন্য সপারিশ করব। আমি আরয করলাম- হাশর ময়দানে আমি আপনাকে কোথায় ন্ধান করব? তিনি বললেন, প্রথমত আমাকে পুলসেরাতের কাছে সন্ধান করবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেখানে আপনাকে না পেলে কোথায় সাক্ষাত করব? তিনি বললেন আমলনামা পরিমাপের জন্য দাঁড়িপাল্লার স্থানে সন্ধান করবে। আমি বললাম, সেখানেও না পেলে আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য কোথায় যাব? তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, হাউজে কাওছারের কাছে আমাকে সন্ধান করবে। এ তিনটি স্থানের কোন একটি স্থানে অবশ্যই আমাকে পাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাউজে কাওছারের বৈশিষ্ট্য ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজে কাওছারটি এত লম্বা ও প্রশস্ত হবে, যার এক দিক হতে অন্য দিকে যাওয়ার জন্য এক মাসের সময়ের প্রয়োজন হবে। হাউজটি সমান চৌকোণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ত সমান। তার পানি দুধের চেয়েও শুভ্র এবং তার

সুঘ্রাণ মেশকের চেয়েও উত্তম হবে। আর তার লোটা বা পান পাত্রগুলো আকাশের তারকার সংখ্যার সম পরিমান হবে। কেউ আমার হাউজে কাওছারের পানি একবার পান করলে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজে কাউছার দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে এত বিরাট হবে যে, তার একদিক হতে অপর দিকের ও দূরত্ব হচ্ছে ওমান হতে এডেনের দূরত্ব ও ব্যবধানের চেয়েও বেশি। তোমরা বিশ্বাস কর, তার পানি বরফের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অতিশয় মিষ্টি। আর তার বরতনগুলো আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়েও অধিক। অন্যান্য নবীর উম্মতগণ আমার হাউজে কাউছারের কাছে আসলে আমি তাদেরকে বিতাড়িত করব। যেমন দুনিয়ায় অন্য লোকের উটকে নিজের হাউজে পানি পান করা হতে বিতাড়িত করা হয়। সাহাবী (রাঃ)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ দিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন ? নবী করীম (সঃ) বললেন, অবশ্যই চিনতে পারব। কেননা সেদিন তোমাদের একটি বিশেষ নিদর্শন হবে। সে নিদর্শন অন্য কোন উম্মতের হবে না। আর তা হল তোমরা হাউজে কাউছারের নিকট আমার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যে, তখন অযুর প্রভাবে তোমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে এবং পদ ও হস্তযুগল হবে (কনুই পর্যন্ত ও পদযুগল গিরা পর্যন্ত) শুভ্র। —মুসলিম।

অন্য এক বর্ণনা মতে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আকাশের তারকার সংখ্যা পরিমাণ হাউজে কাউছারের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অগণিত পেয়ালা পরিলক্ষিত হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, আমার হাউজে কাউছারের দু'টি প্রবাহমান প্রণালী থাকবে, যার মাধ্যমে জান্নাতের নহর হতে পানি প্রবাহিত হয়ে হাউজে কাউছারের পানি বৃদ্ধি করবে। সে প্রণালী দু'টির একটি হবে স্বর্ণের এবং অপরটি হবে রৌপ্যের প্রণালী। —মুসলিম।

সর্বাগ্রে হাউজে কাউছারে উপনীত ব্যক্তিগণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার হাউজটি এত বিরাট হবে যে, এডেন থেকে ওমান পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান হবে তার দৈর্ঘ্য। আর পানি হবে বরফের চেয়েও অতিশয় ঠাণ্ডা এবং মধুর চেয়ে অতিশয় সুমিষ্ট। আর মেশকের চেয়ে অতিশয় সুগন্ধ বিশিষ্ট। তার পেয়ালা হচ্ছে আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। কেউ এ থেকে একবার পানি পান করলে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আমার এ হাউজের কাছে সর্বাগ্রে যারা উপস্থিত হবে তারা হচ্ছে মুহাজিরদের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তিগণ। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি অবস্থায় উপস্থিত হবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, দুনিয়ায় যাদের মাথার চুল এলোমেলো ছিল, আর পরিশ্রম ও ক্ষুধা ও ক্লান্তির কারণে

যাদের চেহারা পরিবর্তিত হয়েছিল, তাদের জন্য রাজা-বাদশা ও শাসকদের দরজা থাকত রুদ্ধ। উত্তম ও সুন্দরী রমনীদেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া হত না। তাদের জিম্মা ও দায়িত্বে কারো কোন হক থাকলে তা যথাযথভাবে আদায় করা হত। আর তারা কারো কাছে পাওনা থাকলে, তা পুরাপুরি ফিরায়ে দেয়া হত না বরং কিছু হ্রাস করা হত। —আত্তারগীব আত্তারহীব।

অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের অভাব-অনটন এতটা প্রকট ছিল যে, মাথার চুল পারিপাটি করার এবং পরিধানের কাপড় পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখার মত আর্থিক ক্ষমতাও তাদের ছিল না। বাহ্যিকভাবে পারিপাটি ও সুমার্জিত্ব হয়ে চলার দিকে তাদের মনে কোন প্রবণতাও ছিল না। এর প্রতি তারা খেয়ালও করতেন না, এজন্য সময় ব্যয় করাকেও তারা পছন্দ করতেন না। পরকালের চিন্তা ও কাজে ব্যাঘাত হয় এমন কোন কাজ তারা করতেন না। দুনিয়ায় তাদের দুঃখ দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এতটা বিষণ্ন রাখত যে, পরিপাটি করার খেয়ালই তাদের মনে উদয় হত না। তাদের চেহারায় ফুটে থাকত দুঃখ দৈন্যতার ছাপ। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে এতটা তুচ্ছ জ্ঞান করত যে, দুনিয়ার মজলিস ও অনুষ্ঠানে তাদের দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা, সেসব স্থানের দরজা থাকত তাদের জন্য রুদ্ধ। আর ধনাঢ্য ও কুলিন পরিবারের মেয়েদেরকেও আল্লাহর এসব খাস বান্দাদের সাথে বিয়ে দেয়া হত না। কিন্তু পরকালে তাদের সম্মান ও মরতবা হবে সবার চেয়ে উন্নত। তারাই সর্বাগ্রে হাউজে কাউছারের কাছে উপস্থিত হবেন। অন্যান্য লোকেরা তাদের পরে এসে এ পবিত্র হাউজে পানি পান করবে। তবে শর্ত হল ঈমানদার ও পুণ্যবান বান্দা হতে হবে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে যখন এ হাদীস শোনান হল যে, হাউজে কাউছারে সর্বাগ্রে গরীব মুহাজিরগণ উপস্থিত হবেন। যাদের মাথার চুল এলোমেলো থাকত এবং সুন্দরী ও কমনীয় নারীদেরকে তাদের কাছে বিয়ে দেয়া হত না। আর তাদের জন্য ধনীলোকদের দরজা থাকত রুদ্ধ। এ হাদীস শুনে তিনি খুব ভীতবিহ্বল হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, আমি তো এমন নই। আমার বিবাহবন্ধনে রয়েছে আবদুল মালেকের কন্যা ফাতেমা। আমার জন্য তো দুয়ার উম্মুক্ত রাখা হয়। সুতরাং এখন থেকে আমার কাজ হবে আমি কখনো মাথা ধৌত করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ধূলা মলিন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি দেহ ধৌত করব না। —আত্তারগীব আত্তারহীব।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ছিলেন মুসলিম জাহানের একজন ন্যায় পরায়ন আল্লাহভীরু খলীফা। যাকে খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয়। তার পরকালের চিন্তা ও আল্লাহভীরুতার বহু ঘটনা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান।

হাউজে কাউছার হতে যারা বিতাড়িত হবে ঃ

হযরত সাহল ইবনে সাহদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একথা নিশ্চিত মনে করবে যে, কেয়ামতের দিন হাউজে কাউছারের কাছে তোমরা

আমার সম্মুখীন হবে। (পানি পান করার জন্য তোমরা সেখানে উপস্থিত হবে।) যারা আমার নিকট দিয়ে গমন করবে, তারা আমার হাউজের পানি পান করবে। আর যারা পানি পান করবে, তারা কখনও পিপাসাকাতর হবে না। আমার কাছে পানি পান করার জন্য এমন কিছু লোকের আগমন হবে, যাদেরকে আমি চিনব এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু তারপর আমার ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। তারা তখন পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে। আমি তখন বলব এরা আমার লোক, এদেরকে বাধা দেয়া হচ্ছে কেন? তাদেরকে আসতে দেয়া হোক। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার অবর্তমানে ধর্মের ব্যাপারে কি কি নতুন নতুন বিদায়াত সৃষ্টি করেছে। একথা শুনে আমি বলব, আমার থেকে তোমরা দূর হও দূর হও, যারা আমার পর দ্বীনের মধ্যে নানা রকম বিদয়াত ও নতুনত্ব সৃষ্টি করছ। —বোখারী, মুসলিম।

কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে মানুষ যখন তৃষ্ণাকাতর হয়ে ছটফট করতে থাকবে, তখন বিদয়াত সৃষ্টিকারীদের অবস্থা কতই না খারাপ ও বিপর্যদস্ত হবে। তারা হাউজে কাউছারের নিকট এসে পানি পান করতে চাইলে পানি পান করতে দেয়া হবে না। তাদেরকে ধাক্কিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে। সৃষ্টিকুলের দয়ার প্রতীক মহানবী (সঃ) তাদের বিদ্য়াত সৃষ্টির অবস্থা শুনে তাদেরকে 'দূর হও, দূর হও' বলে তাড়িয়ে দেবেন।

কোরআন-হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এবং তা থেকে যা কিছু উদ্ভাবন হয়, সে অনুযায়ী জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে ইহকাল-পরকালের কল্যাণ।

এ যমানার মানুষ ধর্মের মধ্যে হাজার প্রকার বিদ্য়াত সৃষ্টি করে রেখেছে। দ্বীনের মধ্যে কোরআন সুন্নাহর বিপরীত নতুনত্ব সৃষ্টি করে তার প্রচলন ঘটিয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া অর্জন করা এবং নফসের দাবী পূরণ করে কিছু স্বার্থ হাসীল করা। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার বিদ্য়াত রুসুম রেওয়াজে ভরে গেছে। এসব বিদায়াতী লোকদেরকে দ্বীনের কথা বুঝান হলে এবং বিদ্য়াত গুনাহের কথা বলা হলে তারা তা খারাপ মনে করে থাকে। আমাদের সরল সোজা কথা হচ্ছে, যে কোন কাজই করা হোক না কেন, নবী করীম (সঃ) যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন সে অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

বর্তমান যুগে অগণিত পীর-ফকীরগণ শত সহস্র প্রকার বিদয়াত সৃষ্টি করে দ্বীনের নামে নতুন এক বাজার সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা এ বাজার থেকে খাজনা উসল করে। তাদের কাছে এসব কাজের দলিল প্রমাণ চাওয়া উচিত বা জিজ্ঞেস করা উচিত যে, এসব কাজ নবী করীম (সঃ) করেছেন কি না? অথবা কোরআন হাদীসের কোন কিতাবে আছে কি না? কিংবা নবী করীম (সঃ) এসব কাজ করা পছন্দ করেছেন কি না ?

জন্ম-মৃত্যু ও বিয়ে শাদীর ব্যাপারে মহিলাগণ এবং পীর-ফকীরগণ বিরাট বিরাট বিদ্য়াত ও শরীয়তের বিপরীত রুসুম রেওয়াজ সৃষ্টি করে রেখেছে। সুয়ম

পালন, চেহলাম পালন, কবরের উপর মূল্যবান গিলাফ বিছান, কবরকে গোসল দান, কবরের উপর আতর-গোলাপ ছিটান ও আগর বাতি জালান ইত্যাদি নানা রকম বিদ্য়াত সমাজে প্রচলন করা হয়েছে। এসব বিদয়াতের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। হাশর ময়দানে প্রচণ্ড তৃষ্ণা-কাতর অবস্থায় তারা কি হাউজে কাউছার হতে বিতাড়িত হতে প্রস্তুত? তা তাদের চিন্তা করা উচিত। কবরকে কেন্দ্র করে উরসের গরম বাজারের কথা তো আছেই। তদুপরি কবরকে সেজদা করা, পীর ফকীরকে সেজদা করা শুধু বিদয়াতই নয় বরং সুস্পষ্ট শিরকী কাজ। এ কাজ করলে ঈমান থাকে না। অতএব আমাদের চিন্তা করা উচিত এ যুগের পীর-ফকীরেরা নিজেরা কোথায় গিয়ে পৌছেছে এবং তাদের মুরীদগণকে ওরা কোথায় নিয়ে পৌছিয়েছে।

স্বীয় পিতার নাম ধরে ডাকা হবে

হযরত আবি দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ তোমাদের নাম ধরে ডাকা হবে। (অর্থাৎ হে খালেদের পুত্র আবদুল্লাহ বলে ডাকা হবে।) সুতরাং তোমরা ভাল নাম রাখবে। —আবু দাউদ, আহমদ।

সমাজে কথিত আছে যে, কেয়ামতের দিন মাতার নাম উল্লেখসহ ডাকা হবে। একথা ঠিক নয় বরং মনগড়া কথা। ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে 'পিতার নামে ডাকা হবে' এ শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন পিতার নাম উল্লেখ করেই ডাকা হবে। মুয়ালিমুত তানযীল' গ্রন্থে মাতার নাম উল্লেখ করে ডাকার তিনটি কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব কথা তার নিজস্ব ও মনগড়া, শুধু সমাজে প্রচলিত থাকার কারণে লেখা হয়েছে। গ্রন্থকার তিনটি কারণ উল্লেখের পর লেখেছেন যে, এ কথার বিপরীতে বিশুদ্ধ হাদীস বর্তমান। সুতরাং হাদীসের বিপরীত এবং ভিত্তিহীন কথা গ্রহণ করা যায় না।

কেয়ামত মানুষকে সম্মানিত ও অপমানিত করবে

হাশরের ময়দানে দুনিয়ার অনেক অবহেলীত লোক হবে সম্মানীত। আর অনেক গর্বিত ও অহংকারী ধনশালী লোক হবে অপমানিত। কেয়ামত হচ্ছে সম্মানিত ও অপমানিত হওয়ার দিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ *

"যখন মহা প্রলয় সংঘটিত হবে। তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মিথ্যার লেশ নেই। সে মহাপ্রলয় (কেয়ামত) কতককে করবে হীন ও অপমানিত, আর কতককে করবে সম্মানিত ও উন্নত।" —সূরা ওয়াকিয়া, ১ম রুকু।

কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে তাদের আমল অনুযায়ী মান-মর্যাদা নির্ণয় করা হবে। সেদিন ছোট-বড়, মান-মর্যাদা ও অপমানের মানদণ্ড হবে আমল। নেক আমলের কারণে মানুষ হবে সম্মানিত, আর বদ আমলের কারণে মানুষ হবে হীন ও অপমানিত। মোটকথা আমলই হবে মান-অপমানের মানদণ্ড। দুনিয়ায় যেসব দাম্ভিক অহংকারী ধনশালী ও গৌরবময় লোককে সম্মানিত ভাবা হত, তাদেরকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের কৌলুণ্য চৌধুরীপনা ও তালুকদারিত্বে কোনই কাজ হবে না। সব মাটির সাথে মিশে যাবে। কোরআনের ভাষায় তখন তাদের মুখেই ফুঠে উঠবে।

مَا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ ط هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ *

অর্থাৎ আমাদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি দ্বারা কোনই উপকার হল না, আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু আজ ধ্বংস হয়ে গেল। —সূরা হাক্কা - ২য় রুকু।

হাশর ময়দানে এরূপ অনুশোচনায় কোনই কাজ হবে না। দুনিয়াতে অনেক লোক বিনয় ও নম্র অবস্থায় জীবন যাপন করে থাকে, তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাদেরকে নীচ জাত ও নীচ বংশের ভাবা হত। তারা নিজেদের সম্মান ও গৌরবের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করত না। তারা যেহেতু আল্লাহ তাআ'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করত, এ কারণে কেয়ামতের দিন তাদের কেউ মেশকের টিলায়; কেউ নূরের মিম্বরে, আবার কেউ আরশের ছায়াতলে মহা সম্মানের সাথে অবস্থান করবেন। অতঃপর তাদের মধ্যে অনেকে বিনা হিসাবে, অনেকে হিসাবান্তে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা জান্নাতের বালাখানায় চির আনন্দময় পরিবেশে থাকবেন। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا *

"এসব লোক ঈমান ও ধৈর্য সঞ্চিতার কারণে এমন বালাখানায় অবস্থান করবে, যাতে তারা লাভ করবে অভিবাদন ও শান্তি।" —সূরা ফুরকান- ৬ রুকু।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে যারা অপরিমিত পানাহার ও বিপুল ধন সম্পদের মধ্যে বিলাস-বহুল জীবন যাপন করত, তারা অনেকেই পরকালে উলংগ ও বুভুক্ষ অবস্থায় থাকবে। সাবধান! দুনিয়ায় অনেকে নিজদেরকে সম্মানিত বানিয়ে নিয়েছে। আসলে তারা নিজেদেরকে হীন ও অপমানিত করছে। (পরকালে তাদের কোনই পাত্তা থাকবে না।) আর দুনিয়ায় এমনও অনেক মানুষ আছে, যারা নিজদেরকে বিনয়তা ও নম্রতার কারণে হীন ও তুচ্ছ করে রেখেছে। মূলত তারা নিজদেরকে সম্মানিত করে তুলছে। কেননা তাদের বিনয়তা ও নম্রতা তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন অনেক মোটা তাজা ও ভারী লোক আল্লাহ তাআ'লার কাছে মশা-মাছির সমতুল্যও ওজন হবে না (সেদিন তাদের কোন মর্যাদাই থাকবে না)। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, তোমরা কোরআন মজীদের এ আয়াতটি পাঠ কর।

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا *

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন পরিমাপ যন্ত্রই কায়েম করব না। —বোখারী, মুসলিম, মেশকাত।

বর্তমান দুনিয়ায় এমন অনেক মনিব রয়েছে, যাদের অনেক চাকর-চাকরাণীও দাস-দাসী বিদ্যমান। তারা তাদেরকে গালিগালাজ ও মারপিট করে। অনেকে ধন দৌলতের নেশায় অধিনস্ত লোকদেরকে অযথা এবং কথায় কথায় নির্যাতন করে। কিন্তু হাশর ময়দান হচ্ছে সঠিক বিচার-ফয়সালার দিন। সেখানে অনেক চাকর-চাকরানী ও তুচ্ছ লোকও হবে সম্মানিত ও উন্নত। আর অনেক সম্মানিত ও পজিশনওয়ালা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি হবে হীন তুচ্ছ ও অপমানিত। তারা অপমানিত-লাঞ্ছিত হয়ে অবশেষে হবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। দুনিয়ার যশখ্যাতি লাভ ও গৌরব অর্জনের জন্য যারা বারবার নির্বাচনের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় এবং সম্মান ও গৌরব লাভের আশায় যারা আল্লাহ তাআ'লার বিধানকে করে পদদলিত, এমন লোকদের পরিণাম কি দাড়াবে? তারা যেন নিজেদের অবস্থান বুঝে নেয়।

পার্থিব নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ

আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে সন্তান-সন্ততিসহ নানা প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ প্রদান করেছেন। কেয়ামতের দিন সেসব সুখের উপকরণ ও নেয়ামত সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রশ্ন করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ * ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ "সেদিন তোমাদের সুখের উপকরণ ও নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" —সূরা তাকাছুর।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সুখের উপকরণসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে সুস্বাস্থ্য ও শীতল পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর জিজ্ঞেস করা হবে– আমি কি তোমার দেহকে সুস্থ স্বাবলীল রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দান করিনি ? —তিরমযী, মেশকাত।

আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন, তা তার অধিকার ছাড়াই দান করেছেন। সুতরাং তার অনুদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অধিকারও তাঁর

রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা আমার দেয়া সুখের উপকরণ ও নেয়ামতসমূহ সর্বদা উপভোগ করেছ, সুতরাং সেসব নেয়ামতের কি হক আদায় করেছ? আমার কতটা এবাদাত করেছ? এসব নেয়ামতসমূহ ব্যবহারের বিনিময়ে তোমরা কি নিয়ে এসেছ ?

এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে খুবই কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ। যারা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামত সমূহের শুকরিয়ায় পুণ্যময় কর্ম করে এবং পরকালের জিজ্ঞাসাবাদের কথা স্মরণ করে ভীত কম্পিত থাকে, তাঁরাই হচ্ছে ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তারাই হচ্ছে হতভাগা পাপিষ্ঠ ও চির দুঃখী, যারা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামতসমূহের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয় এবং তার নেয়ামতসমূহের মধ্যে থাকে সর্বদা নিমজ্জিত, কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে কিছুমাত্র খেয়ালও তাদের মনে উদয় হয় না। আল্লাহর সমীপে একটু মাথাবনত করার চিন্তাও তাদের হয় না।

এ জগতে মানুষের কল্যাণে রয়েছে আল্লাহ তাআ'লার অগণিত উপকরণ ও নেয়ামতসমূহ। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ * وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا "যদি তোমরা আল্লাহ তাআ'লার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তা হলে তোমরা তা গণনা করতে পারবে না।" এ কথার পরপরই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ * اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ "নিশ্চয়ই মানুষ বড় জালেম ও অকৃতজ্ঞ।" —সূরা ইবরাহীম– ৫ম রুকু।

চিন্তা করুন মানুষ কত বড় নির্বোধ। মানুষ একে অপরের দ্বারা উপকৃত হলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। কারো কাছে থেকে কিছু পেলে তার কাছে সে অবনমিত হয়ে থাকে, তার সম্মুখে খুব আদবের সাথে দণ্ডায়মান হয়। অথচ এ উপকারকর্তা বা দাতা ব্যক্তি বিনা স্বার্থে দেয় না, বরং কোন কর্মের বিনিময়ে দেয় অথবা ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশায় দিয়ে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা– মালিক ও অভাবমুক্ত সত্ত্বা। তিনি মানুষকে যা কিছু নেয়ামত দান করেন, তা বিনা স্বার্থে ও বিনিময় ছাড়াই দান করেন। কিন্ত মানুষ তার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে এবং তার সম্মুখে সেজদাবনত হতে চায় না। এটা তার জন্য বিড়ম্বনা ও অকল্যাণ ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ আল্লাহ তাআ'লার প্রতিটি নেয়ামতের মুখাপেক্ষী, তার কতটা নেয়ামত সে গণনা করবে। মানব দেহের সুখ-শান্তি ও সুস্থতার কথাই চিন্তা করুন। আল্লাহর এ নেয়ামত পাওয়া মানুষের জন্য যে, কত বিরাট সৌভাগ্যজনক, তা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়। পিপাসা পেলেই মানুষ ডগ ডগ করে ঠাণ্ডা পানি পান করে। এ পানি কে সৃষ্টি করেছেন? সে সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং তার কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার জন্য আমরা কি কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করি? বাস্তবিকই এটা চিন্তা করার বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষ তার হিসাব নিকাশের স্থান হতে এক পা-ও অগ্রসর হতে

পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটি বিষয়ে তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে। সেগুলো হল, (১) জীবন কালের সওয়াল– মানুষ তার বয়সকে কি কর্মে নিমগ্ন রেখে কাটিয়েছে? (২) যৌবন কাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে– যৌবন কালকে সে কি কাজে ব্যয় করেছে? (৩) ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি সে কিভাবে অর্জন করেছে? (৪) ধন-সম্পদ সে কোন কাজে ব্যয় করেছে ? (৫) দ্বীনি ইলম কতটুকু ছিল এবং সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? তা-ও জিজ্ঞেস করা হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষের তিনটি দফতর হবে। একটি দফতরে তার পুণ্যময় কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে। আর একটি দফতরে লিপিবদ্ধ থাকবে তার গুনাহসমূহ। আর একটি দফতরে আল্লাহর সেই নেয়ামতসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে, যা দুনিয়ার জীবনে তাকে দান করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তাআ'লা সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামত সম্পর্কে বলবেন, আমার এ নেয়ামতের মূল্য তার নেক আমল হতে গ্রহণ কর। সুতরাং সে নেয়ামত তার মূল্যের বিনিময়ে সমস্ত নেক আমলসমূহ নিয়ে নেবে। তারপর সে নেয়ামত বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার সম্মানের শপথ করে বলছি, আমি আমার মূল্য পুরাপুরি আদায় করিনি। এরপর তার কোনই পুণ্য থাকবে না কিন্তু তার নেয়ামতসমূহ থাকবে (যার মূল্য পরিশোধ হবে না)। যা কিছু পুণ্য ছিল তা পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। কেননা সবচেয়ে ক্ষুদ্র নেয়ামতটি তার মূল্যের বিনিময়ে সব পুণ্য নিয়ে গেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা যদি কোন বান্দার প্রতি দয়া করতে চান, অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করতে চান, তখন বলবেন, হে আমার বান্দা! আমি তোমার পুণ্যকর্ম বর্ধিত করেছি এবং তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত নবী করীম (সঃ) এ স্থলে আল্লাহ তাআ'লার বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, "আমি তোমাকে আমার নেয়ামতসমূহ দান করেছিলাম।" — আত্তারগীব অত্তাবহীব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে ছাগল শাবকের ন্যায় (মূল্য ও মর্যাদাহীন অবস্থায়) উপস্থিত করে আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে দণ্ডায়মান করান হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি তোমাকে বিপুল শান্তির উপকরণ ও নেয়ামতরাজি দান করেছিলাম। তুমি তা কিভাবে ব্যবহার করেছ ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপাকলক! আমি ধন সম্পদ সঞ্চয় করে তা দ্বারা বিপুল অংকের মুনাফা অর্জন করেছি। তা বহুগুণে বর্ধিত করেছি। প্রথম যা ছিল তার তুলনায় অনেকগুণ বর্ধিত আকারে দুনিয়ায় রেখে এসেছি। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন, আমি তা নিয়ে এসে আপনার কাছে উপস্থিত করি। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোন বিধান নেই, দুনিয়ার জীবনে এখানের জন্য যা কিছু পাঠিয়েছ, তা-ই দেখাও। এ কথার উত্তরে সে আবার বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে তা দ্বারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছি। প্রথম অবস্থার

তুলনায় বহুগুণ বেশি সম্পদ দুনিয়ায় রেখে এসেছি। আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান, আমি সব সম্পদ আপনার দরবারে এনে হাজির করব। মোটকথা সে এভাবেই বলতে থাকবে। যেহেতু সে দুনিয়ার জীবনে এখানকার জন্য কোন কিছুই প্রেরণ করেনি। সুতরাং পরিণতিতে সে শূন্য হস্তরূপে পরিগণিত হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। —তিরমিযী, মেশকাত।

অন্যান্য নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মাদীর সাক্ষ্য

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের ময়দানে হযরত নূহ (আ)-কে উপস্থিত করা হবে। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি আমার বিধান মানুষের কাছে পৌছিয়েছ? তখন হযরত নূহ (আ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার বিধান আমার উম্মতের কাছে আবশ্যই পৌছিয়েছি, এতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নেই। অতঃপর তার উম্মতগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা বলতো নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বিধান পৌছিয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন ভীতি প্রদর্শন কারী আসেনি। এরপর হযরত নূহ (আ)-কে বলা হবে, তোমার দাবীর অনুকূলে কি কোন সাক্ষী আছে ? তিনি বলবেন, আমার সাক্ষী হচ্ছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর উম্মতগণ।

এটুকু বলার পর নবী করীম (সঃ) স্বীয় উম্মতগণকে সম্বোধন করে বললেন, এরপর তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে বলবে, নিশ্চয় হযরত নূহ (আ) তার সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তাআ'লার বিধান পৌছিয়েছেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন ঃ

"আমি তোমাদেরকে এমন এক উম্মত বানিয়েছি, যারা মধ্যমপন্থার অনুসারী। যাতে তোমরা অন্যান্য উম্মতের লোকদের বিরুদ্ধ সাক্ষী হতে পার। আর তোমাদের বিরুদ্ধে রাসূল (সঃ) সাক্ষী হবেন।" (সূরা বাকারা) —বোখারী, মেশকাত।

ইমাম আহমদ (র)সহ অন্যান্য রাবীদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর উম্মত ছাড়া অন্যান্য নবীদের উম্মতগণও স্ব স্ব নবীর তাবলীগ ও হেদায়েতের বাণী প্রচারের কথা অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছান হয়নি। তাদের নবীদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কি আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে পৌছাওনি ? তাঁরা বলবেন, আমরা পৌছিয়েছি। তখন তাদের কাছে সাক্ষী তলব করা হলে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতগণকে সাক্ষীরূপে পেশ করবেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বলা হবে– এ বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি বলবেন, হা আমি নবীদের দাবীকে সত্যায়িত করছি। উম্মতে মুহাম্মদীর কাছে জিজ্ঞেস করা হবে এ বিষয়ে তোমরা কি জান? জবাবে তারা বলবে, আমাদের কাছে আমাদের

নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসেছেন। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সব নবী-রাসূলগণই নিজ নিজ উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআ'লার বিধান পৌছিয়েছেন।
—তাফসীর দুররে মানছুর, ১ম খণ্ড।

উপরোক্ত لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ "যাতে তোমরা অন্যান্য নবীদের উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষি হতে পার।" এ আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে– হযরত নূহ (আ) ছাড়াও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উম্মতের বিরুদ্ধে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য প্রদান করা । এখানে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, অন্যান্য নবীদের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মাদী কখনো বেশি সত্যবাদী ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা হলে নবীদের সততাকে উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করার কি অর্থ হয় ?

প্রত্যুত্তর হচ্ছে, সততা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে নবীগণের মান সর্ব উর্ধ্বে। যেহেতু পরকালের এ মামলায় দু'টি গ্রুপ হবে। এ কারণে সেখানে সুবিচারের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন। তাই সাক্ষীগণ যদিও নবীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য ও সততার গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা স্বয়ং মহানবী (সঃ)-ই বলেছেন। যেমন কোন সরকারী পদস্ত কমকর্তা কোন বেয়াদব চাপরাশির মামলার গ্রুপ হলে তখন সর্বোচ্চ বিচারকের আদালতে ঐ পদস্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য চাওয়া হয়। যদিও পদস্ত কর্মকর্তার তুলনায় চাপরাশী ব্যক্তির মান অনেক নিম্নে হয়। অতঃপর সাক্ষ্য সততার ভিত্তিতেই বিচার করা হয়। এর দ্বারা আর এক জিজ্ঞাসারও জবাব পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসাটি হল– যারা নবুয়ত ও বিধান পৌছানোর কথা অস্বীকার করে, তারা তখন একথাও বলতে পারে যে, আমরা যখন নবীগণকে সত্যবাদী স্বীকার করিনি তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে কেন সত্যবাদীরূপে সমর্থন করব ?

এ উত্তর হল, এরূপ কোন কথা বলারই তাদের কোন অধিকার থাকবে না। কেননা বাদী যখন সাক্ষী পেশ করে তখন যদি বিবাদী সাক্ষীগণকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারে তখনই সাক্ষীগণকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। সাক্ষী পেশ হওয়ার পর বিবাদীর শুধু একথা বলাই যথেষ্ট হবে না যে, আমি তাদেরকে সত্যবাদী মনে করি না। আর এটাও অবিসংবাদিত বিষয় যে, বিবাদী তাদেরকে সত্যবাদী মনে করুক বা না করুক, বিচারের জন্য বিচারকের কাছে তারা সত্যবাদী হওয়াই যথেষ্ট।

নবীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লা যেমন প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তেমনি নবীদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ *

"যাদের কাছে নবী-রাসূল পাঠান হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব এবং নবী রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করব।"—সূরা আরাফ, ১ম রুকু।

আল্লাহ আরও বলেন ঃ "আর যেদিন তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে– তোমরা নবীদের আহবানে কি উত্তর দিয়েছিলে, সুতরাং সেদিন তাদের থেকে সমস্ত বিষয় বিলীন করা হবে। তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।"
—সূরা কাসাস – ৭ম রুকু।

অর্থাৎ উম্মতদের নিকট নবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমারা তাঁদের ঈমান ও নেক আমলের দাওয়াতে কি উত্তর দিয়েছিলে? তখন তারা কোন উত্তরই দিতে পারবে না। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সেদিন আল্লাহ তাআ'লা সব নবী-রাসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা উম্মতদের পক্ষ থেকে কি জবাব পেয়েছিলে? তখন তাঁরা বলবেন, আমাদের কোন কিছুই জানা নেই। নিঃসন্দেহে আপনি সমস্ত গোপন বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। —সূরা মায়েদা– ১৫ রুকু।

নিজ নিজ উম্মতের সম্মুখেই নবী-রাসূলদের কাছে এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে। বলা হবে, তোমরা যখন এদের সত্যের দাওয়াত দিয়েছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিল? এ সময় মহান আল্লাহ তাআ'লার মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তি প্রকাশ পাবে। তখন তার প্রতিপত্তির কারণে সকলেই ভীত হয়ে পড়বে। সীমাহীন ভয় ভীতির কারণে তাঁরা আল্লাহ তাআ'লার সম্মুখে বলবে جَوَابًا لَا عِلْمَ لَنَا "আমাদের কোন জ্ঞান নেই।" তাদের মুখ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু বের হবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষ্য

মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কেও একজন অন্যতম সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

"যখন প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে।"
—সূরা নিসা– ৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবী এবং প্রতিটি যুগের পুণ্যবান বিশিষ্ট লোকের সাক্ষী প্রদানের কথা বুঝান হয়েছে। তারা মহাবিচারের দিন মানুষের বাধ্যতা ও অবাধ্যতা অবস্থা সর্ম্পকে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। উপরোক্ত আয়াতে "আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব।" কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে– অন্যান্য নবীদের ন্যায় আপনিও নিজ উম্মতের অবস্থা ও আমল-আখলাক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। এখানে هَٰؤُلَاءِ (তাদের) শব্দ দ্বারা অন্যান্য নবীদের প্রতি ইঙ্গিতের

সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ অবস্থায় মর্মার্থ হবে– বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অন্যান্য নবীদের সততা এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, যখন তাদের উম্মতগণ তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে।

এখানে এ মর্মার্থ হওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে যে, هٰؤُلَاءِ (তাদের) শব্দ দ্বারা কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াত (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) এতে করা হয়েছে, এ অবস্থায় অর্থ হবে– অন্যান্য নবীগণ নিজ উম্মতের কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করবেন, অনুরূপ আপনিও তাদের খারাপ আমল সম্পর্কে সাক্ষী হবেন। ফলে তাদের কুফরী ও পথ ভ্রষ্টতার বিষয়টি প্রকটভাবে প্রমাণিত হবে।

হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে হযরত ঈসা (আ)-এর কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"যখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুকি কি লোকদেরকে একথা বলেছ যে, তোমরা আল্লাহ তাআ'লাকে বাদ দিয়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর ?" —সূরা মায়েদা– শেষ রুকু।

তখন হযরত ঈসা (আ) উত্তরে যে কথা বলবেন তা কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ ঃ

"হযরত ঈসা (আ) বলবেন, আপনি সর্বপ্রকার দোষমুক্ত ও পবিত্র সত্তা। আমার পক্ষে সে কথা বলা কোনক্রমেই শোভনীয় নয় যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই। এরূপ কোন কথা আমি যদি বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার তা জানা আছে। আমার অন্তকরণের কথা তো আপনি ভাল জানেন। কিন্তু আপনার জ্ঞানে যা কিছু আছে, তা আমার জানা নেই। নিঃসন্দেহে আপনি গোপন বিষয় ভালভাবে অবগত। আমি তাদেরকে কেবল সে কথাই বলেছি, যা আপনি আমাকে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হল, তোমরা একমাত্র আল্লাহরই এবাদাত করবে যিনি হচ্ছেন আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। আমি তাদের মধ্যে যতদিন ছিলাম, ততদিনই আমি তাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিছেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের রক্ষক ও পর্যবেক্ষক। আপনি প্রতিটি বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তো দেয়ার অধিকার আছে, কেননা তারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে তারও অধিকার আপনার রয়েছে। কেননা আপনি হচ্ছেন প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা।" —সূরা মায়েদা, শেষ রুকু।

এ আয়াতে যদিও ক্ষমার কথা উত্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু যারা কাফের ও মুশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ক্ষমা লাভের বিধান নেই। খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা কুফরী ও শেরকী করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, নিঃসন্দেহে তারা জাহান্নামী হবে। কেননা তারা নিজেদের নবীর হেদায়াত বর্জন করে পথভ্রষ্ট ও কাফের হওয়ার কারণে অবশ্যই তাদেরকে চিরন্তন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ

মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফের মুশরেকদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের কাছেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে, তোমরা তাদেরকে তোমাদের পূজা অর্চনা করার জন্য বলেছ কি না? এ বিষয়ে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ *

"মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা সবাইকে জমায়েত করবেন। অতঃপর ফেরেশতাগণকে সম্বোধন করে বলবেন, এরা কি তোমাদের পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করত?" —সূরা সাবা, ৫ম রুকু।

এ দুনিয়ায় অনেক কাফের মুশরেক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তাআ'লার পুত্র মনোনীত করে তাদের কল্পিত প্রতিমূর্তি ও ভাস্কর্য বানিয়ে তার পূজা অর্চনা করে থাকে। কোন কোন ওলামায়ে কেরাম বলেন, প্রতিমা পূজার সূচনা হয়েছে ফেরেশতা পূজা দ্বারা। মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা কাফের মুশরেকদেরকে শুনিয়ে ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, এসব লোকেরা কি তোমাদের পূজা অর্চনা করত? এ জিজ্ঞাসার অর্থ হচ্ছে– তোমরা তো তাদেরকে এরূপ করতে বলনি এবং তাদের এ কাজে তোমরা খুশিও ছিলে না। আর এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাদের নেতিবাচক উত্তরটি তাদেরকে শোনান হবে যে, আমরা তাদেরকে আপনার সাথে শেরক করার কোন নির্দেশ দেইনি এবং তাদের শেরকি কাজে আমরা সন্তুষ্টও ছিলাম না। যাতে মুশরেকেরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আমাদের আমলের জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের আমলের বোঝা অন্য কারো উপর চাপান যাবে না। আমাদের আমলের ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

উপরোক্ত জিজ্ঞাসার জবাবে ফেরেশতাগণ যে উত্তর প্রদান করবেন কোরআনের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ

"প্রত্যুত্তরে ফেরেশতাগণ বলবে, হে প্রভু! আপনি পবিত্রময়। তারা নয়, আপনিই আমাদের অভিভাবক। তারা বরং জিনদের এবাদাত করত। তাদের অধিকাংশ তাদের প্রতিই ঈমান রাখত।" —সূরা সাবা– ৫ম রুকু।

অর্থাৎ কোন দিক দিয়েই আপনার সত্তা শেরক মিশ্রিত হতে পারে না। এ দোষ থেকে আপনার সত্তা মুক্ত ও পবিত্র। অতএব আপনার শানে আমরা এমন কথা বলতে পারি না এবং এমন কাজে খুশিও থাকতে পারি না। আপনার খুশি হওয়ার মধ্যেই আমাদের খুশি নিহিত। এসব অপদার্থদের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই। এরা আসলে আমাদের পূজা-অর্চনা করত না বরং তারা শয়তানের এবাদাত বন্দেগী করত। শয়তান তাদেরকে যেদিকে চালাতো. তারাও সে দিকেই চলত। তাতে তারা ফেরেশতাদের নাম উচ্চারণ করুক বা কোন নবী-রাসূল কিম্বা ওলী শহীদ কিংবা পীর ফকীরদের নাম বলুক না কেন। তাদের মূল চালক ছিল শয়তান। বিভিন্ন নামের ধোঁকা দিয়ে সে তাদেরকে পরিচালিত করত।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "আজ তোমাদের মধ্যে কেউ আর কারো উপকার করার অধিকারী হবে না এবং কারো ক্ষতিও করতে পারবে না। তখন আমি জালেমদেরকে (কাফের মুশরেক) বলব, তোমারা অগ্নি শাস্তি উপভোগ কর, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে ।" —সূরা সাবা– ৫ম রুকু।

জিনদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশর ময়দানে আল্লাহ্ তাআ'লা জিনদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِاسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ *

"যেদিন আল্লাহ্ তাআ'লা সকলকে জমায়েত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন, হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে বহু লোককে নিজেদের অনুগত করেছিলে।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "মানুষের মধ্য থেকে তাদের বন্ধুগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একে অপর থেকে উপকৃত হয়েছি। আমরা সে নির্ধারিত মেয়াদে উপনীত হয়েছি, যে সময়কে আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" —সূরা আনআ'ম– ১৫ রুকু।

দুনিয়ায় যারা বিভিন্ন দেব-দেবী ও মূর্তির পুজা অর্চনা করে, তারা মূলত দুষ্ট জিন ও শয়তানেরই পূজা করে থাকে, আর মনে করে যে, তাদের দ্বারা আমাদের উপকার হবে। তাই তারা তাদের উদ্দেশ্যে নজর নেয়াজ ও নৈবদ্য পেশ করে। তাদের চতুর্দিকে নর্তন-কুর্দন করে গান গায়, বিভিন্ন বাজনা বাজায়। পূর্বকালে বর্বর যুগের নিয়ম ছিল যে, বিপদ-আপদকালে তারা জিনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। মহাবিচারের দিন যখন জিনদেরকে এবং তাদের যারা পূজা অর্চনা করত তাদেরকে ডাকা হবে, তখন মুশরেকগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক!

আমরা তো সাময়িক কার্যক্রম সুসম্পন্ন করেছি। মৃত্যুর নির্ধারিত দিনটি আগমনের পূর্বেই পার্থিব প্রয়োজনার্থে আমরা একে অপর থেকে কাজ নেয়ার একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম।

আল্লাহ তাআ'লা তখন যা বলবেন কোরআন মজীদের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ "আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেন, জাহান্নামের আগুনই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান। তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। তবে আল্লাহ তাআ'লার যা ইচ্ছে হয়। আপনার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। এমনিভাবে আমি জালেমদের একজনকে অপরজনের সাথে সাক্ষাত করাব, তাদের কৃতকর্মের কারণে।

—সূরা আনআ'ম, ১৫ রুকু।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ "হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি? যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করত। তখন তারা স্বীকার করে নেবে যে, আমরা গুনাহের কথা স্বীকার করছি। পার্থিব জীবনে তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। তারা নিজেরাই স্বীকার করবে যে, তারা কাফের ছিল।' —সূরা আনআ'ম, ১৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, জিন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়কে একত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তোমাদের কাছে কি নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেনি? এর উত্তরে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে, হাঁ আমাদের কাছে নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা শুনিনি এবং মানিনি, সুতরাং আমরাই অপরাধী। এ আয়াতেই উল্লেখ হয়েছে যে, তারা নিজেরা কাফের হওয়ার কথা স্বীকার করবে। কোরআন মজীদের আর এক আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা বলবে مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ "আমরা মুশরেক ছিলাম না।" সুতরাং উভয় আয়াতের বক্তব্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

এ দ্বন্দ্বের উত্তর হচ্ছে– প্রথমত তারা কাফের মুশরেক হওয়ার কথা অস্বীকার করবে। কিন্তু আমলনামা হাতে পাওয়ার পর এবং সাক্ষী উপস্থিত হওয়ার পর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। মানুষের নিয়ম হচ্ছে প্রথমত তারা অপরাধ স্বীকার করে না। কিন্তু যখন তারা দেখে যে, স্বীকার না করে কোন উপায় নেই, স্বীকার করলে হয়ত মুক্তি পাওয়া যাবে, তখনই তারা অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু হাশর ময়দানে কাফের মুশরেকগণ নিজদের অপরাধ স্বীকার করলেও নাজাত পাবে না।

মুশরেকদের অপরাধ অস্বীকার

হাশর ময়দানে মুশরেকেরা দুনিয়ায় শিরক ও কুফরী করার কথা অস্বীকার করবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"সে দিনটি স্মরণযোগ্য, যে দিন আমি সকলকে একত্রিত করব। অতঃপর আমি মুশরেকদেরকে বলব, তোমরা যাদেরকে মাবুদ ধারণা করে আমার সাথে শরীক করতে, তারা আজ কোথায়? অতঃপর তাদের ফেৎনার বিষয় এরূপ হবে যে, তারা বলবে, আমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, দুনিয়ায় আমরা মুশরেক ছিলাম না। —সূরা আনয়াম- ৩ রুকু।

এরপর আল্লাহ্ বলেন,

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ *

"লক্ষ করুন তারা আপন সত্তার প্রতি কিভাবে মিথ্যারোপ করছে। যাকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল এখন তা সবই অদৃশ্য হয়ে গেছে।"

মহাবিচারের দিন কাফের মুশরেকগণ শিরক ও কুফরীর কথা অস্বীকার করলেও তারা নাজাত পাবে না। তাদের আমলনামা ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাদের শিরক-কুফরীর অপরাধ প্রমাণ হবে। প্রমাণ হওয়ার পরই তারা অপরাধ স্বীকার করবে। যেমন সূরা আনয়ামের ১৬তম রুকুতে উল্লেখ হয়েছে যে, স্বীকার করার পরও তারা চিরন্তন শাস্তি হতে নাজাত পাবে না।

যাদের পুজা করত তারাও অস্বীকার করবে

কাফের মুশরেকগণ আল্লাহ তাআ'লার সত্তা, গুণাবলী ও ক্ষমতায় যাদেরকে অংশী সাব্যস্ত করত, তারাও মহা বিচারের দিন তাদের এবাদাত করার কথা অস্বীকার করবে। এ বিষয়ে কোরআন মজীদের আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "তাদের অংশীদারগণ বলবে, তোমারা আমাদের এবাদাত বন্দেগী করতে না। এ ব্যাপারে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআ'লাই যথেষ্ট। তোমরা যে, আমাদের এবাদাত করতে সে ব্যাপারে আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ অমনোযোগী।" —সূরা ইউনুস- ৩য় রুকু।

হিসাব-নিকাশ, বিচার, আমল ও ওজনের বিবরণ

আমলের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ـ "প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরাপুরিভাবে তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে।"

নিয়তের ভিত্তিতে বিচার ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে যেসব লোকের বিচার ফয়সালা করা হবে, তাদের মধ্যে এমন এক

ব্যক্তি থাকবেন যাকে জিহাদে নিহত হওয়ার কারণে শহীদ মনে করা হয়। তাকে কেয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করান হবে। ফলে তারও সেসব নেয়ামতের কথা মনে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার এসব নেয়ামতসমূহ কি কি কাজে ব্যবহার করেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তোমার এ কথা সত্য নয়। তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করনি বরং তোমাকে মানুষ যাতে বীর পুরুষ বলে সে সুনামের জন্য লড়াই করেছ। সুতরাং দুনিয়ায় তোমার সুনাম ও যশখ্যাতি লাভ হয়েছে। (এখন তোমার কোন প্রতিদান নেই।) অতঃপর তাকে অধঃমুখে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। অতএব আল্লাহর হুকুম সাথে সাথে বাস্তবায়িত করা হবে।

তাদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি থাকবে যার বিচার ফয়সালা সর্বাগ্রে করা হবে। যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং বিশুদ্ধভাবে কোরআন মজীদ পাঠ করেছে। কেয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করা হবে। তারপর আল্লাহ তাআ'লার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ তাকে স্মরণ করান হলে তা তার মনে পড়বে। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার এসব নেয়ামত কোন কোন কাজে ব্যবহার করেছ? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি ইলমে দ্বীন অর্জন করেছি, এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। (তুমি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইলম শিক্ষা এবং কোরআন মজীদও পাঠ করনি,) বরং মানুষ তোমাকে আলেম বলবে সেজন্য ইলম শিক্ষা করেছ এবং তোমাকে কারী বলবে সেজন্য কোরআন পাঠ করেছ। তুমি এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতেই লাভ করেছ। তোমার মনের নিহিত উদ্দেশ্য ও নিয়ত অনুযায়ী তুমি তা পেয়েছ। অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম দেয়া হবে এবং সে হুকুম সাথে সাথে বাস্তবায়িত হবে।

তাদের মধ্যে আর এক ব্যক্তি থাকবে যার বিচার ফয়সালা সর্বাগ্রে হবে। তাকে আল্লাহ তাআ'লা পার্থিব জীবনে অনেক কিছু দান করেছিলেন। বিভিন্ন ধন সম্পদ দান করে তাকে সুখী সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। কেয়ামতের দিন তাকে হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার বিচারালয়ে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ তাকে স্মরণ করান হলে সবই তার মনে পড়বে। তখন আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নেয়ামত কি কি কাজে ব্যয় করেছ? সে লোক বলবে, যেসব কল্যাণকর খাতে ব্যয় করনে আপনি সন্তুষ্টি হন, সেসব খাতের কোনটিই আমি ছাড়িনি, বরং সব খাতেই ব্যয় করেছি। আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার ধন সম্পদ আপনার পথে ব্যয় করেছি। আল্লাহ তাআ'লা

বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। (আমার সন্তোষ লাভের জন্য তুমি ব্যয় করনি) বরং তোমাকে যাতে মানুষ দানবীর বলে সে জন্য তুমি ব্যয় করেছ। দুনিয়ায় তোমার মনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। (এখানে তোমার কোন প্রতিদান নেই।) অতঃপর তাকে অধঃমুখী করে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার হুকুম হবে। আর সে হুকুম যথাযথভাবেই তামিল হবে। —মুসলিম।

এ হাদীসটি সুনানে তিরমিযী গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে অতিরিক্ত একথা সংযোজিত হয়েছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন, তখন হাশর ময়দানের দৃশ্য তার সম্মুখে ভেসে উঠল। সে দৃশ্য অবলোকনে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর চেতনা ফিরে আসলে তিনি পুনরায় হাদীস বর্ণনা শুরু করলে আবার চেতনা হারিয়ে ফেললেন। আবার চেতনা ফিরে পেলে তিনি পুনরায় হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। সেবারেও তিনি চেতনা হারালেন। তারপর চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন।

এ হাদীসটি হযরত মুয়াবীয়া (রা)-কে শুনান হলে তিনি বললেন, এ তিন ব্যক্তির সাথে যখন এমনি ব্যবহার করা হবে, তখন অন্যান্য খারাপ নিয়তের মানুষের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করার কোন আশাই করা যায় না। এরপর মুয়াবীয়া (রা) এতটা কাঁদলেন যে, দর্শকমণ্ডলী মনে করল যে, আজই তাঁর প্রাণ চলে যাবে। —তিরমিযী।

হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফুযালা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সেদিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত লোককে সমবেত করবেন। সেদিন একজন ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, কেউ যদি আল্লাহর জন্য কোন নেক আমল অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্য করে, তবে তার উচিত সে যেন এ আমলের প্রতিদান আল্লাহ তাআ'লা ছাড়া অন্যদের থেকে গ্রহণ করে। —আহমদ মেশকাত।

মুহাদ্দিস বায়হাকী (র) শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লা যেদিন মানুষের আমলের প্রতিদান দেবেন, সেদিন নেককারদেরকে বলবেন, "তোমরা দুনিয়ায় যাদেরকে দেখাবার জন্য আমল করতে তাদের কাছে যাও, গিয়ে দেখ তাদের কাছে তোমাদের সে আমলের কোন প্রতিদান বা কল্যাণ পাওয়া যায় কি না। —মেশকাত।

নামাযের হিসাব ও নফলের মাহাত্ম্য ঃ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে তার নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। সুতরাং নামায যদি সঠিকভাবে পাওয়া যায়, তা হলে সে সাফল্য লাভ করবে। আর যদি নামায ভালভাবে না পাওয়া যায়, তা হলে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ফরয নামাযে কোন কমতি বা ঘাটতি থাকলে

তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না তা সন্ধান কর। বান্দার কোন নফল নামায পাওয়া গেলে, সে নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। নামাযের হিসাব গ্রহণের পর তার অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে। —আবু দাউদ, মেশকাত।

আর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নামাযের হিসাব গ্রহণের পর অনুরূপভাবে যাকাতেরও হিসাব গ্রহণ করা হবে। তারপর এভাবেই গ্রহণ করা হবে অন্যান্য আমলসমূহের হিসাব। —আবূ দাউদ, মেশকাত।

যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে একই ময়দানে সমবেত করা হবে। তখন জনৈক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, তারা কোথায় যাদের পাজর বিছানা হতে বিচ্ছিন্ন থাকত। (অর্থাৎ যারা রাতে শয্যা ত্যাগ করে নামায ও অন্যান্য বন্দেগীতে মশগুল থাকত তারা কোথায় ? এ ঘোষণা শুনে সমবেতদের মধ্য থেকে এ গুণাবলীর লোকেরা উঠে দাড়াবে, যাদের সংখ্যা হবে খুবই কম। এরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। অতঃপর অন্যান্য লোকের হিসাব গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হবে। —মেশকাত, বায়হাকী।

হযরত উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার প্রতিপালক আমার কাছে অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমার উম্মতের মধ্যে হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের আদৌ কোনরূপ শাস্তি হবে না। এদের প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার যারা এদের ফযিলতের মাধ্যমে পার পেয়ে যাবে। আর আমার প্রতিপালকের কুদরতী হাতের তিন মুঠো উম্মত ও হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

—তিরমিযী, আহমদ।

শাফাআ'ত বিষয়ক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন আমি আরশের নিচে স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সেজদারত হব। তখন আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তার এমন কিছু হামদ বা প্রশংসা বাক্য বলে দেবেন, যা পূর্বে কাউকে তিনি বলেননি। তারপর আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর, তোমার যা ইচ্ছে তা-ই চাও, তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হবে। তুমি তোমার উম্মতের জন্য সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। সুতরাং আমি মাথা উত্তোলন করে বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে যে, হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের সে সব লোকদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে ডান দিকের দরজা

দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান, যাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না। (অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সে মহান সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ । জান্নাতের দরজাগুলো এতটা প্রশস্ত হবে, মক্কা ও বাহরাইনের মধ্য যতটা দূরত্ব বিদ্যমান।
—বোখারী, মুসলিম।

সহজ হিসাব ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন এক নামাযের পর নবী করীম (সঃ)-কে এভাবে দোআ' করতে শুনেছি। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا "হে আল্লাহ! আমার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ কর।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হিসাব সহজ হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, সহজ হিসাব হল– আমলনামার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তা মাফ করে দেয়া। (কোন প্রকার তল্লাসী ও সন্ধান না করা।) যার চুলচেরা বিচার করে হিসাব গ্রহণ করা হবে। তার ধ্বংস অনিবার্য। —আহমদ, মেশকাত।

কঠিন হিসাব ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে যার থেকে সঠিকভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ "যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার হিসাব অতিসত্তর সহজে নেয়া হবে"। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু কিছু হিসাবদাতাও নাজাত লাভ করবে। এ কথার জবাবে নবী করীম (সঃ) বললেন, সহজ হিসাব হওয়ার অর্থ হল– বান্দার সম্মুখে শুধু আমলনামা পেশ করার পর পরই তাকে ছেড়ে দেয়া। (কোন হিসাব নিকাশ না হওয়া।) কিন্তু যার হিসাবে খুবই সূক্ষ্মভাবে হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য। —বোখারী, মুসলিম।

মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদেরকে তার নিকটবর্তী (হাশর ময়দানের লোকদের থেকে আড়াল) করে বলবেন, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে পড়ে? তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে পড়ে? সে উত্তরে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! সে গুনাহের কথা আমার স্মরণ আছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লা তার থেকে গুনাহের স্বীকারোক্তি নেবেন। তখন সে মনে মনে বিশ্বাস করবে যে, আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, দুনিয়ায় আমি তোমাকে আড়াল করে রেখেছিলাম। তোমার গুনাহসমূহ প্রকাশ হতে দেইনি। আর এখন আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি। এরপর তার পুণ্যময় আমলনামা তার হাতে দেয়া হবে। কিন্তু কাফের ও মুনাফেক লোকদের ব্যাপর

গোপন রাখা হবে না বরং সমস্ত লোকদের সম্মুখেই স্বজোরে ঘোষণা দিয়ে বলা হবে, এরা নিজেদের প্রতিপালক সম্পর্কে নানা প্রকার মিথ্যারোপ করত। তোমরা জেনে রাখ, জালেমদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। —বোখারী, মুসলিম।

কোন মাধ্যম ছাড়াই সামনা সামনি আল্লাহর জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হবে

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যে স্বীয় প্রতিপালকের সাথে হিসাবের ব্যাপারে কথা বলবে না। তার এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে কোন মাধ্যমও আড়াল থাকবে না। এ সময় মানুষ যার যার ডান দিকে তাকালে, নিজের আমল ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। আর বাম দিকে তাকালে কেবল তা-ই দেখতে পাবে, যা সে পূর্বে করে পরকালের জন্য পাঠিয়েছে। আর সম্মুখ দিকে তাকালে দেখতে পাবে জাহান্নাম। (অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন) অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। যদি এক টুকরা খেজুরও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পার, তা করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। —বোখারী, মুসলিম।

কারো প্রতিই অবিচার করা হবে না

যার যার পাপ-পূর্ণকে অতি সুক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হবে

হাশর ময়দানে বান্দার বিচার করণে কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হবে না। কোরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّامَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ *

"সেদিন (মহা বিচারের দিন) কোন মানুষের প্রতি জুলুম করা হবে না। তোমরা দুনিয়ায় যা কিছু করতে, কেবল মাত্র সেসব কর্মেরই প্রতিদান লাভ করবে।" —সূরা ইয়াসীন – ৪র্থ রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কোন ব্যক্তি অণু-পরমাণু পরিমাণ পুণ্যময় কাজ করলে তাকে তা মহা বিচারের দিন দেখান হবে। আর কেউ অণু-পরমাণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তা-ও তাকে দেখান হবে। —সূরা যিলযাল।

সূরা মুমিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আজকের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছু কামাই করেছে তার প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতিই আজ অবিচার করা হবে না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুবই দ্রুতগামী।" —সূরা মুমিন– ২য় রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "কেউ পার্থিব জীবনে অণু-পরমাণু পরিমাণে পুণ্যের কাজ করলে মহা বিচারের দিন সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণে খারাপ কাজ করলে তা-ও তাকে দেখান হবে।" —সূরা যিলযাল।

সূরা মুমিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আজকের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছু কামাই করেছে, তার প্রতিদান দেয়া হবে। কারো প্রতি আজ অবিচার করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী —সূরা মুমিন– ২য় রুকু।

বান্দার হক

হাশর ময়দানে আল্লাহ তাআ'লার হক যেমন– নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করা হবে। অনুরূপভাবে বান্দার হক সম্পর্কেও হিসাব নেয়া হবে। দুনিয়া কেউ কারো হক নষ্ট করলে বা আত্মসাত করলে অথবা কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচার করলে, তারও হিসাব ও বিচার হবে। বুজুর্গানেদ্বীন বলেছেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লার হক সম্পর্কে অপরাধী হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ততটা বিপদজনক নয়, যতটা বান্দার হক আত্মসাত করা এবং তার প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা বিপদজনক। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা হচ্ছেন মহান ও অভাবমুক্ত সত্তা। তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর হকের ব্যাপারে ক্ষমা লাভ করার আশা করা যায়। কিন্তু বান্দা হচ্ছে অভাবী ও প্রয়োজনশীল প্রাণী। তাদের এক একটি পুণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া ও মুক্তি লাভের আশা থাকবে। এ কারণে মহাবিচারের দিন বান্দার কাছ থেকে ক্ষমা লাভ এবং তার দাবী ছেড়ে দেয়ার আশা করা নিরর্থক। মহা বিচারের দিন টাকা-পয়সা, দিনার, ডলার, ধন-সম্পদ কিছুই কাছে আসবে না। সেদিন দাবী পরিশোধ করা হবে পুণ্যের আদান-প্রদান করে। আর দাবী আদায়ের ব্যবস্থা এত সুন্দর ও নিরঙ্কুশ হবে যে, পশুরাও যে, একে অন্যের প্রতি জোর-জুলুম করে, সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে।

পাপ পুণ্য দ্বারা লেন-দেন হওয়া

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি তার ভাইয়ের প্রতি জুলুম করে, তাকে অপমান করে বা তার হক নষ্ট কিম্বা নিজে আত্মসাত করে, তাহলে আজই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে সে দিনটি এসে পরার পূর্বেই

তার দায়মুক্ত হওয়া উচিত, যেদিন দিনার-দিরহাম টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ কিছুই থাকবে না। সেদিন কিছু পুণ্য থাকলে জুলুম পরিমাণ পুণ্য তার থেকে নিয়ে মজলুম বা পাওনাদার ব্যক্তিকে দান করা হবে। তার যদি কোন পুণ্য না থাকে, তাহলে মজলুম ব্যক্তির পাপ থেকে নিয়ে জালেম ব্যক্তির মাথায় চাপান হবে। —বোখারী, মেশকাত।

কেয়ামতের দিন সর্বাধিক নিঃস্ব ব্যক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান মোফলেস বা সর্বাধিক নিঃস্ব ব্যক্তি কে? সাহাবী (রাঃ)গণ বললেন, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব লোক বলে মনে করি, যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও ধন-সম্পদ থাকে না। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব ব্যক্তি হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের বিশাল পুণ্য ভাণ্ডার নিয়ে উপস্থিত হলেও সে হাশর ময়দানে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, হয় সে কাউকে গালি-গালাজ করেছে; কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বা কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ এবং ভক্ষণ করে, কাউকে মারপিটের মাধ্যমে তার রক্ত প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে চড়-থাপ্পর দিয়ে এসেছে। যেহেতু কেয়ামতের দিনটি হবে চূড়ান্ত ফয়সালা ও বিচারের দিন। তাই এ ব্যক্তির ফয়সালা এভাবে হবে যে, সে যাদের হক নষ্ট করেছে এবং নানাভাবে উৎপীড়ন করেছে, তাদের মধ্যে তার পুণ্য বণ্টন করে দেয়া হবে। তাদের দাবী পূরণ হওয়ার পূর্বেই যদি তার পুণ্যের ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়, তখন দাবীদার ও পাওনাদারদের পাপ এনে তার মাথায় চাপান হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা সমস্ত মানুষকে হাশর ময়দানে জমায়েত করবেন, যারা হবে উলংগ, খাৎনাহীন ও রিক্ত হস্ত। অতঃপর এমন জোরে ডাক দেয়া হবে, যে ডাক নিকটবর্তীরা যেমন শুনবে তেমনি দুরবর্তীরাও শুনবে। বলা হবে, আমি প্রতিদান দানকারী, আমি রাজাধিরাজ। কোন জান্নাতী ব্যক্তির কাছে কোন হক বা পাওনা থাকা অবস্থায় কোন জাহান্নামী জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পাওনা আদায় করে না দেব। এমনকি যদি একটি ঘুষিও কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে মেরে থাকে, তবে আমি তারও প্রতিশোধ আদায় করে দেব।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিশোধ কিভাবে দেয়া হবে? আমরা তো তখন উলংগ, খাতনাহীন ও খালি হাতে হব ? নবী করীম (সঃ) বললেন সেদিন পাপ ও পুণ্য দ্বারা লেন-দেন, দাবী আদায় ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। —আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, কেউ যদি তার গোলামকে একটি বেত্রাঘাতও করে, তাহলে মহাবিচারের দিন সে গোলামকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। —তাবারানী, বায্যার, আত্তারগীব অত্তারহীব।

পিতা-মাতাও তাদের দাবী ছাড়তে সম্মত হবে না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সন্তানের কাছে পিতা-মাতার যদি কোন ঋণ বা পাওনা থেকে থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন তারাও সন্তানের প্রতি বিরক্ত হয়ে বলবে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর। সন্তান তখন বলবে, আমি তো তোমারই সন্তান। একথায় পিতা-মাতার মনে কোন প্রভাব পড়বে না। তারা তাদের দাবী পূরণের জন্য তাকে বারবার তা'কিদ দিতে থাকবে। এমনকি তারা তখন এ আশা পোষণও করতে থাকবে যে, হায়! তার কাছে যদি আমাদের আরও ঋণ পাওনা থাকত।

—তাবারানী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

প্রথম বাদী-বিবাদী

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "মহাবিচারের দিন সর্বাগ্রে বাদী ও বিবাদী হবে দু'জন প্রতিবেশী।"

—আহমদ, মেশকাত।

জীব-জন্তুর বিচার ফয়সালা

হাশর ময়দানে সবারই হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং প্রত্যেক মজলুম ব্যক্তির ব্যাপারে ইনসাফ ও সুবিচার করা হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই দাবীদারদের দাবী পরিশোধ করতে হবে। এমনকি শিংহীন বকরী (যাকে শিং বিশিষ্ট বকরী আঘাত করেছিল) শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিনটির আগমন অবশ্যাম্ভাবী, সুতরাং যার ইচ্ছে হয়, সে যেন আপন প্রতিপালকের কাছে স্বীয় স্থান করে নেয়। আমি তোমাদেরকে এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন কৃতকর্ম দেখতে পাবে। সেদিন কাফের লোক বলবে, হায়! আমি যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। —সূরা আন্নাবা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে দুররে মানছুরে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন, হাশর ময়দানে সমস্ত প্রাণীকে একত্রিত করা হবে। চতুষ্পদ প্রাণী, ভূমিতে চলমান প্রাণী ও পাখীকুলসহ

সব কিছুকে উপস্থিত করা হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লার বিচারালয় থেকে যে রায় ঘোষণা হবে, তাতে এ ফয়সালাও থাকবে যে, শিংহীন পশুকে শিং বিশিষ্ট পশু থেকে প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এ সময় কাফেরের মুখ থেকে আফসোস ও অনুশোচনামূলক যে কথা বের হবে তা হল, হায়! আমি যদি অস্তিত্বহীন হয়ে মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। —তাফসীরে দূররে মানছুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১ পৃঃ।

বিশিষ্ট মুফাস্‌সির মুজাহিদ (র) বলেন, যে জীবকে ঠোকর মারা হয়েছে, তাকে ঠোকরদানকারী জীব হতে এবং যে প্রাণীকে লাথি মারা হয়েছে, সে প্রাণীকে লাথিদাতা প্রাণী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে দেয়া হবে। হাশর ময়দানে এসব ঘটনা মানুষের সামনেই সংঘটিত হবে এবং তারা তা অবলোকন করবে। অবশেষে জীব-জন্তুকে বলা হবে, তোমরা মাটিতে পরিণত হও। তোমাদের জন্য যেমন জান্নাত নেই, তেমনি জাহান্নামও নেই। এ সময় কাফেরগণ জীব-জন্তুর মুক্তি এবং চিরস্থায়ী শাস্তি হতে নাজাতের সাফল্য দেখে আশা পোষণ করে বলবে, হায়! আমরাও যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম।

—তাফসীরে দুররে মানছুর।

এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে কর্মের স্থান, চিন্তা-ভাবনার স্থান, সুখ দুঃখের স্থান। এখানে যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে, পরিশ্রম করবে এবং দুনিয়া লাভের চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকবে, নিঃসন্দেহে সে পরকালে খালি হাতে উঠবে। এ জগতে যে ব্যক্তি শুধু জীব-জন্তু থেকেই নয়, পুণ্যবান লোকদের থেকেও নিজকে উত্তম মনে করেছে এবং আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলের কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পরকাল সম্পর্কে চিন্তাহীন ও উদাসীন থেকেছে। পরকালে তার ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য। আল্লাহর পুণ্যবান বান্দারাই শুধু তার চেয়ে উত্তম হবেন না বরং পরিণামের দিক দিয়ে জীব-জন্তুরাও হবে তার চেয়ে উত্তম। এ সময় অত্যন্ত ভগ্নমনে নিরাশার সুরে তারা বলে উঠবে, হায়! আমিও যদি মাটিতে পরিণত হতে পারতাম। আমার যদি হিসাব-নিকাশ না হত। আমি যদি জাহান্নামে পতিত না হতাম। হায়! মাটি যদি ফেটে যেত এবং আমি চিরদিনের জন্য তাতে বিলীন হয়ে যেতে পারতাম। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ *

"যারা কুফরী এবং রাসূলের নাফরমানি করেছে, তারা আজ আশা করবে যে, হায়! আমি যদি মাটির সাথে মিশে যেতে পারতাম।"—সূরা নিসা- ৬ষ্ঠ রুকু।

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াকে পরকালের আমলের ক্ষেত্র রূপে মনে করে পরকালের জন্য চিন্তা-ভাবনা করেছে। সেখানকার সুখ-শান্তির জন্য আমল

করেছে। সেখানে তারা অবশ্যই সুখ ও শান্তিময় পরিবেশে অবস্থান করবে। দুনিয়ায় তারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে বলে হায়! আমি যদি মাটিতে পরিণত হতাম। হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষলতায় পরিণত হতাম। হায়! আমি যদি মাটির ঘাস হতাম। মোটকথা ঈমানদারগণ নিজদেরকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় হীন ও অধম মনে করে পরকালের সাফল্য লাভ করবে। আর ইসলাম অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানকারী কাফের মুশরেকগণ মহাবিচারের দিনে নিজদেরকে জীব-জন্তুর তুলনায় নিকৃষ্ট ও হীনতুচ্ছ ভাববে এবং তারা হবে চিরদুঃখী।

মনিব ও ভৃত্যদের মাঝে ন্যায় বিচার

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কয়েকজন ভৃত্য আছে যারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে। আর আমার কথাও তারা অমান্য করে। (এ হচ্ছে তাদের দিকের অপরাধ, আর আমার অপরাধ হল−) আমি তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং মারপিট করে শাস্তি দেই। এখন আপনি বলুন, পরকালে তাদের ও আমার অবস্থা কেমন হবে?

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেয়ামতের দিন, তোমার গোলামগণের বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা এবং মিথ্যা বলা এবং তুমি তাদের শাস্তি দেয়া সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। তোমার শাস্তি যদি তাদের অপরাধের সমপরিমাণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি সমান সমানই থাকবে, তাদের কাছ তুমি কিছু পাবে না আর তারাও তোমার উপর কোন বোঝা চাপাতে পারবে না। আর যদি তাদের অপরাধের তুলনায় তোমার দেয়া শাস্তি কম হয়, তাহলে তাদের অতিরিক্ত অপরাধ তোমার কাজে আসবে। তুমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়ে যায়, তাহলে যতটুকু শাস্তি বেশি হয়েছে, ততটুকু প্রতিশোধ তোমার থেকে নিয়ে তাদেরকে দেয়া হবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর মুখে একথা শুনে লোকটি কাঁদতে কাঁদতে ও চিৎকার করতে করতে সেখানে থেকে উঠে গেল। নবী করীম (সঃ) তাকে বললেন, তুমি কি কোরআন মজীদে উল্লিখিত আল্লাহ তাআ'লার এ বাণী পাঠ করনি? তিনি বলেছেন ঃ

"আমি কেয়ামতের দিন ইনসাফ ও সুবিচারের দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করব। সুতরাং কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। কেউ যদি সরিষার দানা পরিমাণও কোন কাজ করে থাকে, তবে আমি তা-ও উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট।" —সূরা আম্বিয়া– ৪র্থ রুকু।

একথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ গোলামদের ব্যাপারে আমি এটাই উত্তম মনে করছি যে, তাদেরকে আমি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেব। তাই আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, তারা সকলেই আজ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। —তিরমিযী, মেশকাত।

অপরাধ অস্বীকার করায় সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ঃ

মানুষ হচ্ছে ঝগরাটে স্বভাবের। মানুষের প্রতারণা, বক্রতা ও ঝগরাটে স্বভাব শুধু দুনিয়াতেই নয়; বরং কেয়ামতের দিনেও তার প্রদর্শনী হবে। মহাশক্তিমান আল্লাহ্ তাআ'লার সাথেও তারা বাদানুবাদ ও অপরাধ অস্বীকার করতে থাকবে। তখন সাক্ষী উপস্থিত করে তাদের আস্ফালন ও দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করা হবে। স্বয়ং মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তখন তাদের মাথাটি হবে অবনমিত। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ *

"আজকের দিনে আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। তখন তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।" —সূরা ইয়াসীন – ৪র্থ রুকু।

হযরত আনাস (রা) বলেন, কোন এক সময়ে আমি নবী করীম (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। হঠাৎ নবী করীম (সঃ) হেসে উঠলেন, আর আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা এবং বান্দার মধ্যে যে সওয়াল-জওয়াব হবে, সে দৃশ্য স্মরণ হলে আমার হাসি পায়। বান্দা বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে বাঁচাবার ঘোষণা দিয়ে আমাকে কি নিশ্চিন্ত করেননি। আল্লাহ্ তাআ'লা বললেন, হ্যাঁ, আমি এ অঙ্গীকার করেছি। তারপর বান্দা বলবে, আমি আমার ব্যাপারে কারো সাক্ষ্যই মানব না। তবে আমার দেহের মধ্য হতে যদি কেউ সাক্ষ্য দেয়, তবে আমি তা গ্রহণ করতে পারি। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, আজ তোমার ব্যাপারে তোমার নিজের এবং যারা কাজ সম্পাদন করেছে তাদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। নবী করীম (সঃ) বলেন, এরপর সে বান্দার মুখে মোহর লাগান হবে।

আর আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি নির্দেশ দেয়া হবে যে, তোমরা কথা বল। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কর্মের কথা প্রকাশ করে দেবে। এ অবস্থা দেখে বান্দা তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, তোমরা ভয় কর, ভয় কর। তোমাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষার জন্যই তো আমি এ বির্তক করছি। —মুসলিম, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, বান্দার রান, হাড় এবং মাংসও তার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। —তাফসীরে দুররে মানছুব।

ভূমির সাক্ষ্য ঃ

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (সেদিন ভূমি তাঁর অন্তর্নিহিত সংবাদ বর্ণনা করবে।) আয়াত পাঠ করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান ভূমির সংবাদ বর্ণনার অর্থ কি? উপস্থিত সাহাবা (রাঃ)গণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। নবী করীম (সঃ) বললেন, ভূমির সংবাদ বর্ণনার মর্ম হচ্ছে, ভূমি প্রত্যেক নারী পুরুষের বিরুদ্ধে তার সে কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে, যা তাঁর উপর অবস্থান করে করা হয়েছে। সে বলবে অমুক অমুক দিন সে অমুক অমুক কাজ করেছে। এটাই হচ্ছে ভূমির সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়।—তিরমিযী, আহমদ, মেশকাত।

আমলনামা উপস্থাপন

দুনিয়ার জীবনে কেরামুন কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত আছেন। মহাবিচারের দিনে তারা আমলনামার আকারে তা পেশ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মহাবিচারের দিন আপনি প্রত্যেক দলকে দেখবেন, তারা ভয়-ভীতিতে নতজানু হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার কাছে ডাকা হবে। আর তাদেরকে তখন বলা হবে, আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হবে। এ হচ্ছে আমার দফতর। এ দফতরই তোমাদের বিরুদ্ধে সঠিক ও সত্য বলে দেবে। তোমরা যা কিছু করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।" —সূরা জাছিয়া- ৪র্থ রুকু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি। মহা বিচারের দিনে আমি এমন এক দফতর প্রকাশ করব, যা খোলা অবস্থায় দেখা যাবে। আর বলা হবে, তুমি তোমার দফতর পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে হিসাব গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।" —সূরা বনী ইস্রাঈল- ২য় রুকু।

আমলনামা দেখে অপরাধীরা ভীত হয়ে অনুশোচনা করবে

মানুষের সমস্ত কর্ম আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে। আমলনামার মাঝে খারাপ কর্ম অবলোকন করে পাপীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু করেছে, তা সবই তাতে লিপিবদ্ধ আকারে দেখতে পাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"মহাবিচারের দিন যখন আমলনামা উপস্থাপন করা হবে, তখন অপরাধীগণ তাতে লিপিবদ্ধ বিষয় দেখে ভীত হয়ে পড়বে। আর বলবে হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য। এ আমলনামা খুবই বিস্ময়মকর। কোনরূপ অবিচার না করে ছোট-বড় কোন গুনাহ্ই বাদ রাখা হয়নি। তারা যা কিছু করেছে, তা সবই তাতে সন্নিবেশিত পাবে। আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করবেন না।" —সূরা কাহাফ– ৬ষ্ঠ রুকু।

আমলনামা বণ্টন

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলনামা প্রদান করা হবে। যারা পুণ্যবান এবং নাজাত লাভ করবে, তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। আর যারা কাফের ও ফাসেক এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের পেছন দিক থেকে বাম হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে মানব মণ্ডলী! স্বীয় প্রতিপালকের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত স্বীয় আমলের যত্নবান হও। অতঃপর তোমরা সে কর্মের প্রতিদান লাভ করবে। সুতরাং যাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাদের হিসাব হবে অতিসত্বর সহজ হিসাব। আর হিসাবান্তে তারা নিজেদের পরিজনদের কাছে আনন্দিত মনে ফিরে আসবে। আর যাদেরকে পিঠের পেছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। আর তারা পৌঁছবে জলন্ত অণলকুণ্ডে। (দুনিয়ায়) তারা পরকাল সম্পর্কে উদাসিন হয়ে পরিবার পরিজনের সাথে খুব আনন্দমুখর অবস্থায় জীবন যাপন করত। আর মনে করত, তাদেরকে কখনোই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। কিন্তু কেন ফিরে যাবেন? নিশ্চয় তার প্রতিপালক তো তাকে ভালভাবেই অবলোকন করছেন।" —সূরা ইনশিকাক।

পার্থিব জগতে যারা খুব আনন্দমুখর জীবন যাপন করে এবং দুনিয়াকেই আসল জীবন মনে করে তাতে নিমগ্ন হয়ে থাকে, পরকালের কথা কিছু মাত্রও চিন্তা করে না এবং পরকালের বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। কেয়ামতের দিন তারা কঠিন বিপদে নিপতিত হয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ায় অবস্থান করে পরকালের কথা চিন্তা করে এবং মরণের পরের অবস্থা সম্পর্কে, চিন্তা ভাবনা করে তারা মহাবিচারের দিন ডান হাতে আমলনামা পেয়ে

খুব খুশী ও আনন্দিত হবে। এ পার্থিব জীবনে কুকর্মকারীগণ এখানে খুবই আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে থাকে, আর পুণ্যবানগণ আনন্দময় পরিবেশে থাকবেন পরকালের জীবনে।

আমলনামা পাওয়ার পর পুণ্যবানদের খুশী এবং পাপীদের হতাশ হওয়া

পরকালে মুমিন ও পুণ্যবানগণ আমলনামা ডান হাতে পেয়ে অধিক খুশী হবেন এবং কাফের-ফাসেক ও পাপীগণ বাম হাতে আমলনামা পেয়ে হবে অধিক দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্মাহত। এ বিষয়ে কোরআন মজীদে আরও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ *

"সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআ'লার আদালতে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপন তথ্যই সেদিন আর গোপন থাকবে না।" —সূরা আল হাক্কা।

এরপর-ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "অতএব যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা আনন্দে বলে উঠবে, আমার আমলনামা পাঠ কর। আমার তো বিশ্বাস ও ধারণা এটাই ছিল যে, অবশ্যই আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তারা জান্নাতে খুবই সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে থাকবে, যার ফলমূলসমূহ হবে ঝুকানো ও নিকটবর্তী। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পানাহার কর। এটা সেই পুণ্যময় কর্মের প্রতিদান, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে ভবিষ্যতের জন্য পাঠিয়েছিলে।
—সূরা আল হাক্কাহ– ১ম রুকু।

ডান হাতে আমলনামা পাওয়া মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হওয়ার নির্দশন। এমন লোকেরা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সকলকে আমলনামা দেখিয়ে বলবে, ধর, আমার আমলনামা নিয়ে পাঠ কর। আমি দুনিয়ার জীবনে মনে করেছিলাম যে, পরকালে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। আর এ কারণে আমি ভীত থাকতাম এবং খুব চিন্তা করতাম। তাই আজ আমি তার সুখময় পরিণতি অবলোকন করছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা আমলনামা বাম হাতে আমলনামা' প্রাপ্তদের মর্মান্তিক অবস্থার কথা তুলে ধরে বলেন ঃ "আর যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আমলনামা না পেতাম! আমার কি হিসাব হবে তা যদি আদৌ আমি না জানতাম (তাহলে কতই না ভাল হত।) হায়! মৃত্যুই যদি আমার চির সমাপ্তি হত, (আমাকে যদি দ্বিতীয়বার জীবিত না করা হত।) আমার ধনসম্পদ আমার কোন কাজে আসল নাম। আমার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শাসন ধ্বংস হয়ে গেল।' —সূরা হাক্কা– ১ম রুকু।

সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠ লোকদেরকে পিছন দিক দিয়ে আমল নামা দেয়া হবে। আর সূরা আল হাক্কাতে বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠ লোকদেরকে বাম হাতে আমল নামা দেয়া হবে। উভয় আয়াতের মর্ম একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, যাদেরকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাদেরকে তা পেছন দিক হতে দেয়া হবে। মনে হয় ফেরেশতাগণ যেন তাদের চেহারা দেখতে ইচ্ছুক নয়। সম্ভবত তাদের ডান বাহু বাধা থাকবে। এ কারণে পেছনের দিক দিয়ে বাম হাতে আমল নামা দেয়া হবে।

আমলসমূহের ওজন

আল্লাহ্ তাআ'লা সৃষ্টিকুলের কাজ-কর্ম ও আমল সম্পর্কে সর্বদাই জ্ঞাত আছেন। মহাবিচারের দিন যদি নিজের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মের দান প্রতিদান দেন, তাহলে তা দেয়ারও অধিকার তাঁর রয়েছে। কিন্তু মহাবিচারের দিন হাশর ময়দানে তা করা হবে না, বরং মানুষের সামনেই তাদের আমলনামা পেশ করা হবে এবং তা ওজন করা হবে। আমলের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য সাক্ষী থাকবে। অপরাধীরা তাদের খারাপ আমলকে অস্বীকার করবে এবং দলিল প্রমাণ ও সাক্ষ্য দ্বারা তার অপরাধ প্রমাণ করা হবে যাতে শাস্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা একথা বলতে না পারে যে, আমাদের প্রতি জুলুম করে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

আমল ওজন করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "সেদিন পরিমাপ যন্ত্র স্থাপিত হওয়ার বিষয়টি সত্য ও সঠিক। সুতরাং যাদের আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা হবে সাফল্যমণ্ডিত। আর যাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারা হল সেসব লোক যারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছে এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।" —সূরা আরাফ- ১ম রুকু।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হাশরের দিন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। আর সে পাল্লা এত বিরাট বিশাল হবে যে, তাতে যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে ওজন করা হয়, তবুও তাতে স্থান সঙ্কুলান হবে। এ দাঁড়িপাল্লা দেখে ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, এ পাল্লায় কাকে পরিমাপ করা হবে? আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, আমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার হিসাবের জন্য এ দাঁড়িপাল্লায় আমল ওজন করব। একথা শুনে ফেরেশতাগণ বলবেন, হে আমাদের প্রভু! আপনার এবাদত যেরূপ করা উচিত ছিল আমরা তা অনুরূপভাবে এবাদত করতে পারিনি। —হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন দাড়িপাল্লার জন্য একজন ফেরেশতাকে নিয়োজিত করা হবে। (সে আমল ওজন

করবে।) মানুষকে এ পরিমাপ যন্ত্রের কাছে উপস্থিত করা হবে। যারাই আসবে তাদেরকেই উভয় পাল্লার মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান করান হবে। তার নেকের পাল্লা যদি ভারী হয়, তাহলে ফেরেশতা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য সৌভাগ্যবান হয়েছে, সে কখনো হতভাগা হবে না। আর এ ঘোষণা সমস্ত মাখলুকই শুনতে পাবে। আর যদি তার নেকের পাল্লা হালকা হয়, তাহলে ঐ ফেরেশতা এমন উচ্চকণ্ঠে যা সমস্ত মাখলুক শুনতে পায় ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য ব্যর্থ ও বিফল হয়েছে। সে আর কখনো সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। —বায়হাকী, বায্যার, আর তারগীব অত্তারহীব।

বিশিষ্ট মুফাস্সির শাহ আবদুল কাদির (রঃ) মাউজুহুল কোরআন গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আমল ওজন অনুযায়ী লেখা হয়। একই কাজ যদি এখলাস ও মহব্বতের সাথে শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথভাবে করা হয়; তাহলে তার ওজন বৃদ্ধি পায়। আর উক্ত আমলই যদি মানুষকে দেখাবার জন্য এবং শরীয়ত অনুযায়ী যথাযথভাবে না করা হয়, তবে তা ওজনে হালকা হয়ে যাবে। পরকালে যার পুণ্য কাজের পাল্লা ভারী হবে, তার খারাপ আমল ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যার নেক আমল হালকা হবে, তাকে পাকড়াও করা হবে।

কোন কোন আলেম বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষের আমলকে কায়া বা দেহে রূপদান করে উপস্থিত করা হবে। আর আমলনামার উক্ত দেহের রূপকেই পরিমাপ করা হবে। আর সেই দেহ ভারী বা হালকা হওয়ার ভিত্তিতেই বিচার ফয়সালা করা হবে। কাগুজে আমলনামা বা দেহ বিশিষ্ট আমল ওজন হওয়া অবাস্তব কথা নয়। আর আমলকে ওজন করা ছাড়াই পরিমাপ করাও আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ নয়। বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। দৈনন্দিন নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়ে চলেছে। সুতরাং পরকালে আমল পরিমাপ হওয়ার ব্যাপারটি একটি বোধগম্য ব্যাপার। এ অধম বান্দাকে আল্লাহ তাআ'লা যতটুকু বোধ জ্ঞান দান করেছেন, তাতে আমল পরিমাপ হওয়ার বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান যুগে থার্মোমিটার যন্ত্র দ্বারা দেহের তাপমাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এমনিভাবে অনেক যন্ত্র রয়েছে যা দেহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসের মাত্রা ও পরিমাণ অবগত হওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষে আমল ওজন করা তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যাপার, তা কিভাবে মানা যায়। কারো মনে যদি এ সন্দেহ হয় যে, আমল বা কর্মের তো কোন অনুভূতিশীল অস্তিত্ব নেই। কর্ম বা আমল বাস্তবায়ন হওয়ার সাথে সাথেই তার রূপটিও বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং পরকালে সে আমল একত্রিত করা এবং পরিমাপ করা কথাটির কি অর্থ হতে পারে?

এ সন্দেহ অবসানের জন্য আমরা বলতে চাই যে, মানুষের বক্তৃতা-বিবৃতি ও কথাকে রেকর্ড করে তা রেডিও-টেলিভিশন থেকে প্রচার করা হয়। অথচ মানুষ যখন গৃহে অবস্থান করে বক্তৃতা করে, তখন সে এক সাথেই সব কিছু বলে না, বরং তাকে এক একটি অক্ষর উচ্চারণ করতে হয়। একটি অক্ষর উচ্চারণে শেষ হওয়ার পরই অন্য অক্ষরটি উচ্চারণ করে। এতটা করা সত্ত্বেও তার সমস্ত কথা ও বক্তৃতা রেকর্ড হয়ে যায়। বর্তমানে আপনারা টেলিভিশনে মানুষের বহু চালচলন ও অভিনয় দেখছেন, যা পূর্বেই রেকর্ড করা হয়েছে। মানুষকে যখন আল্লাহ্ তাআ'লা অক্ষরসমূহ, বাক্য, চালচলন অভিনয়কে ধরে রেখে তা একত্রিতকরণ ও রেকর্ড করার ক্ষমতা দান করেছেন, তা হলে বুঝা যায় তিনি নিজেও তা করার ক্ষমতা রাখেন। স্বীয় মাখলুকের আমল ও কার্যাবলী এমন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখেন, যাতে এক বিন্দুও অরক্ষিত থাকবে না। আর তাকে বাস্তবরূপে কেয়ামতের দিন ওজন করে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

لِيَجْزِ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

"আর এরূপ করেই তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের চুলচেরা বিচার করে যথাযথ প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তাআ'লা হিসাব গ্রহণে খুবই দ্রুত।"

জনৈক বান্দার আমলের পরিমাপ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন আল্লাহ্ তাআ'লা সমস্ত মাখলুকের সম্মুখে আমার এক উম্মতকে সমবেত গণজমায়েত হতে আলাদা করে তার সামনে নিরানব্বইটি দফতর খুলে ধরবেন। প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। এ দফতরগুলোতে তার সমস্ত গুনাহ্ লিপিবদ্ধ থাকবে। এরপর আল্লাহ্ তাআ'লা তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব আমলনামার কোনটিকে অস্বীকার কর? আমার নিয়োজিত লেখক ফেরেশতা কি তোমার প্রতি কোনরূপ অবিচার করেছে? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এসবের কোন কিছুই অস্বীকার করছি না এবং অবিচার করারও অভিযোগ তুলছি না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এসব খারাপ আমল সম্পর্কে কোন ওযর আপত্তি আছে কি ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার কোনই ওযর আপত্তি নেই।

অতঃপর আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, তবে তোমার একটি নেক আমল আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। অনন্তর একটি চিরকুট বের করা হবে যাতে লেখা থাকবে ঃ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ আর তাকে বলা হবে, তুমি তোমার আমল ওজন হওয়া প্রত্যক্ষ কর। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক!

আমার আমল ওজন করা না করা উভয়ই সমান, আমার ধ্বংস হওয়া তো অনিবার্য। কেননা বিরাটকায় নিরানব্বইটি দফতরের তুলনায় এ চিরকুটের অস্তিত্ব তো মূল্যহীন। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে জেনে রেখ যে, তোমার প্রতি আজ বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না। (তোমার এ আমলনামা অবশ্যই ওজন করতে হবে।) সুতরাং নিরানব্বইটি দফতর মিযানের এক পাল্লায় আর চিরকুটখানা অন্য পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। ফলে ঐ দফতরগুলোর ওজন হবে হালকা এবং চিরকুটের ওজন হবে সে তুলনায় অনেক ভারী। এরপর নবী করীম (সঃ) বললেন, আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআ'লার নামের বর্তমানে তার তুলনায় কোন বস্তুই ওজনে ভারী হতে পারে না।
—তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

এটা এখলাস ও বিনয়সহকারে এবং আল্লাহ্ তাআ'লার প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত পোষণ করে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার ফলেই এত ভারী হয়েছে। আল্লাহ্ তাআ'লার নাম উচ্চারণ করা তখনই পুণ্যে পরিণত হয়, যখন তা একনিষ্ঠ মনে পাঠ করা হয়। কাফেরগণের মুখেও কোন কোন সময় কলেমায় শাহাদাত ও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু তারা শুধু মুখেই তা উচ্চারণ করে, অন্তরের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। এ কারণে এ পাঠের দ্বারা পরকালে সে নাজাত পাবে না। ঈমানে তখনই প্রাণ সৃষ্টি হয় এবং ওজনে ভারী হয়, যখন তা এখলাস এবং আল্লাহর মহব্বতের সাথে আন্তরিকভাবে পোষণ করা হয়।

সর্বাধিক ওজনশীল আমল

হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন মু'মিন ব্যক্তির দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ওজনশীল যে বস্তু রাখা হবে, তা হচ্ছে তার সচ্চরিত্র। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআ'লা অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতি অবশ্যই ঘৃণা পোষণ করেন। —তিরমিযী; মেশকাত।

কাফেরদের পুণ্য হবে ওজনহীন

কাফের মুশরেকগণও মানবতার সেবায় অনেক ভাল ভাল কাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে। কিন্তু তাদের সে কাজ হবে নিষ্ফল। মহাবিচারের দিন তাদের সে পুণ্যময় কাজগুলোর কোন ওজন থাকবে না এবং তা মিযানে ওজনও করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"হে নবী! আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সে লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব, যারা হবে আমাদের দিক দিয়ে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত? তারা হচ্ছে সে সব লোক যাদের আমল দুনিয়ার জীবনেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে

করে যে, তারা খুব পুণ্যময় কাজ করেছে। আর এসব লোকই তাদের প্রতিপালকের আয়াতকে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে থাকে। ফলে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য মিযান কায়েম করব না। অর্থাৎ তাদের আমল মিযানে পরিমাপ করব না।' —সূরা কাহাফ- শেষ রুকু।

এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে, মূলত তারাই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যারা পার্থিব জগতের দীর্ঘ জীবনে অনেক পরিশ্রম করে পুণ্যময় কাজ করে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করে। আর নিজেরা মনে করে যে, আমাদের জীবন খুব সাফল্যময় হয়েছে। আমরা সাফল্যের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছি। লাখপতি থেকে কোটিপতি হয়েছি। কাল পৌরসভার কমিশনার ছিলাম, এবার জাতীয় সংসদের মেম্বার হয়েছি।

মোটকথা তারা এহেন প্রতারণার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে, আল্লাহ তাআ'লা দ্বীন-ইসলামকে তারা স্বীকার করেনি এবং তাঁর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করেছে। মহাবিচারের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথাকে মিথ্যা মনে করেছে। মৃত্যুর পর কি ঘটবে সে সম্পর্কেও তারা কখনো চিন্তা ভাবনা করেনি। পার্থিব উন্নতি ও সাফল্যকেই তারা কামিয়াবী মনে করেছে। কেয়ামতের দিন যখন তারা হাশর ময়দানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের আমলনামায় দেখতে পাবে কুফরীর তালিকা ও তাদের কৃতকর্মসমূহ। সে আমলের কোন ওজনই থাকবে না। পরিণতিতে তাদের জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করতে হবে। তখনই তাদের জ্ঞানচক্ষুতে ধরা পরবে যে, তাদের সাফল্য কোথায় ছিল।

ইহুদী, খ্রিস্টান ও কাফের মুশরেকগণ দুনিয়ার জীবনে নিজ নিজ খেয়াল খুশিমত অনেক ভাল ভাল কাজ করে। যেমন পানি পানের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করে, অভাবী লোকদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। অথবা আল্লাহ তাআ'লা নামসমূহ নিয়মিতভাবে স্মরণ করে। এ ধরনের কোন কাজ দ্বারাই তারা পরকালে নাজাত পাবে না। সাধু-সন্ন্যাসীগণ যে বিরাট বিরাট কাজ ও সাধনায় নিমগ্ন হয়ে নিজের দেহকে কষ্ট দেয় এবং প্রবৃত্তিকে বৈধ চাহিদা হতে বিমুখ রেখে নিজের প্রতি জুলুম করে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতা পাদ্রীরা পুণ্যলাভের আশায় বিবাহ থেকে বিরত থাকে। এদের সর্বপ্রকার কাজ-কর্মই অর্থহীন ও পুণ্যহীন কাজ। পরকালে এসব কাজ দ্বারা কোন ফলোদয় হবে না। কুফরীর কারণে পরকালে এ কাজের কোন ফল তারা লাভ করতে পারবে না। কাফেরদের পুণ্যময় কাজগুলো হবে প্রাণহীন। মহাবিচারের দিন তাদের হাত হবে পুণ্যশূন্য। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা নিজদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী করে, তাদের কর্মের উদাহরণ হল বালুরাশি, যাতে প্রচণ্ড ঘূর্ণি বায়ুর দিন তাকে নিমেষে দূর-দূরান্তে উড়িয়ে

নেয়। (এমতাবস্থায় যে, বালুরাশির কোন চিহ্নই থাকে না।) এমনিভাবে তারা যা কিছু কামাই করেছে, তার উপর তাদের কোন ক্ষমতাই থাকবে না। আর এটা হচ্ছে তাদের সুদূরপ্রসারী বিভ্রান্তি।" —সূরা ইবরাহীম- ৩য় রুকু।

মোটকথা তারা ধারণা করবে যে, আমাদের কর্ম দ্বারা ফায়দা পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রয়োজন মুহূর্তে তারা তা দ্বারা কোন উপকারই লাভ করবে না।

তাফসীরে 'মাযহারীর' লেখক * فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا "সুতরাং হাশরের দিন আমি তাদের জন্য মিযান স্থাপন করব না।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন, "আল্লাহ তাআ'লার কাছে কাফেরদের আমলের কোন গুরুত্ব ও মূল্য থাকবে না।" হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু কিছু খুব মোটা-তাজা দেহ ও মর্যাদাবান লোক আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, যাদের ওজন ও মর্যাদা আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে মশা-মাছির ওজনের সমানও হবে না। আমার একথার প্রমাণে তোমরা ইচ্ছে করলে কোরআন মজীদের فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا এ আয়াতটি পাঠ করতে পার।"

উক্ত তাফসিরকারক এ আয়াতের আর এক ব্যাখ্যায় লেখেছেন, অথবা এর অর্থ হচ্ছে– মহা বিচারের দিন কাফেরদের জন্য মিযান স্থাপন করা এবং তাদের ক্ষেত্রে পরিমাপ করার ব্যাপারটিও সংঘটিত হবে না। কেননা সেখানে তাদের পুণ্যময় কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব তাদেরকে সরাসরি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি উপরোক্ত আয়াতের তৃতীয় মর্মার্থ বর্ণনায় লেখেছেন, অথবা এর মর্ম হচ্ছে কাফেরগণ তাদের যেসব কাজকে পুণ্যময় কাজ মনে করে থাকে, মহাবিচারের দিন মিযানের পরিমাপে তার কোন ওজন পাওয়া যাবে না। কেননা সেখানে দুনিয়ার সেসব কাজই ওজনশীল হবে, যা ঈমানের ভিত্তিতে এখলাসের সাথে করা হয়েছিল। এ বক্তব্যের পর আল্লামা সুয়ুতী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, শুধু মাত্র ঈমানদারগণের আমলই ওজন করা হবে না বরং কাফেরদের আমলও পরিমাণ করা হবে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। একদল ওলামাদের মতে, মহাবিচারের দিন শুধু ঈমানদারগণের আমলই পরিমাপ করা হবে। কেননা কাফেরদের পুণ্যময় কর্মসমূহ সেখানে বিনষ্ট হবে। সুতরাং পুণ্যের পাল্লায় যখন ওজন করার মত কিছুই পাওয়া যাবে না তখন এক পাল্লা ওজন করা অর্থহীন। এ মতের প্রবক্তাগণ উপরোক্ত আয়াতকেই দলিলরূপে পেশ করেন। দ্বিতীয় একদল ওলামার মতে কাফেরদের আমলও পরিমাপ করা হবে, কিন্তু তাতে কোন ওজন পাওয়া যাবে না। তারা কোরআন মজীদের এ আয়াতকে দলিলরূপে ব্যবহার করেন। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ *

"যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হচ্ছে সে লোক যারা নিজদেরকে মহা ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তারা সর্বদা জাহান্নামেই অবস্থান করবে।"

—সূরা মুমেনুন –৬ রুকু।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াতে করীমায় যাদের পাল্লা হালকা হবে, তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। এর দ্বারা জানা যায় যে, কাফেরদের আমলও পরিমাপ করা হবে। কেননা কোন মুমিন যে, চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না, সে ব্যাপারে সকলেই একমত।

এরপর তাফসীরে মাযহারীর লেখক আল্লামা কুরতুবীর অভিমত উল্লেখ করে লেখেছেন, সব মানুষের আমলই পরিমাপ করা হবে না। যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা মহাবিচারের দিন বিনা হিসাবে যাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে, তাদের আমল পরিমাপ করা হবে না। এছাড়া অন্যান্য মুমিন ও কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে।

অতঃপর তাফসীরে মাযহারীর লেখক বলেছেন, আল্লামা কুরতুবীর অভিমতে উভয় দলের অভিমত এবং সূরা কাহাফ ও সূরা মু'মিনুনের আয়াতদ্বয়ের মর্মএকত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত স্বীয় তাফসীর বয়ানুল কোরআনে সূরা আরাফের শুরুতে এক ভূমিকার পর বলেছেন, মিযানে ঈমান ও কুফর উভয়কেই ওজন করা হবে। এ পরিমাপে এক পাল্লা খালি থাকবে, আর অপর পাল্লায় মুমিন হলে তার ঈমানকে এবং কাফের হলে তার কুফরীকে রাখা হবে। আর এ পরিমাপ দ্বারা মুমিন ও কাফের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাস মুমিন লোকের জন্য এক পাল্লায় তাদের পুণ্যসমূহ এবং অপর পাল্লায় তাদের গুনাহসমূহ রেখে ওজন করা হবে। যেমন তাফসীরে দুররে মানছুরে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহাবিচারের দিন মিযানে মুমিন ব্যক্তির পুণ্যের পাল্লা ভারি হলে তারা জান্নাত লাভ করবে। আর গুনাহের পাল্লা ভারি হলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর উভয় পাল্লা সমান হলে তারা আরাফে অবস্থান করবে। অতঃপর হয় শাস্তির পূর্বে শাফাআতের বদৌলতে অথবা শাস্তি ভোগের পর ক্ষমা লাভের ফলে জাহান্নামী মুমিন বান্দারা এবং আরাফে অবস্থানকারী বান্দারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর করুণায় ক্ষমা লাভ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা দয়া ও করুণা ছাড়া কোন ব্যক্তি কক্ষনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও করুণা ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না? জবাবে নবী করীম (সঃ) স্বীয় হাত মাথায় রেখে বললেন, না, আমিও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তবে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর করুণা ও রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করে রাখবেন। —আহমদ, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

এ হাদীসে প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তিকে বিশেষ করে যেসব আবেদ দরবেশ জাকের ও মুজাহিদ ব্যক্তিগণ সর্বদা পুণ্যময় কাজে মশগুল থাকেন, তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজদের পুণ্যময় কর্মের জন্য উল্লসিত না হয়, তারা যেন একথা না ভাবে যে, অবশ্য অবশ্যই আমরা জান্নাতের হকদার। বরং নিজের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে এবং মনে মনে এ ভয় পোষণ করবে যে, হয়তো আমার আমল কবুল না-ও হতে পারে।

মহা শক্তিমান আল্লাহ তাআ'লা যদি আমল কবুল না করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কারোর কিছু করার ক্ষমতা আছে কি ? যারা পুণ্যময় কাজ করে, তাদের সে কাজ কবুল করে প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার দয়া ও অনুগ্রহ। সারা জীবনের আমল দ্বারা তার কিঞ্চিৎকর নেয়ামতের তুলনা করা যায় না। যেমন- নেয়ামতসমূহের জিজ্ঞাসাবাদের আলোচনায় উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন লোকেই আল্লাহ তাআ'লার রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একথা শুনে সাহাবীগণ ভাবলেন, নবী করীম (সঃ) তো আল্লাহ তাআ'লার হুকুম পুরোপুরিভাবে আমল করেন। তিনি এবাদত বন্দেগী ও তাবলীগের জন্য কঠিন হতে কঠিনতর পরিশ্রম করেন। তার কোন আমলেই কিঞ্চিৎমাত্র খুঁত নেই। সুতরাং তিনি আমলের বলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন কি না তারা সে ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি আল্লাহ তাআ'লার রহমতের মুখাপেক্ষী, তার রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না।

আর কেনই বা তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হবেন না, তিনিও তো আল্লাহ পাকের একজন বান্দা। সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহ বর্ষণ করুন, যারা নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে অনাগত ভবিষ্যতের লোকদের জন্য আল্লাহর দ্বীন ভালভাবে বুঝবার ও উপলব্ধি করার পথ রচনা করে দিয়েছেন। আর পরবর্তী কালের লোকদের জন্য হাদীস বর্ণনা করে তাদেরকে

সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, যারা নবী করীম (সঃ)-কে আল্লাহ্ তাআ'লার ক্ষমতা দান করে বলে থাকে, যা অর্জনের তা মুহাম্মদ (সঃ) থেকেই নেব, তাদের এ হাদীসের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করা উচিত।

মহাবিচারের দিন প্রত্যেকেই অনুতপ্ত হবে

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবী উমাইয়াহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার বন্দেগীতে সেজদাবনত হয়ে পড়ে থাকে, তবু সে তার এত বিপুল পরিমাণ আমলকে কেয়ামতের দিন অতি তুচ্ছ মনে করবে। আর সে তখন এ আশা পোষণ করতে থাকবে যে, হায়! আমাকে যদি দুনিয়ায় ফেরত পাঠান হত, তাহলে আমি বেশি বেশি আমল করে বিপুল পরিমাণে পুণ্যলাভ করতে পারতাম।

—আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারই মৃত্যু ঘটে, সে-ই নিজে নিজে লজ্জিত হয়। সাহাবী (রাঃ)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি কারণে সে লজ্জিত হয় ? নবী করীম (সঃ) বললেন, সে ব্যক্তি যদি ভাল কাজ করে থাকে, তাহলে এই ভেবে লজ্জিত হবে যে, আমি কেন আরও ভাল কাজ করলাম না! আর যদি সে খারাপ কাজ করে থাকে তখন সে এ অনুশোচনা করে লজ্জিত হবে যে, হায়! আমি কেন খারাপ কাজ থেকে নিজকে রক্ষা করলাম না! —তিরমিযী, মেশকাত।

শাফাআ'তের বিবরণ

মহাবিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লা নবী, রাসূল, শহীদ ও হক্কানী ওলামাগণকে শাফাআ'ত করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং তাদের শাফাআ'ত কবুল করবেন। ফলে অনেক গুনাহগার ঈমানদার লোক তাদের শাফাআ'ত দ্বারা উপকৃত হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন তিন শ্রেণীর লোকেরা শাফাআ'ত করার অনুমতি লাভ করবেন। তারা হলেন– (১) নবী রাসূলগণ (২) হক্কানী ওলামায়ে কেরাম (৩) এবং শহীদগণ। —ইবনে মাজা, মেশকাত।

শাফাআতের অনুমতি প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ *

"এমন কে আছে যে, আল্লাহ তাআ'লার অনুমতি ছাড়া, তাঁর কাছে শাফাআ'ত করতে পারে?"

সূরা তাহাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا *

"সেদিন কারো সুপারিশ দ্বারা কারো কোন উপকার হবে না, কিন্তু দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন (তার শাফাআ'ত দ্বারাই উপকার হবে)। —সূরা তাহা- ৬ রুকু।

মোট কথা, মহা বিচারের দিন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে যাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে, তিনিই শাফাআ'ত করতে পারবেন। আর যার জন্য শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে, কেবল তার ক্ষেত্রেই শাফাআ'তকারী শাফাআ'ত করার জন্য সাহসী হবেন। কাফের মুশরেকদের ব্যাপারে শাফাআ'ত করার অনুমতি দেয়া হবে না। আর সেদিন তাদের কোন বন্ধু বা সুপারিশকারীও পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ *

"জালেম (কাফের মুশরেক) লোকদের সেদিন কোন বন্ধু-বান্ধব থাকবে না এবং এমন কোন সুপারিশকারীও হবে না যার কথা মানা যায়।

—সূরা মুমিন- ২য় রুকু।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র) তদ্বীয় মেরকাত শরহে মেশকাত গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেয়ামতের দিন পাঁচবারে শাফাআ'ত হবে। সর্বাগ্রে শাফাআ'ত হবে হাশর ময়দানে জমায়েত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য। তখন সমস্ত নবী রাসূলগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে শাফাআ'ত করতে অস্বীকার করবেন। তখন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আগের পরের সমস্ত মুসলমান ও কাফেরদের হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে সুপারিশ করবেন।

দ্বিতীয় বার শাফাআ'ত হবে অগণিত মুমিন বান্দাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য। এ শাফাআ'তও করবেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)।

তৃতীয় বার শাফাআ'ত হবে সেসব ঈমানদারদের জন্য, যারা নিজেদের খারাপ আমলের কারণে জাহান্নামে যাওয়ার পাত্র হবে। এ শাফাআ'তও করবেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং অন্যান্য ওলামা ও শহীদগণ।

চতুর্থবার শাফাআ'ত হবে সেসব গুনাহগার ঈমানদারদের জন্য, যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। তাদের জাহান্নাম হতে বের করার জন্য নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতা, ওলামা ও শহীদগণ শাফাআ'ত করবেন।

আর পঞ্চমবার শাফাআ'ত হবে, জান্নাতী লোকদের মরতবা বৃদ্ধির জন্য।

—শরহে মুসলিম, নববী।

হযরত আউফ ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন দূত এসে আমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতের অর্ধেক উম্মতকে (বিনা হিসাব ও শাস্তিতে) জান্নাতে প্রবেশ করাবার এখতিয়ার আমাকে দেয়া হয়েছে। অথবা আমার উম্মতের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে হয় তার জন্য শাফাআ'ত করার এখতিয়ারকে আমি গ্রহণ করেছি। আমার শাফাআ'ত হবে সেসব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক করেনি। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

যেহেতু নবী করীম (সঃ) প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে শাফাআ'ত করার মধ্যেই উম্মতের জন্য বেশি ফায়দা লক্ষ্য করেছেন, তাই তিনি শাফাআতের এখতিয়ারকেই গ্রহণ করেছেন। —আততারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে তাঁর একটি দাবী গ্রহণ করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক নবী দুনিয়াতেই সে দাবীর জন্য দোয়া করে তা কবুল করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি সে দাবী দুনিয়ায় দোয়া করেই শেষ করিনি, বরং সে দোয়াকে আমি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত গোপন করে রেখেছি। আর সেদিন আমি সে দোয়া উম্মতের শাফাআতের কাজে ব্যবহার করব। সুতরাং আমার শাফাআ'ত অবশ্যই আমার সেসব উম্মতের জন্য হবে, যাদের মৃত্যু হয়েছে আল্লাহ তাআ'লার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায়। —মুসলিম।

এ হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআ'লা পক্ষ থেকে বিশেষভাবে একটি এখতিয়ার দান করা হয়েছে। তা হচ্ছে তাঁরা বিশেষ কোন ব্যাপারে দোয়া করলে আল্লাহ তাআ'লা তাঁদের দোয়া কবুল করবেন– সে দোয়া যে জন্যই হোক না কেন। নবী-রাসূলগণের এমন মর্যাদা আল্লাহ তাআ'লা দান করেছেন যে, তাঁদের যেকোন দোয়াই কবুল হয়। তারপরও তাঁদের বিশেষ মর্যাদার জন্য আলাহ তাআ'লা প্রত্যেক নবীকেই এখতিয়ার দিয়েছেন যে, তোমরা একবার বিশেষভাবে যা ইচ্ছে হয় দাবী করতে পার, তোমাদের সে বিশেষ দাবী পূরণ করা হবে। নবী করীম (সঃ) বলেন, সে বিশেষ দাবী প্রত্যেক নবী-ই দুনিয়ার জীবনে চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি দুনিয়ায় সে দাবী চাইনি, বরং আমি আমার সে বিশেষ দাবী শেষ বিচারের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। সে দাবীকে আমি আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য ব্যবহার করব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমাদের এ কেবলা স্বীকারকারীদের মধ্য হতে এত বিপুল পরিমাণ লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। তারা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানী করা এবং গুনাহের কাজ করে বীরত্ব দেখান এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করা।

সুতরাং আমাকে শাফাআ'ত করার অনুমতি প্রদান করা হলে আমি সেজদায় গিয়ে আল্লাহর প্রশংসায় মশগুল থাকব। যেমন দণ্ডায়মান হয়ে তার প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা করে থাকি। তারপর আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ হবে যে, হে মুহাম্মদ! মাথা উত্তোলন কর, তোমার যা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমার দাবী ও প্রার্থনা পূরণ করা হবে। তুমি শাফাআ'ত করলে তোমার শাফাআ'ত গ্রহণ করা হবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শাফাআ'ত করতে থাকব এবং আল্লাহ তাআ'লাও আমার শাফাআ'ত কবুল করতে থাকবেন। অবশেষে আমার প্রতিপালক আমার নিকট জিজ্ঞেস করবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি কি সন্তুষ্ট হতে পেরেছ ? আমি বলব, হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

—আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব, তাবারানী, আল বাযার।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন নবী-রাসূলদের জন্য নূরের মিম্বর হবে এবং তাতে তাঁরা উপবিষ্টও হবেন। কিন্তু আমার মিম্বরটি খালি থাকবে। আমি তাতে বসব না। কারণ আমি বসলে আমাকে তৎক্ষণাৎ জান্নাতে প্রেরণ করা হয় নাকি এবং আমার অবর্তমানে আমার উম্মতগণ আমার শাফাআ'ত হতে বঞ্চিত থাকে নাকি এ আশংকায় আমি বসব না। আমি নিবেদন করব, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে, আমার উম্মতের কি অবস্থা হবে? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে আমার কাছে কি চাও ? আমি বলব, আপনি তাদের হিসাব-নিকাশ দ্রুত করুন। অতঃপর আমার উম্মতকে ডেকে তাদের হিসাব-নিকাশের কাজ শুরু হবে। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের জন্য অতিরিক্ত কোন সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। আর কিছু লোক আমার শাফাআতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি কেবল সুপারিশ করতেই থাকব। অবশেষে আমার উম্মতের মধ্যে যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাদেরকে বের করার জন্য আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে আমার কাছে তাদের নামের একটি তালিকা প্রদান করা হবে। অবশেষে জাহান্নামের প্রধান কর্মকর্তা ফেরেশতা মালেক আমাকে বলবেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাদের সবাইকেই আপনি বের করে নিলেন, কাউকেই আর আল্লাহর ক্রোধানলে রাখলেন না।

—তাবরানী, বায়হাকী, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

মহাবিচারের দিন নবী করীম (সঃ) তাঁর উম্মতকে অবশ্যই শাফাআ'ত করবেন, এ বিষয়ে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য ও সঠিক। কিন্তু শাফাআ'ত লাভের ভরসায় নেক আমল না করা এবং গুনাহের কাজে নিমগ্ন

থাকা খুবই অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, এ উম্মতের বিপুল সংখ্যক লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং যুগ যুগ ধরে শাস্তি ভোগের পর অবশেষে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। সুতরাং কোন গুনাহগার ব্যক্তি বা নেক আমল না করা কোন ব্যক্তি কি দাবী করে বলতে পারে যে, আমি কখনো জাহান্নামে যাব না, হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করব? কোন লোকই এ দাবী করতে পারে না। সুতরাং গুনাহের কাজের জন্য আস্ফালন করা এবং নেক আমলশূন্য হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

ইতিপূর্বে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমাদের কেবলা মান্যকারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে, কিন্তু তাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জ্ঞাত। আর তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হল গুনাহের কাজ করে আস্ফালন করা এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করা।

মুমিনগণের শাফাআ'তের মর্যাদা লাভ ঃ

মহানবী (সঃ)-এর শাফাআ'ত হচ্ছে উম্মতের জন্য এক বিরাট রহমত বিশেষ। তাঁরই বদৌলতে তাঁর উম্মতের বহু গুণী ব্যক্তি মহাবিচারের দিন শাফাআ'ত করার গৌরবময় সম্মান লাভ করবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক বিরাট বিরাট দলের জন্য শাফাআ'তকারী হবে। কিছু কিছু লোক শাফাআ'ত করবে কেবল একটি মাত্র গোত্রের জন্য। আর কিছু কিছু লোক শাফাআ'ত করবে এক উসবা বা ক্ষুদ্রকায় দলের লোকদের জন্য। (দশ থেকে চল্লিশ জনের দলকে উসবা বলা হয়।) আর কিছু কিছু লোক মাত্র এক ব্যক্তির জন্য শাফাআ'ত করবে। অবশেষে আমার সমগ্র উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফাআতের ফলে বনী তামীম গোত্রের লোকদের চেয়েও অধিকসংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (জান্নাতীদের পথে) জাহান্নামী লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে। ঐ সময় জনৈক জান্নাতী ব্যক্তির ঐ পথে গমন ঘটবে। তখন জাহান্নামীদের কাতার হতে এক ব্যক্তি ঐ জান্নাতীকে বলবে, হে ভাই! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না ? পার্থিব জীবনে আমি আপনাকে একবার পানি পান করিয়েছিলাম। (সুতরাং অনুগ্রহ করে আমার জন্য শাফাআ'ত করুন)। আর জাহান্নামীদের এ কাতার হতে আর

একজন এসে উক্ত জান্নাতীকে বলবে, আমি আপনাকে অযুর পানি এনে দিয়েছিলাম। (অনুগ্রহ করে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন) তখন ঐ জান্নাতী ব্যক্তি তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।
—মুসলিম, মেশকাত।

অভিশাপকারীগণ শাফাআ'ত করার মর্যাদা হতে বঞ্চিত হবে ঃ

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যাদের অভিশাপ করার অভ্যাস রয়েছে, তারা কেয়ামতের দিন কোন সাক্ষী হবে না এবং তারা শাফাআ'ত করার মর্যাদাও লাভ করবে না। অর্থাৎ এ বদঅভ্যাসের কারণে তাদেরকে সাক্ষী হওয়া ও শাফাআতের পদমর্যাদা হতে বঞ্চিত করা হবে।
—তিরমিযী, ইবনে মাজা, মেশকাত।

মুজাহিদগণের শাফাআ'ত ঃ

তিরমিযী শরীফে এক দীর্ঘকায় হাদীস রয়েছে, যার বর্ণনাকারী হচ্ছেন– হযরত মেকদাম ইবনে মায়াদি ইয়াকরাব (রা)। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) শহীদগণের মহত্ত্ব ও ফজিলত বর্ণনায় বলেছেন, "সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তাদের শাফাআ'ত গ্রহণ করা হবে।" —তিরমিযী, ইবনেমাজা।

পিতা-মাতার জন্য নাবালেগ মৃত সন্তানের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তিনটি নাবালেগ সন্তানকে পূর্বেই পরকালে পাঠায়, অর্থাৎ নাবালক অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়। তাহলে সে তিন শিশু তাকে (নারী বা পুরুষ হোক) জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার জন্য সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় জাহান্নামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একথা শুনে হযরত আবু যার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো শুধুমাত্র দু'টি শিশুকে পাঠিয়েছি। (আমার সম্পর্কে কি বলেন?) তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, দু' শিশুর ব্যাপারেও এ একই কথা প্রযোজ্য। হযরত উবাই ইবনে কাআ'ব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তো একটি শিশুকে পাঠিয়েছি। (অর্থাৎ আমার একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আমার ব্যাপারে কি বলেন?) তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, একটি শিশুর ব্যাপারেও এ একই কথা। অর্থাৎ সে-ও পিতা-মাতার জন্য শাফাআ'তকারী হবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা।

পরকালে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, পিতা-মাতা বা তাদের কোন একজনের বর্তমানে কোন শিশুর মৃত্যু হওয়া। সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় পিতা-মাতা যে দুঃখ-কষ্ট পায়, সে দুঃখ-কষ্টের প্রতিদানে আল্লাহ তাআ'লা তাদের খুশীর জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন যে, পরকালে উক্ত শিশুরা পিতা-মাতার ক্ষমার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। এমনকি গর্ভপাতেও যদি কোন সন্তানের মৃত্যু ঘটে থাকে, তাহলে সে শিশুও পিতা-মাতার ক্ষমার জন্য পরকালে কর্মতৎপর হবে।

হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, গর্ভপাতে মৃত শিশুও মহাবিচারের দিন পিতা-মাতার মুক্তির জন্য স্বীয় প্রতিপালকের কাছে শাফাআ'ত করবে, যখন তার পিতা-মাতাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান হবে। তার জোরদার সুপারিশের কারণে তাকে বলা হবে, হে গর্ভপাতের শিশু, তুমি তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন সে শিশু তার নাভী দ্বারা ঠেলে ঠেলে তার পিতা-মাতা উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

—ইবনে মাজাহ, মেশকাত।

কোরআনের হাফেজগণের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সমস্ত কোরআন মজীদ মুখস্থ করেছে এবং তা পুরোপুরিভাবে স্মরণে রেখেছে, আর কোরআন মজীদে যেসব জিনিস ও কর্মকে হালাল বলেছে, তাকে সে স্বীয় আকিদ্বা বিশ্বাস ও কর্মে হালাল রেখেছে, আর যেসব বস্তুকে হারাম বলেছে, তাকে সে বিশ্বাস ও কর্মে হারাম রেখেছে, তাকে আলাহ তাআ'লা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তার পরিবারের মধ্যে এমন দশজন লোকের জন্য তার শাফাআ'ত কবুল করবেন, যাদের খারাপ কর্মের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করা অবধারিত হয়ে গেছে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারেমী।

বিশেষ সতর্ক বাণী ঃ

উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ কোরআন মজীদ মুখস্থ করলে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চললে আল্লাহ তাআ'লা তার পরিবারের দশজন জাহান্নামী লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে শুধু মুখস্থ করলেই হবে না, বরং কোরআনের দাবীসমূহ পূরণ করতে হবে এবং তার বিধি-বিধানসমূহ বাস্তব জীবনে পালন করতে হবে। কিন্তু তার দাবী ও বিধানসমূহ বাস্তবায়িত না করলে উল্টো কোরআন মজীদই তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। অনেক লোক গুনাহের পর গুনাহের কাজ করে যাচ্ছে, নেক আমলের ধারে কাছেও যায় না। উপদেশ দিলে বলে, ভাই, চুপ কর। আমার পুত্র বা আমার ভাইপো বা আমার অমুক নিকটাত্মীয় কোরআনে হাফেজ। সে পরকালে আমাদের ক্ষমা লাভের ব্যবস্থা করবে। অথচ তারা এটা লক্ষ্য করছে না যে, উক্ত হাফেজই কোরআন মাফিক আমল করছে কি-না। বর্তমান জমানায় মানুষ অন্য লোকের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে বিনা চিন্তায়, নির্ভয়ে গুনাহের কর্মে লিপ্ত থাকছে। এটা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতার কাজ। নিজে গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করে ও নেক আমল করে অন্যের শাফাআতের আশা পোষণ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। নতুবা আশার ছলনায় নিজের ক্ষতি ডেকে আনা অনিবার্য।

রোযা ও কোরআনের শাফাআ'ত ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন রোযা এবং কোরআন মজীদ (তার বাহকের জন্য) শাফাআ'ত করবে। রোযা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ ব্যক্তিকে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত রেখেছিলাম (এবং অন্যান্য চাহিদার বস্তু হতেও বিরত করেছিলাম)। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কোরআন মজীদ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এ ব্যক্তিকে রাতের বেলা নিদ্রা হতে বিরত রেখেছিলাম (কেননা রাতে সে আমাকে পাঠ করত এবং শোনত)। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, অবশেষে উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

—বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা কোরআন মজীদ পাঠ কর। কেননা কেয়ামতের দিন সে তার পাঠকদের পক্ষে শাফাআ'তকারী হবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান উভয় সূরাকে পাঠ কর। এ সূরা দু'টি খুবই ফযীলতপূর্ণ। কেননা কেয়ামতের দিন এ সূরা দু'টি দু'খণ্ড মেঘ অথবা দু'টি ছায়া অথবা দু'দল পাখীর ন্যায় এসে তার পাঠকগণের পক্ষে সুপারিশ করবে। —মুসলিম, মেশকাত।

আল্লাহর কুদরতী নলার ঔজ্জ্বল্য, পুলসেরাত ও নূর বণ্টনের বিবরণ

কাফের মুশরেক ও মুনাফেকদের ভয়ংকর বিপদ ঃ

কেয়ামতের দিনটি হচ্ছে সুবিচারের দিন। সেদিন প্রত্যেক লোক নিজের আমলের ওজন স্বচক্ষে অবলোকন করে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। কারো একথা বলার সাহস হবে না যে, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আমি বিনা কারণে জাহান্নামে যাচ্ছি। তাই কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ *

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের পুরাপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সে খুব ভালভাবেই জানে যে, সে কি করছে।"

আল্লাহ তাআ'লা ঈমান ও পুণ্যময় কর্মের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। আর জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন কুফর, শিরক ও অন্যান্য গুনাহের জন্য। নিজের আমল ও কর্মের পরিণতিতে এ দু'টির মধ্যে যাকে যেখানে যেতে হয়, সে সেখানেই যাবে। জান্নাতে যাওয়ার জন্য জাহান্নামের উপরিভাগ দিয়ে একটি পথ থাকবে। আর সে পথকেই হাদীসে সিরাত নামে নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে আমাদের

দেশে একে পুলসেরাত বলা হয়। আল্লাহভীরু মুমিনগণ নিজ নিজ শ্রেণী ও মর্যাদা অনুযায়ী সহীহ সালামতে এ পুল অতিক্রম করবে। কিন্তু যারা দুনিয়ার জীবনে খারাপ কাজ করেছে এবং ইসলামী বিধান মেনে চলেনি। তারা এ পুলসেরাত অতিক্রম করতে পারবে না। সে পুলের তলদেশে জাহান্নাম থেকে বিরাট লৌহ সারাশী পোতা আছে, যা অতিক্রমকারীকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অনেক ফাসেক ও বদ আমলদার মুসলমান হেঁচড়িয়ে ও চোতর ঘষে ঘষে অতিকষ্টে সে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। কিন্তু যাদের জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে এসব সারাশী দ্বারা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দীর্ঘদিন শাস্তি ভোগের পর নিজের আমল অনুযায়ী অথবা নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও হক্কানী ওলামাদের শাফাআতের বদৌলতে এবং আল্লাহ তাআ'লা অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে। খাঁটি মনে কালেমা পাঠকারী কোন মানুষই শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে না, শুধু মাত্র কাফের, মুশরেক ও মুনাফেকরাই চিরকাল সেথায় অবস্থান করবে মর্মস্পর্শী জ্বালাময়ী শাস্তির মধ্যে।

নূর বণ্টন ঃ

পুলসেরাত অতিক্রম করার আগে মুমিনদের মধ্যে আল্লাহর নূর বণ্টন করে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ঈমানদার নারী ও পুরুষগণের আমল অনুযায়ী তাদের মধ্যে নূর বণ্টন করা হবে। (আর সে নূরের আলোতে তারা পুলসেরাত পার হবে)। এ নূর হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের পথ প্রদর্শনকরী। এদের মধ্যে কারো নূর হবে পাহাড়সম। কারো হবে বৃক্ষসম। যে ব্যক্তি সবচেয়ে কম নূর লাভ করবে, তার নূর আংটির মধ্যে বাতির ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। কখনো তা নিভে যাবে এবং কখনো তা জ্বলে উঠবে। —তাফসীরে দূররে মানসুর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিনা মহিলাদেরকে দেখবেন যে, তাদের সামনে ও ডানে নূর দৌড়াচ্ছে। (আর ফেরেশতারা তাদেরকে বলবে) আজ তোমাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যার নিম্নদেশ হতে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আর এটাই হচ্ছে তাদের বিরাট সাফল্য। —সূরা হাদীদ– ২য় রুকু।

নূর লাভ করার পর মুমিন নর-নারীগণ পুলসেরাত পার হতে থাকবে। আর তাদের নূরের আলোতে মুনাফেক নারী-পুরুষেরা তাদের পেছনে পেছনে থাকবে। কিন্তু মুমিন নর-নরীগণ সম্মুখে অগ্রগামী হবে আর মুনাফেক নর-নারীরা পেছনে পড়ে থাকবে। তারা উচ্চৈস্বরে মুমিনগণকে বলবে, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমরাও আসছি, তোমাদের নূরের আলো দ্বারা আমাদের উপকার হচ্ছে। তখন ঈমানদারগণ বলবে, (এখানে নিজের নূরের দ্বারাই কাজ হয়।) অপরের নূর দ্বারা

এখানে উপকৃত হওয়ার কোন বিধান নেই। তোমরা পেছনে চলে যাও। যেখানে নূর বন্টন হয়, সেখানে গিয়ে নূর সন্ধান কর। সুতরাং মুনাফেক নর-নারীরা নূর লাভের আশায় পেছনে ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কিছুই পাবে না। তখন মুমিন ও মুনাফেক উভয় দলের মধ্যে একটি প্রাচীর সৃষ্টি হবে। তাতে ভেতর দিক দিয়ে একটি দরজা থাকবে। সেখানে মুসলমানরা অবস্থান করবে এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। আর প্রাচীরের বাইরে থাকবে শাস্তি, সেখানে মুনাফেকরা অবস্থান করবে। এ বিষয়ে সূরা হাদীদে আলোচিত হয়েছে ঃ

"সেদিন মুনাফেক নর-নারীরা মুমিনগণকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে আলো গ্রহণ করতে পারি। তখন মুমিনগণ বলবে, তোমরা পেছনে চলে যাও এবং সেখানে নূর সন্ধান কর। অতঃপর উভয় দলের মধ্য একটি প্রাচীর দণ্ডায়মান হবে এবং তার অভ্যন্তরীণ দিকে একটি দরজাও থাকবে। তাতে থাকবে আল্লাহর রহমত। আর তার বাইরের দিকে থাকবে শাস্তি।" —সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

এহেন বিপদে নিপতিত হয়ে মুনাফেকরা তা থেকে বাঁচার কোন পথ পাবে না। ঈমানদারগণকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়ে তাদেরকে অনুগ্রহ করার অনুরোধ করে বলবে, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের সাথী ছিলাম, তোমাদের সাথে একত্রে নামায আদায় করতাম এবং রোযা রাখতাম। সুতরাং আজ তোমাদের উচিত বন্ধুত্বের দাবী পূরণ করা। কোরআন মজীদে মুনাফেকদের একথাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ *

"মুনাফেকরা মুমিনদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? প্রত্যুত্তরে মুসলমানরা বলবে, অবশ্যই ছিলে। কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করেছ। তোমরা (মুসলমানদের ধ্বংসের) অপেক্ষায় ছিলে। আর ইসলাম সত্য দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে। তোমাদেরকে নিরর্থক আশা প্রতারিত করেছে। অবশেষে আল্লাহর হুকুম তোমাদের কাছে এসেছে অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে। তোমাদেরকে প্রতারক শয়তান আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণায় নিপতিত করেছে।" —সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

এ কথোপকথনের পর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন- "আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও নয়, যারা কুফরী করেছে। তোমাদের অবস্থানস্থল হচ্ছে অনল কুণ্ড এবং আগুনই হচ্ছে তোমাদের সাথী। এ প্রত্যাবর্তন স্থানটি খুবই খারাপ।" —সূরা হাদীদ- ২য় রুকু।

আল্লাহর কুদরতি নলার ঔজ্জ্বল্য ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কেয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পাবে। দুপুরের সময় সূর্য যখন মেঘমুক্ত থাকে, তখন কি সূর্য অবলোকন করতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় ? মেঘমুক্ত আকাশে চতুর্দশী রাতে চন্দ্র অবলোকন করতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! চন্দ্র দর্শনে আমাদের কোনই কষ্ট হয় না। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা এভাবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লাকে ভালভাবে দেখতে পাবে, কোন কষ্ট হবে না। যেমন চন্দ্র-সূর্য দেখতে তোমাদের কোন কষ্ট হয় না। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যে যার পূজা অর্চনা ও এবাদত-বন্দেগী করতে, সে তার সাথেই থাক। সুতরাং যারা আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থাৎ প্রতিমা, মূর্তি, পাথর, গাছপালা ইত্যাদির পূজা-অর্চনা করত, তারা সবাই জাহান্নামে পতিত হবে। তাদের কেউই জাহান্নামে পতিত না হয়ে থাকবে না (কেননা তাদের বাতিল মাবুদরাও হবে জাহান্নামের ইন্ধন)। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ শেষ পর্যন্ত সেসব আহলে কিতাবগণ থাকবে, যারা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার এবাদাত-বন্দেগী করত। তাদের মধ্যে নেককার-বদকার সবলোকই থাকবে। তখন ইহুদীগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়ায় তোমরা কার এবাদত করতে? জওয়াবে তারা বলবে আমরা আল্লাহ তাআ'লার পুত্র নবী উযায়ের (আঃ)-এর এবাদত বন্দেগী করতাম। এ উত্তরে তাদেরকে খুব শাসান হবে, আর বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ'লা কাউকে নিজের পুত্র বা স্ত্রী মনোনীত করেননি। অতঃপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন তারা আরয করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুব পিপাসিত।

আমাদেরকে পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। এ কথায় তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে গিয়ে কেন পান করছ না? অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে একত্রিত করা হবে। (দূর থেকে পানির ন্যায় মরীচিকা মনে হলেও) আসলে তা হচ্ছে অনলকুণ্ড। এ আগুনের শিখা ও অংশগুলো একে অপরকে জ্বালাতে থাকবে। অতঃপর তারা সে আগুনে পতিত হবে।

অতঃপর খ্রিস্টানদেরকে ডেকে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহ তাআ'লার পুত্র ঈসা (আ)-এর এবাদত করতাম। এরূপ উত্তরের জন্য তাদেরকে ধিক্কারস্বরূপ বলা হবে, তোমরা তোমাদের কথায় মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআ'লা কাউকে কখনো নিজের স্ত্রী বা পুত্র আখ্যায়িত করেননি। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও ? তারা আরয করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পিপাসাকাতর। আমাদেরকে পানি পান করান। তাদের এ কথায় জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, ওখানে গিয়ে কেন পান করছ না ? অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে সমবেত করা হবে। আর দূর থেকে দেখা যাবে যে, বালুকারাশি ঝলমল করছে। (মূলত তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন) যার অংশগুলো একে অপরকে জ্বালাতে থাকবে। সুতরাং তারা সে আগুনে পতিত হবে।

মোটকথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা শিরকে লিপ্ত ছিল, তারা সকলেই জাহান্নামে পতিত হবে। অবশেষে তারাই রয়ে যাবে, যারা আল্লাহর এবাদত করত অর্থাৎ মুসলমান। তাদের মধ্যে নেককারও থাকবে এবং বদকার লোকও থাকবে। তাদের সামনে তখন আল্লাহ তাআ'লার নূর বিকশিত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, প্রত্যেক দল তাদের মাবুদের অনুগামী হয়েছে। তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? ঈমানদারগণ তখন বলবে, যারা যাবার তারা গিয়েছে, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, আমরা আমাদের মাবুদের অপেক্ষায় আছি। আমাদের মাবুদ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অবস্থান করব। আমরা যখন আমাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করব, তখন তার কাছে আরজ করব যে, ইয়া পরওয়ারদেগার! দুনিয়ায় আমরা অন্যান্য দল ও জাতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলাম। অথচ তাদের সাথে থাকার অনেক প্রয়োজন ছিল। তথাপি আমরা তাদের সাথে থাকিনি। এখন আমরা কিভাবে তাদের সাথে থাকতে পারি ? তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমিই হচ্ছি তোমাদের মাবুদ ও প্রতিপালক। যেহেতু মুমিনগণ আল্লাহর কুদরতী নলার বিকশিত নূর দ্বারা আল্লাহ তাআ'লার পরিচয় লাভের ধ্যানে থাকবে, তাই আল্লাহ তাআ'লার এ নূরকে গায়রুল্লাহ মনে করে نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ (নাউযুবিল্লাহ মিনকা –তোমার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই) বলবে। তোমাকে আমরা প্রভু স্বীকার করে কি মুশরেকে পরিগণিত হব? আমরা কোন বস্তুকেই আল্লাহ তাআ'লার সাথে শরীক করতে পারি না। দু বা তিনবার তারা এ কথা বলবে।

তাদের এ জবাব শুনে আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের মধ্যে কি কোন নির্দিষ্ট নিদর্শন আছে, যা দ্বারা তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চিনতে পার? প্রত্যুত্তরে মুমিনগণ বলবে, অবশ্যই আমাদের কাছে নিশানা রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআ'লার কুদরতী

নলার✪[১] নূর বিকশিত হবে। যারা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্ তাআ'লার সিজদারত হত, তারা সবায়ই এ নূর অবলোকন করে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর যারা দুনিয়ায় মানুষকে দেখাবার জন্য বা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুনাফেকী করে সেজদায় লিপ্ত হত, আল্লাহ্ তাআ'লা তাদের সবার কোমরকে কাঠের তক্তার ন্যায় শক্ত করে দেবেন। (ফলে তারা সেজদা করতে পারবে না) তাদের মধ্যে কেউ সেজদা করার ইচ্ছা করলেও তারা অধঃমুখে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে, কিন্তু সেজদা করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর মুমিনগণ সেজদা হতে মাথা উত্তোলন করবে। তখন যারা আল্লাহ্কে দেখবে, তার কুদরতী নলার বিকশিত নূর দেখতে পাবে। তখন আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, আমি হচ্ছি তোমাদের প্রতিপালক। তখন মুমিনগণ এ কথা মেনে নেবেন যে, হ্যাঁ আপনিই আমাদের প্রতিপালক।

এরপর জাহান্নামের উপরিভাগে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে এবং সকলকে তা পার হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। এ সময় যারা শাফায়াত করার যোগ্য হবেন, তাদেরকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে। আর সকলে তখন বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন!

জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! পুলসেরাত কি ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে পিছলিয়ে পড়ার স্থান। সেখানে জাহান্নাম হতে উত্থিত সাড়াশী মোতায়েন থাকবে এবং বড় বড় কাঁটাও থাকবে। এ কাঁটাগুলো দেখতে নজদের কাঁটার মত দেখাবে। এগুলোকে সুয়ুদান নামে নামকরণ করা হয়েছে। মুমিনগণ খুব দ্রুত গতিতে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। তাদের এ দ্রুতগতি তাদের আমল অনুযায়ী হবে। কেউ চোখের পলকের মধ্যে, কেউ বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ বায়ুর ন্যায়, কেউ পাখীর ন্যায়, কেউ উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায় এবং কেউ উটের পথ চলার গতিতে তা পার হয়ে যাবে। আর জাহান্নাম থেকে যেসব সাড়াশী ও কাঁটা উত্থিত হবে, সেগুলো মানুষকে টেনে ধরে জাহান্নামে পতিত করার চেষ্টা করবে। পরিণতিতে বহু লোকই নিরাপদে পুলসেরাত পার হবে, আর অনেকে চলতে চলতে বহু কষ্টে পার হবে। আর অনেক লোককে ধাক্কিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। কিন্তু ঈমানদারগণ জাহান্নাম হতে রক্ষা পাবেন। সে সত্ত্বার নামে শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। এ দুনিয়ায় তোমরা আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে ইয়াক্বীন বা খুবই দৃঢ়তার সাথে কোন কিছু প্রার্থনা কর না। কিন্তু পুলসেরাত পার হওয়ার পর মুমিনগণ জাহান্নামে পতিত ঈমানদার ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআ'লার কাছে খুবই দৃঢ়তার সাথে সুপারিশ করবে।

✪১. আরবী ভাষায় নলাকে সাঁকো বলা হয়। আল্লাহ্ তাআ'লা কোনরূপ দেহ অবয়ব হতে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং এখানে নলা দ্বারা আল্লাহ্ তাআ'লার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এটাকেই সাঁকো বলা হয়েছে। যেমন ইয়াদুল্লাহ্ বা আল্লাহর হাত। অজহুল্লাহ্ বা আল্লাহর মুখমণ্ডল ইত্যাদি শব্দ কোরআনে ব্যবহার হয়েছে। এসবের দ্বারাও আল্লাহর বিশেষগুণের কথা বুঝান হয়েছে। তার দেহ বা অংগের কথা বুঝান হয়নি। এগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। এগুলো নিয়ে বিতর্ক করা বা কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া ঠিক নয়। এর আসল মর্ম মানুষের বোধ জ্ঞানের অতীত। সুতরাং যেভাবে আছে সেভাবেই এর প্রতি ঈমান রাখতে হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ায় কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে যেমন কঠোরতার সাথে তা দাবী করা হয়, অনুরূপভাবে সেদিন ঈমানদারগণও তাদের জাহান্নামী ভাইদের জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে খুব জোরাল দাবী জানাবেন। আর পার্থিব দাবীর চেয়ে সে দাবী খুবই জোরাল হবে। ঈমানদারগণ যখন দেখবে যে, আমরা নাজাত লাভ করেছি, তখন আল্লাহ তাআ'লার কাছে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে পতিত হয়েছে, তারা আমাদের সাথে নামায আদায় করত, রোযা পালন করত এবং তারা হজ্জও পালন করত। (এখন তাদেরকে আপনি আমাদের সাথে জান্নাতে দাখেল করুন) তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হবে, তোমরা যাকে যাকে চেন, তাকে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। অন্তর তারা সেই পরিচিত লোকদেরকে বের করার জন্য অগ্রসর হবেন। এ সময় তাদের দেহ জাহান্নামের আগুনে ভষ্ম হওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে তারা বিপুল সংখ্যক লোক বের করে আনবেন। এসব জাহান্নামী লোকদের কাউকে আগুন অর্ধনলা পর্যন্ত জ্বালিয়েছে, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত জ্বালিয়েছে।

অতঃপর ঈমানদারগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে নিবেদন করবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে বের করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কেউ-ই এখন জাহান্নামে নেই। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা পুনরায় জাহান্নামে প্রবেশ করে দেখ যে, যাদের অন্তরে একটি দিনার পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান আছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। একথার পর মুমিনগণ বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করে আনবেন। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের সবাইকেই আমরা বের করেছি। এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করে দেখ, যাদের অন্তরে আধাদিনার পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। সুতরাং মুমিনগণ বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে বের করবে আর বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তাদের কাউকেই জাহান্নামে রাখিনি, যাদেরকে বের করে আনার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যাদের অন্তরে অণু পরমাণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান আছে, তোমরা তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যাদের অন্তরে অণু পরমাণু পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাদের কাউকেই আমরা জাহান্নামে রাখিনি, সকলকেই বের করে এনেছি।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ফেরেশতাগণ শাফায়াত করেছে, নবী-রাসূলগণ শাফায়াত করেছেন, ঈমানদারগণও শাফায়াত করেছেন, এখন কেবল আরহামুর রাহিমীনই বাকী আছেন। একথা বলার পর আল্লাহ তাআ'লা

জাহান্নাম হতে তার কুদরতী হাত দ্বারা এক মুঠো লোক গ্রহণ করবেন। এদের মধ্যে এমন সব লোক হবে যারা কখনো কোন ভাল ও কল্যাণকর কাজ করেনি। (তাদের কাছে কেবলমাত্র ঈমানই ছিল গোপন সম্পদ) এরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলে কয়লা সাদৃশ্য হবে। তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা জান্নাতের প্রথমাংশে প্রবাহিত একটি নহরে ফেলবেন। এ নহরটির নাম হলো নাহরুল হায়াত। (এ নহরে পড়ার পর তাদের দেহের রূপ-রং পরিবর্তন হয়ে যাবে। তারা এ নহর থেকে এমন অবস্থায় বের হবে যেন? একটি মোতি। তাদের কাঁধে একটি চিহ্ন থাকবে, যা দেখে জান্নাতীগণ বুঝবে যে, এরা হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহে মুক্তিপ্রাপ্ত। এদেরকে আল্লাহ তাআ'লা কোন নেক আমল ছাড়া এবং পরকালের জন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ করা ছাড়াই জান্নাত দান করেছেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সেখানে যত জায়গা তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে, তা সবই তোমাদের জন্য। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা দুনিয়ার কোন লোককেই দান করেননি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের জন্য আমার কাছে এর চেয়েও অনেক উত্তম নেয়ামত আছে। তখন তারা আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়েও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কি হতে পারে ? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত হচ্ছে আমার সন্তুষ্টি। সুতরাং এখন থেকে তোমাদের প্রতি আমি আর কখনই অসন্তুষ্ট হব না।

—বোখারী, মুসলিম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ দীর্ঘকায় হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুদরতী নলার নূর বিকশিত হওয়ার পর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নলার নূর বিকশিত হওয়া এবং পুলসেরাত অতিক্রম করার মধ্যবর্তী সময় নূর বণ্টন হবে। কেননা, পুলসেরাত অতিক্রম করার জন্য নূর বণ্টন করা হবে। কিন্তু ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নূর বিকশিত হওয়ার পূর্বেই নূর বণ্টনের কথা বর্ণনা করেছি।

এ হাদীস দ্বারা পুলসেরাত এবং তা অতিক্রমকারীদের অবস্থাটি পুরাপুরিভাবে অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য বর্ণনায় এর চেয়েও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ "নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বাগ্রে আমিই আমার উম্মতসহ পুলসেরাত পার হব। সেদিন নবী রাসূলগণ ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। সেদিন নবী রাসূলদের কথা হবে শুধু– اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ –হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন!

—বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, জাহান্নামের উপর পুলসেরাত স্থাপন করা হবে, যা ধারাল তলোয়ারের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হবে।

—তারগীব তারহীব।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, মানুষ আপন আপন আমলসহ পুলসেরাত অতিক্রম করবে। যার যেমন আমল হবে, সে অনুযায়ী তার চলার গতিও হবে অনুরূপ দ্রুত বা ধীর। ধীরগতির লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, কিছু সংখ্যক অতিক্রমকারী চোতর ঘষতে ঘষতে পথ চলবে।

—মুসলিম।

আর এক বর্ণনায় আছে, জাহান্নাম থেকে যেসব সাড়াশী উত্থিত হবে, তার এক একটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং তার আক্রমণ করার অবস্থা এমন হবে যে, একবারের আক্রমনে সে রাবীআ'হ ও মুদার গোত্রদ্বয়ের লোকদের চেয়েও বেশি লোক ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। —বায়হাকী, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

বিশ্বনবী (সঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলাবেন

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের উম্মতের তুলনায় আমার উম্মত এবং আমার তরীকা অনুসারীগণের সংখ্যা হবে সর্বাধিক। আর আমিই জান্নাতের দরজা খোলার জন্য প্রথম কড়া নাড়ব। —মুসলিম।

তিনি আরও বলেন, কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। জান্নাতের প্রহরী জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে ? উত্তরে আমি বলব, আমি মুহাম্মদ (সঃ), তখন সে বলবে, আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরজা শুধু আপনার জন্য খোলব, আপনার পূর্বে আর কারো জন্য দরজা খোলব না। —মুসলিম।

নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের প্রহরীগণকে ডাকব। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা আমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমার সাথে থাকবে গরীব মুমিনগণ। আমি এটা গৌরব করার জন্য বলছি না। আমি আগের-পরের সমস্ত মানুষের চেয়ে আল্লাহ তাআ'লার নিকট অতিশয় সম্মানিত ও প্রিয় পাত্র। আমি এটা গৌরব প্রকাশের জন্য বলছি না। —তিরমিযী, দারেমী, মেশকাত।

মানুষ দলে দলে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে

জাহান্নামীগণকে ভর্ৎসনা করা এবং জান্নাতীগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

জাহান্নামের দরজাগুলো জেলখানার দরজার ন্যায় পূর্ব থেকেই বন্ধ থাকবে। আর জান্নাতের দরজাগুলো থাকবে পূর্ব হতেই উম্মুক্ত। কাফের মুশরেকগণকে ধাক্কিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে। যেহেতু কাফের-মুশরেকদের প্রকার ও শ্রেণী হবে বহুবিধ। তাই প্রত্যেক প্রকার ও শ্রেণীকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করা হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন—

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا *

"যারা অবিশ্বাসী (শেষ বিচারের দিন) তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।" —সূরা যুমার– ৮ম রুকু।

কাফেরগণ জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে সমবেত হলে দ্বার উন্মুক্ত করে তাদেরকে সেথায় ঢুকিয়ে দেয়া হবে। আর জাহান্নামের দ্বাররক্ষী ফেরেশতা তাদের ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞেস করবেন– তোমাদের কাছে কি কোন রাসূল আসেননি? তাদের তখনকার কথোপকথনকে কোরআন মজীদে নিম্নরূপ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ

"অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের দরজায় পৌছবে, তখন জাহান্নামের দরজাগুলো খোলা হবে। আর তাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী বলবে, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি এমন কোন রাসূল আগমন করেননি? যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পাঠ করে শুনাতেন এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতেন? তখন তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিল। কিন্তু শাস্তির প্রতিশ্রুতি কাফেরদের প্রতি পুরাপুরিভাবে বাস্তবায়িত হল। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজাপথে প্রবেশ কর এবং তাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান কর। সুতরাং অহংকারীদের ঠিকানা খুবই খারাপ। —সূরা যুমার– ৮ম রুকু।

জান্নাতীদের প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا *

"যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করা হবে।" —সূরা যুমার– ৮ম রুকু।

ঈমান ও তাকওয়ার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। অর্থাৎ কারো ঈমান ও তাকওয়া বেশি ও পরিপক্ক হয়, আর কারো অপরিপক্ক ও দুর্বল হয়। এ কারণে মুমিনগণ ঈমান ও তাকওয়ার মানগত দিক দিয়ে আলাদা আলাদা এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। এদের সকল দলকেই ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পূর্ব থেকেই জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করা থাকবে। জান্নাতের দরজায় পৌঁছার সাথে সাথেই জান্নাতের প্রহরী তাদেরকে চিরশান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনিয়ে খোশ আমদেদ জানাবেন। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে–

"অবশেষে তারা যখন জান্নাতের দরজায় পৌঁছবে, আর জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হবে। জান্নাতের প্রহরী তখন তাদেরকে খোশ আমদেদ জানিয়ে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং তোমরা সুখী হও, আর চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এ জান্নাতে প্রবেশ কর।" —সূরা যুমার– ৮ম রুকু।

আপন অনুসারীদের সামনে শয়তানের আত্মপক্ষ সমর্থন

দুনিয়াতে শয়তান তার দলবলসহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সত্য পথ হতে সরিয়ে কুফরী ও শেরকির জালে আবদ্ধ করে, তাদের চরম ক্ষতি করেছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন সে নিজকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলবে, তোমরা আমার কথা ও মন্ত্রণা শুনলে কেন? আমি তো তোমাদেরকে বাধ্য করিনি। তোমাদের উপর আমার তো কোন জোর-জবরদস্তী ছিল না। শয়তানের আত্মপক্ষ সমর্থনের বিষয়ে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"শেষ বিচারের দিন যখন সবার বিচার-ফয়সালা হতে থাকবে, তখন শয়তান বলবে, (আমার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায়), কেননা, আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সে প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধাচারণ করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন জোর-জবরদস্তী ছিল না। কিন্তু আমি শুধু কেবল তোমাদেরকে দাওয়াতই জানিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। অতএব তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কোর না বরং নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে, (দুনিয়ার জীবনে) আমাকে (আল্লাহ্ তাআ'লার সাথে) শরীক করতে, আমি তা অস্বীকার করছি এবং তোমাদের এ কাজে আজ আমি অখুশী। নিশ্চয় জালেমদের জন্য রয়েছে জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা ইবরাহীম– ৪র্থ রুকু।

শয়তানের এ বক্তব্যের অর্থ হল আমি তোমাদেরকে সত্য পথ হতে সরিয়ে খারাপ পথে এনেছি, বিভ্রান্ত করেছি, এটাই ছিল আমার কাজ। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনলে কেন ? তোমরা নিজেরাই অপরাধী। নবী-রাসূলদের মুজিযা ও দলীল প্রমাণভিত্তিক দাওয়াত পরিত্যাগ করে আমার মিথ্যা ও বাতিল আহ্বানে তোমরা কেন কান দিলে? আমি তো হাতে ধরে জোর জবরদস্তীপূর্বক তোমাদেরকে কুফরী ও শেরক করতে বাধ্য করিনি। সুতরাং আমাকে এখন দোষারোপ করলে কোনই কাজ হবে না। তোমরা বরং নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর। আমরা একে অপরকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারব না। এখন চিরন্তন শাস্তি ভোগ করতেই হবে। দুনিয়ায় তোমরা আমাকে আল্লাহ্ তাআ'লার সাথে শরীক মনোনীত করেছিলে। এখন আমি সে সম্পর্কে তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

শয়তানের এ ভাষণে কাফের মুশরেকদের মনে তখন কিরূপ অনুশোচনা হবে এবং আক্ষেপ প্রকাশ করবে তা সহজেই বুঝা যায়।

উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংখ্যায় তারাই হবে সর্বাধিক

সহীহ্ মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমরা এ দুনিয়ায় সব উম্মতের শেষে এসেছি এবং কেয়ামতের দিন অন্যান্য মাখলুকের আগে

আমাদের বিচার-ফয়সালা হবে। তিনি অন্য হাদীসে বলেছেন, এখানে আমরা সর্বশেষে এসেছি এবং পরকালে আমরা সর্বাগ্রে থাকব। আর জান্নাতেও প্রবেশ করব সর্বাগ্রে। —মুসলিম, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতীদের একশ' বিশটি কাতার হবে। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে উম্মতে মুহাম্মাদীর। আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য নবী-রাসূলদের উম্মতের।

—তিরমিযী, দারেমী, মেশকাত।

হিসাবের কারণে ধনীদের জান্নাতে যেতে বিলম্ব হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গরীব মুমিনগণ ধনী মুমিনদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী, মেশকাত)

নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে দেখলাম যে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই গরীব লোক। আর ধনীরা হিসাব দেয়ার জন্য আটকে আছে। কিন্তু যারা জাহান্নামী হবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে অনেক আগেই। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশই হচ্ছে মহিলা। —বোখারী, মুসলিম।

উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম (সঃ) মহাবিচারের দিনের একটি দৃশ্য তুলে ধরেছেন, যা তাঁকে পূর্বেই দেখান হয়েছিল। এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ধনী লোকদের জান্নাতে প্রবেশ করতে অনেক বিলম্ব হবে। আর এটাও অবগত হওয়া যায় যে, অভাবী ও গরীব দুঃখী লোকেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে যাবে। সেদিনই মানুষ বুঝতে পারবে অভাব অনটন ও দরিদ্রতার কি মূল্য। আমাদের এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কেবল দরিদ্রতাই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। দরিদ্রতার পাশাপাশি ঈমান ও নেক আমলও থাকা অনিবার্য। যারা অনাচারী ও খারাপ কাজ করে, এমন গরীবদের এটা কক্ষনো বুঝা উচিত নয় যে, আমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করব এবং আমাদের অনেক ফযিলত মহত্ত রয়েছে। পরকালে ফযিলত হবে নেক আমলের কারণে। হ্যাঁ, যাদের নেক আমল জান্নাত লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হবে, তারা দরিদ্রতার কারণে ধনীদের চেয়ে পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে যাবে। অনেক লোক আছে যারা অনাচারী ও খারাপ আমলকারী অথচ দরিদ্র এবং নামায-রোজার ব্যাপারে ও তারা খুব অমনোযোগী, গুনাহের সাগরে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন লোকেরা চরম ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর উভয় জগতে দুর্ভাগ্যর জন্য জীবন যাপন করে চলছে।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দুর্ভাগাদের মধ্যে বড় দুর্ভাগা সে লোক, যে দুনিয়ায় অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে রয়েছে এবং পরকালেও তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। —হাকেম, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মহাবিচারের দিন মানুষ হাশর ময়দানে সমবেত হবে। অতঃপর আহবান করা হবে, উম্মতের অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা কোথায় ? তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করেছ ? তারা বলবে, আপনি আমাদের অভাব-অনটন ও দরিদ্রতায় নিপতিত করে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, আর আমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। (আপনার খুশীতেই খুশী ছিলাম) আপনি আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা না দিয়ে অন্যদের দিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা সত্য বলেছ। অতঃপর তাদেরকে অন্যান্যদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করান হবে। হিসাব-নিকাশের কাঠিন্যতা আরোপিত হবে ধনী ও ক্ষমতাশালীদের উপর।

সাহাবী(রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনগণ সেদিন কোথায় থাকবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, তাদের জন্য নূরের আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের ওপর পাহাড়ের চেয়েও বড় আকারে মেঘমালার ছায়া তৈরি করে দেয়া হবে। ঐ দিনটি ঈমানদারদের জন্য দিনের একটি ছোট অংশের চেয়েও কম হবে। —তাবরানী, ইবনে হেববান, ও আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে মহিলা ও ধনাঢ্য লোক

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে অধিকাংশই হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবী লোক। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে অধিকাংশ হচ্ছে মহিলা।

—বোখারী, মুসলিম।

আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানে উচ্চ মর্যাদার লোক হচ্ছে গরীব মুহাজিরগণ এবং মুমিনদের নাবালক সন্তানগণ। আর জান্নাতে ধনাঢ্য লোক ও মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম। এ সময় আমাকে বলা হল, জান্নাতের দুয়ারে ধনাঢ্য লোকদের হিসাব-নিকাশ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে পাক পবিত্র করা হচ্ছে। আর পার্থিব জীবনে মহিলাগণকে স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক (আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর দ্বীন থেকে) অমনোযোগী করে রেখেছিল (এ কারণে জান্নাতে তাদের সংখ্যা কম)।
—ইবনে হেব্বান, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

ধন-সম্পদ হচ্ছে বিরাট এক বোঝা ও শাস্তির বস্তু —একথা স্মরণে রেখে, বৈধ পথে তা উপার্জন করা এবং তা থেকে আল্লাহ তাআ'লা ও বান্দার হক আদায় করা, আর গুনাহের কাজে ব্যয় না করা খুবই কঠিন কাজ। এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোকই ব্যর্থ হয়। ধন-সম্পদ হলে নিজের ইচ্ছায় বা সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সমাজের রসম-রেওয়াজের বশঃবর্তী হয়ে গুনাহের কাজে তা

ব্যয় করে। অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই হিসাব মত যাকাত আদায় করে না। যাদের প্রতি হজ্জ ফরজ হয়েছে, এমন হাজার হাজার লোক তা আদায় না করেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পাপার্জনের জন্য বহু স্থান রয়েছে, যাতে তারা অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং জাহান্নামে ধনীদের সংখ্য বেশি হওয়া এবং হিসাবের কারণে জান্নাতে যেতে বাধাগ্রস্ত হওয়া কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণ ইতিপূর্বের হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করে পরকালের কথা ভুলে যাওয়া এবং এবাদত-বন্দেগী হতে গাফেল হওয়া। নারীগণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে হারাম পন্থায় রোজগার করতে, ঘুষ খেতে, ঋণ করতে বাধ্য করে থাকে। আর সেসব পোশাক ও অলংকার পরিধান ও প্রদর্শনী করে বেড়ায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই পোশাক পরিধান করতে লজ্জা অনুভব করে। গলায় কণ্ঠহার পরিধান করে, গরমের অজুহাত দেখিয়ে গলা ও বুক উলংগ করে বেড়ায়। কোন কোন সময় অলংকারের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করে। নিজের অলংকার খুব চমৎকার হওয়ার জন্য গৌরবও করে। নিজের অলংকারের প্রদর্শনী করে বেড়ানো বিরাট গুনাহের কাজ। নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে মহিলা অপরকে প্রদর্শনীর জন্য অলংকার পরিধান করে, সে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে। —আবু দাউদ, নাসাঈ, মেশকাত।

যে অলংকার হারাম উপার্জনের অর্থ দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, তা শাস্তির কারণ হওয়া সুস্পষ্ট। কিন্তু হালাল উপার্জন দ্বারা যে অলংকার ক্রয় করা হয়, তার যাকাত যেমন সে মহিলা আদায় করে না, অনুরূপ তার স্বামীও আদায় করে না। যে সম্পদে যাকাত দেয়া হয় না, পরকালে তা শাস্তিতে রূপান্তরিত হবে। সহীহু বোখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে,

নারীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা বেশি হবে কেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, কারণ তোমরা কথায় কথায় খুব অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হও। —বোখারী, মুসলিম।

জান্নাতীদেরকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদেরকে জান্নাত দেখান হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে জাহান্নামের সে স্থানটি দেখান হবে, যে স্থানটি খারাপ আমল করার কারণে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কারণ এটা করা হলে তারা খুব বেশি বেশি শোকরিয়া আদায় করবে। আর যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও জান্নাতের সে স্থানটি দেখানো হবে যে স্থানটি পুণ্যময় আমল করার কারণে তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এতে তারা খুব বেশি অনুশোচনা করবে ও মনে কষ্ট পাবে। —বোখারী, মেশকাত।

জান্নাত ও জাহান্নাম দু'টোই পরিপূর্ণ করা হবে

শেষ বিচারের পর আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত ও জাহান্নামের কোন স্থান খালি রাখবেন না, দু'টোই পুরোপুরিভাবে ভর্তি করা হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَئْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ *

"যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ ? সে বলবে, আরো কিছু আছে কি ? —সূরা ক্বাফ– ৩য় রুকু।

হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে, আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও আছে কি ? অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা তার কুদরতী পা জাহান্নামের উপর রাখলে জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে, আর বলবে আপনার ইজ্জত ও সম্মানের কসম! আমার যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু জান্নাতীদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরও জান্নাতের অনেক স্থান খালি থাকবে। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লা নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে খালি জায়গায় তাদেরকে বসবাস করতে দেবেন। —বোখারী, মেশকাত।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআ'লা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কে পুরোপুরিভাবে ভর্তি করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। —বোখারী, মুসলিম।

জাহান্নামের কোন স্থান খালি থাকলে তা পূরণ করার জন্য নতুন কোন মাখলুক সৃষ্টি করা হবে না। কেননা সে মাখলুক তো হবে নিরাপরাধী। বোখারী মুসলিম) কিন্তু জান্নাতের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে সেখানে তাদেরকে বসবাস করতে দিয়ে আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

আমাদের জনৈক বুযুর্গের কাছে এক লোক বলল, তারাই তো খুব আনন্দ লাভ করবে, যারা সৃষ্টি হওয়ার পরপরই জান্নাতে যাবে। বুযুর্গ ব্যক্তি বললেন, তারা কোনই আনন্দ পাবে না। কারণ দুনিয়ায় এসে তারা কোন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি। সুখ-শান্তির স্বাদ তারাই অনুভব করে, যারা দুঃখ করার পর সুখ ভোগ করে।

হাশর দিবসের স্থায়ীত্ব

হাশর বা শেষ বিচারের দিনটি হবে খুবই দীর্ঘ। হাদীসে বলা হয়েছে, কেয়ামতের স্থায়িত্বের পরিমাণ হবে (পার্থিব দিবসের) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (মুসলিম) অর্থাৎ প্রথমবার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হতে শুরু করে জান্নাতীদের জান্নাতে গমন এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে পৌঁছা পর্যন্ত সময়টি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের দীর্ঘ কাল। সুবহানাল্লাহ! কত বড় দিন। সেখানে থাকবে না কোন ঘরবাড়ি, থাকবে না পাহাড়-পর্বত, থাকবে না কোন গাছপালা। সূর্য হবে অতি

নিকটবর্তী। প্রচণ্ড গরমের কারণে দেহ থেকে ঘামের স্রোত বের হবে। সেদিনটি সম্পর্কে চিন্তা করার লোক কোথায়? আরশের ছায়ায় স্থান গ্রহণের জন্য বেশি বেশি নেক আমল করা প্রয়োজন। সেদিন যারা আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে, তাদের তালিকা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের এত বড় বিরাট দিনটি কাফেরদের জন্য খুব কঠিন ও দুঃখময় হয়ে দাড়াবে। কিন্তু মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা সে দিনকে খুব সহজ করে দিবেন।

কেয়ামতকে মুমিনদের জন্য সহজকরণ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে কিভাবে দণ্ডায়মান থাকা যাবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

অর্থাৎ সেদিন মানুষ সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআ'লার জন্য দণ্ডায়মান থাকবে। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, মুমীনদের জন্য এদিনকে এমনভাবে সহজ করে দেয়া হবে যে, দিনটি এমনভাবে অতিবাহিত হবে, যেন এক ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় করছে। —বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আরো বলেন, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে সে দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যে দিনের স্থায়িত্ব হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। বলা হয় এত বড় বিরাট দিন কোথায় কিভাবে হবে এবং কিভাবে অতিবাহিত হবে? উত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, সে মহান সত্তার নামের শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। নিঃসন্দেহে সে দিনটি মুমিন লোকের জন্য এত সহজ হবে যে, দুনিয়ায় যে ফরয নামায আদায় করা হত, তার চেয়েও হালকা ও ক্ষণস্থায়ী হবে। মুমিনদের জন্য এত বড় দিনটি খুব সহজেই অতিবাহিত হয়ে যাবে।

মউতের মৃত্যু

কাফের মুশরেক ও মুনাফেকগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। সেখানে তারা কখন মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাদের শাস্তিও কিছুমাত্র হালকা করা হবে না। যেমন সূরা ফাতির এ বলা হয়েছে—

"যারা কাফের তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের প্রতি আদিম ফয়সালা আরোপ হবে যে, তারা মৃত্যুবরণ করবে, না তাদের উপর হতে শাস্তি কিছুমাত্র লাঘব করা হবে। আমি প্রত্যেক কাফের ব্যক্তিকে এভাবেই প্রতিদান দেব।" —সূরা ফাতির, ৪র্থ রুকু।

যেসব গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে যাবে, তাদের শাস্তিভোগের মেয়াদ পূরণ হওয়ার পর অথবা শাফায়াত দ্বারা তারা মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে প্রবেশ করার পর সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। জান্নাতে কারো মৃত্যু ঘটবে না এবং সেখান থেকে কাউকে বের করা হবে না, আর কেউ বের হতেও চাইবে না। আল্লাহ বলেন ঃ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا "তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে, সেখান থেকে তাদেরকে কখন বহিস্কার করা হবে না।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে, তখন মউতকে উপস্থিত করা হবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এনে জবাই করা হবে। অতঃপর একজন ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে বলবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।। হে জাহান্নামীগণ! তোমাদেরও আর কোন মৃত্যু নেই। এ ঘোষণায় জান্নাতীদের মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাবে, আর জাহান্নামীরা মর্মজালা অনুভব করবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা মরিয়মের আয়াত وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় বলেন, মউতকে দেহাকৃতি দান করে উপস্থিত করা হবে। তখন তা দেখতে মনে হবে যেন তা একটি সাদা দুম্বা, যার দেহে কালো দাগও থাকবে। তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান করানো হবে। অতঃপর জন্নাতীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তা শোনে তখন তারা মাথা উত্তোলন করে তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলা হবে হে জাহান্নামীগণ! তখন তারাও মাথা উত্তোলন করে তাকিয়ে দেখবে। অতঃপর জাহান্নামীগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি এ প্রাণীটিকে চেন? জওয়াবে তারা বলবে, হ্যাঁ চিনি– এ হচ্ছে মউত। এর পর সকলের সম্মুখে প্রাণীটিকে শোয়ায়ে জবাই করা হবে, যাতে সবাই জানতে পারে যে, আর কখনো কারো মৃত্যু হবে না। তখন জান্নাতীগণ খুবই খুশী হবে এবং তাদের মনে খেলতে থাকবে আনন্দের ঢেউ। আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাতীগণ চিরঞ্জীব হওয়ার ফয়সালা না থাকলে জান্নাতীগণ তখন অত্যধিক খুশীর কারণে মারা যেত। আর জাহান্নামীগণ চিরজীবন জাহান্নামে অবস্থানের ফয়সালা না থাকলে, অত্যধিক শোকে-দুঃখে তারাও মারা যেত।
—তিরমিযী।

আরাফের অধিবাসী

জান্নাত এবং জাহান্নামবাসীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি প্রাচীর থাকবে। সে প্রাচীর অথবা তার উপরিভাগের নাম হচ্ছে আরাফ। আরাফের সে স্থানে অস্থায়ীভাবে সেসব মুসলমানকে রাখা হবে, যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান

সমান হয়েছে। আরাফের উপর হতে তারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে দেখতে ও চিনতে পারবে। আর সেখানে অবস্থান করে উভয় দলের সাথেই তারা কথাবার্তা বলবে। এ বিষয়ে সূরা আরাফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

"আর এ উভয় দলের মধ্যখানে একটি প্রাচীর থাকবে। (এ প্রাচীর বা এর উপরিভাগকে আরাফ বলা হয় এবং সেখান থেকে সব জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে দেখা যাবে।) অনেক লোক সে আরাফের উপর অবস্থান করবে। (যাদের নেকী বদী সমান সমান হবে) তারা প্রত্যেক দলের লোককে (অর্থাৎ জান্নাতী ও জাহান্নামীগণকে) তাদের ললাটের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। (সে নিদর্শন হল জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে নূরের বিকাশ, আর জাহান্নামীদের মুখমণ্ডলে কালো অন্ধকারের বিকাশ।) আরাফের অধিবাসীরা জান্নাতীগণকে ডেকে বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অথচ তারা এখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি বরং প্রবেশের আশা পোষণ করছে। পরে তাদের আশা পূরণ করা হবে।

—সূরা আরাফ– ৫ম রুকু।

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন– "আর যখন আরাফবাসীর দৃষ্টি জাহান্নামীদের প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! জালেম সম্প্রদায়ের (কাফের মুশরেক ও মুনাফেকদের) সাথে শাস্তিতে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবেন না।" —সূরা আরাফ– ৫ম রুকু।

উক্ত সূরায় আল্লাহ তাআ'লা আরাফবাসীগণ কর্তৃক জাহান্নামীদেরকে ভর্ৎসর্না করার আলোচনায় বলেছেন। "আর আরাফের অধিবাসীগণ (জাহান্নামের) সেসব লোকদেরকে উচ্চস্বরে ডাকবে, যাদেরকে তারা ললাটের নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবে। তাদেরকে বলবে, তোমাদের বিরাট দলীয় আধিপত্য এবং তোমরা যে নিজদেরকে খুব বড় মনে করতে তা আজ কোনই কাজে আসল না। এখন ঐ সব (জান্নাতীদের প্রতি) লক্ষ্য কর, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে, তারা কক্ষনই আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারবে না। (অথচ তাদেরকে বলা হয়েছে) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই, শঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। —সূরা আরাফ– ৬ষ্ঠ রুকু।

জান্নাত ও জাহান্নামকে আল্লাহ তাআ'লা নির্ধারিত করে রেখেছেন। মানুষের আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য । জান্নাতে প্রবেশ করাই হল মানব জীবনের আসল সাফল্য। আর জাহান্নামে যাওয়া হচ্ছে আসল ক্ষতি ব্যর্থতা ও। এরচেয়ে বড় ক্ষতি ও ব্যর্থতা আর কিছুই থাকতে পারে না। এ পার্থিব জগতে মানুষ সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি ও সাফল্যজনক জীবন যাপনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে, আর বিভিন্ন কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য হাসি মুখে বিরাট বিরাট বিপদ ও দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেয়। আল্লাহ তাআ'লা মানুষকে তাঁর নবী-রাসূল এবং

কিতাবের মাধ্যমে হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ, বিচার-ফয়লাসা, মিযান ও পুলসেরাত, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, আসল লাভ-লোকসান এবং বাস্তব ও মূল সাফল্য কোথায় ও কি কি কাজে নিহিত সে সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

পুণ্য ও নেক আমলের প্রতিদান এবং বদ আমল ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে সংক্ষেপ ও বিশদভাবে অবহিত করে পুণ্যময় কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত ও তা'কিদ করা হয়েছে। দুনিয়ায় প্রত্যেক মানুষই বিভিন্ন কাজে পরিশ্রম ও চেষ্টা-তদবীর করে থাকে। পুণ্যময় ও খারাপ সব কাজেই তারা প্রচেষ্টা চালায়, জান-মাল ও সময় ব্যয় করে। যারা জীবনের সর্বোত্তম পুঁজি জান ও মালের সম্পদকে জাহান্নামের কাজে ব্যয় করে সর্বাধিক ক্ষতিকে গ্রহণ করে নেয়, তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা আর কেউ নেই। সবাকেই মরতে হবে, কিন্তু যারা জান্নাত লাভের জন্য জীবিত থাকে ও জীবন দান করে, সে-ই হল সফলকাম। সে-ই জীবনকে সঠিক মূল্যায়ন করে আসল লক্ষ্যবিন্দুতে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে-ই সাফল্য লাভ করেছে। পার্থিব জীবন প্রতারণাময় সম্পদ ছাড়া আর কিছু নয়।"

—সূরা আল ইমরান– রুকু ১৯।

আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আদম ও (আ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, যে আমার হেদায়েত ও পথ প্রদর্শন অনুযায়ী চলবে সে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ব্যর্থ ও দুর্ভাগা হবে না। তিনি এও বললেন, যারা আমার বিধান অনুসরণ করে চলবে তাদের জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিত ও দুঃখিতও হবে না। কিন্তু যারা আমার বিধান ও হেদায়েতকে মিথ্যা মনে করবে এবং অস্বীকার করবে, তারা হবে জাহান্নামী, তাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সূরা ত্বাহার সপ্তম রুকুতে এবং সূরা আলে ইমরানের চতুর্থ রুকুতে এ ঘোষণা বিদ্যমান।

যারা দুনিয়ার জীবনে এ ঘোষণাকে সঠিকভাবে কান দিয়ে শুনেছে এবং আল্লাহ তাআ'লার বিধানকে অনুসরণ করেছে। নিঃসন্দেহে এখানে সে কখনো বিভ্রান্ত হবে না এবং পরকালেও ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর বিধানকে অলীক ও মিথ্যা মনে করে। সে জাহান্নামে পৌঁছেই নিজের কর্মের প্রতিদান লাভ করবে।

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

চক্ষুসমানদের জন্যই রয়েছে সফলতা

সুধী পাঠক মণ্ডলী! এ গ্রন্থ দ্বারা পরকাল ও কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হয়েছেন। কিন্তু অবগত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, এ থেকে শিক্ষা ও নসীহত গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। সাধারণত দেখা যায় যে, মানুষ শুধু জ্ঞান লাভের জন্যই পুস্তক অধ্যয়ন করে। তার বিষয়বস্তু আমল করার প্রতি তাদের কোন মনোযোগ থাকে না। অথচ অমনোযোগিতা ও পাপাচার হচ্ছে ধ্বংসে পথ। পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটি কিভাবে কাটবে সে বিষয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। সেদিন নিজে নিজে লজ্জিত হবে, কর্মের হিসাব নিকাশ হবে, আমল ওজন হবে, কাউকে ডান হাতে এবং কাউকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সূর্য অতি নিকটবর্তী হবে, আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটবে, পাহাড়-পর্বত, ধুনা তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে, দালান-কোঠা, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিলীন হবে। কেবল দেখা যাবে বালুকাময় ময়দান। মানুষ বলতে থাকবে— বাঁচাও, বাঁচাও। নিকটাত্মীয়গণ একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে। মানুষের পাওনা ঋণ ও যাবতীয় হক পূণ্য দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবে তারা জান্নাতী হবে। আর যারা বাম হাতে আমলনামা লাভ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। এসব অবস্থাসমূহ সামনে রেখে এ পুস্তক বারবার অধ্যয়ন করা উচিত, যাতে বিশদভাবে বিবরণটি উপলব্ধি করা যায়। নিজেরা পাঠ করবেন এবং পরিবারের লোকজনদেরকে সমবেত করে আলোচনা করবেন, বিভিন্ন মজলিস-মাহফিল ও বৈঠকে পাঠ করে শুনাবেন। তবে পুস্তক পাঠের অন্তরালে থাকবে নসীহত গ্রহণ করা। বারবার চিন্তা করবেন যে, আমরা জীবনের গাড়িটি যে অবস্থায় পরিচালিত করছি, পরকালে নাজাত লাভের জন্য সে অবস্থা যথেষ্ট কি না ? নিজের বর্তমান আমলের বদৌলতে কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করতে পারব কি না ? আমরা কি হাউজে কাওছারের কাছে উপনীত হবার এবং রাসূলে করীম (স)-কে মুখ দেখাবার যোগ্য হতে পেরেছি ? অল্প-বেশি যা কিছু পুণ্য লাভ করেছি, তা জুলুমের কারণে বা অন্যের পাওনা পরিশোধ করণে শেষ হয়ে নিজে শূন্য হাতে দন্ডায়মান থাকি কি না সে ব্যাপারটাও চিন্তা করা উচিত।

কেউ হয়ত দুনিয়ায় বিচারক পদে আছেন, কেউ সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট পদে অধিষ্ঠিত, কেউ চীফ জাস্টিজ, হাই কোর্টের বিচারক। এরা সবাই সরকারী কর্মচারী। মানুষের রচিত ও প্রণীত অনৈসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করেন। আর শরীয়তের আইনকে রাখেন দূরে সরিয়ে। সুখানন্দ অনুভব করে স্বদেশ, সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত গোড়ামীর দৃষ্টিকোণে অত্যাচারমূলক বিচার

করেন। স্বদেশ, নিজ সম্প্রদায় ও একই ভাষাভাষী হওয়ার কারণে মজলুমের বিপক্ষে জালেমের পক্ষে রায় ঘোষাণা করে বিচারকগণও জুলুমের অংশীদার হয়ে মজলুমের উপর অধিক জুলুম চালায়। মিথ্যা দাবী ও অপবাদকে ভিত্তি করে শাস্তি দেয়। এসব জুলুমের পরিণতি পরকালে কি হবে ? এসব বিষয় রাজা, বাদশাহ্, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী কেউ কোনই লক্ষ্য করেন না। শাসক ও বিচারকদের সামনে হাত কড়া দিয়ে মানুষকে উপস্থিত করা হয়। দুনিয়ার বহু বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করে, কিন্তু নিজের বিচার ফয়সালার ব্যাপারে থাকেন সম্পূর্ণ উদাস। প্রতিদান দিনের মহাবিচারকের সম্মুখে রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, জালেম-মজলুম সবাইকেই দণ্ডায়মান হতে হবে। সেখানে সূক্ষ্মভাবে ন্যায় বিচার করা হবে। যারা দুনিয়াতে অনৈসলামী বিচার-ফয়সালা করে সুখ গ্রহণ করেছেন, জালেমগণকে মামলায় জিতিয়েছেন, মহা বিচারের দিন এসব বিচারকেরও বিচার করা হবে। যেসব মজলুম লোকের বিপক্ষে রায় দেয়া হয়েছে, সেদিন তাদের অনেকেই হয়ত মুক্তি লাভ করবে। আর বিচারকগণের হাতে পড়বে সেদিন লোহার কড়া।

দেশে বিভিন্ন পদের জন্য নির্বাচন হয়, গীবত শেকায়েত চলতে থাকে অবাদে। একে অপরের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে বেড়ায়। পত্রিকার অফিসে বসে নানা প্রকার মিথ্যা খবর রচনা করে তা প্রকাশ করা হয়। বিরোধী পক্ষকে এবং তাদের সহযোগীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। এসব জুলুমের পরিণতির ফল পরকালে কি হবে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্য, সুমিষ্ট মিথ্যা স্বার্থ খুবই পছন্দনীয় ও প্রভাবিত বিষয়। অন্যায়ভাবে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করে পত্র পত্রিকায় ছবি প্রকাশ করে, রেডিও-টিভিতে সাক্ষাৎকার দান করে মনে করে যে, আমি খুবই সফল হয়েছি, আমার জীবনটি খুবই সার্থক। এহেন পার্থিব সাফল্যের ধোঁকায় তারা পরকালের হিসাব প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর থাকে। নিজের সন্তানদেরকেও গুনাহের পথে পরিচালিত করে। তারা যেন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ বিলাসে অচেতন ও বেহুঁশ হয়ে আছে। মৃত্যুর পরের শাস্তির জন্য যেন নিজেকে ও সন্তানদেরকে প্রস্তুত করে রাখছে। অন্যায় ও পাপাচারী পন্থায় অর্জনকৃত ধন-সম্পদ, পদ, যশখ্যাতি এবং মানুষের উপর কৃত জুলুম-অত্যাচার, অবিচার, পরকালে যখন শাস্তির রূপরেখায় প্রকাশ পাবে, তখন তারা বলবে- مَا أَغْنَى عَنِّيْ مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَةَ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না, আমার রাজত্ব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সবই বিফল হল।

এ দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে করুন, তা হলে পরকালেও নিজের হিসাব নিজে করতে পারবেন। আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার কণ্ঠহার বানিয়ে রেখেছি। মহাবিচারের দিন তার আমলনামা (কর্ম তালিকা) তার জন্য তারই সম্মুখে খুলব। তখন সে তা খোলা অবস্থায় দেখবে। তাকে বলা হবে তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজকের দিনে তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট।

যে লোক এ দুনিয়ায় নিজের হিসাব নিজে করেছে, পরকালে তার হিসাব হবে সহজ। কেননা যে ব্যক্তি এখানে নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ করে, সে গুনাহের কাজ বর্জন করতে থাকবে। ফরজ ও ওয়াজিব কর্মসমূহ খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করবে। আর অধিক মাত্রায় নফল এবাদতে থাকবে নিমগ্ন। পুণ্যময় কর্মের অভাবে পরকালে মানুষ কঠিন বিপদগ্রস্ত হবে। অতএব পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটির কথা একটু ধ্যান করুন। সে দিনের অবস্থার কথা স্মরণ করুন। নিজের অবস্থা ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করুন। তারপর বিচার করুন আমাদের জীবনটি কি সাফল্যময় জীবন, না পরকালে কঠিন শাস্তির পতিত জীবন? ? বারবার হিসাব করুন এবং চিন্তা করুন। মনকে একটু ঝাঁকি দিয়ে তার কাছে জিজ্ঞেস করুন আগামী পরকালের জন্য আপনি কি প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখানে যদি নিজের হিসাব নিজে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে মনকে বুঝিয়ে গুনাহের কর্ম থেকে তাওবা করাতে পারেন এবং বার বার তাওবা ও গুনাহের কাজ বর্জন করতে থাকেন, আর আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করতে থাকেন। তাহলে আশা করা যায় যে, পরকালে মহাবিচারের দিন আপনি সাফল্য লাভ করবেন। আর দয়াময় আল্লাহ তাআ'লা বিনা হিসাবে অথবা সহজ হিসাবের পর জান্নাতে পাঠাবেন।

কিন্তু যদি অমনোযোগী হন, নফসকেই আপনার পরিচালক মনোনীত করেন এবং নফসের কথামত চলেন, তাহলে কেয়ামতের দিন সাফল্যের আনন্দ ও স্বাদ শাস্তির আকারে প্রকাশ পাবে। সচেতন মানুষ তারাই, যারা মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য চিন্তা-ফিকির করে। নফসের আবেদন ও আহবানকে পদদলিত করে গুনাহের কর্ম থেকে দূরে থাকে। আর নফসকে পুণ্যময় কর্মে অভ্যস্ত করে তোলে। খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন, চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে মুসলমানের চরিত্র। অমোনযোগী হওয়া, গাফেল হওয়া ও পাপাচারে লিপ্ত থাকা মুসলমানের কাজ নয়। নিজকে ও পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অনলকুণ্ড হতে বাঁচান। যার মন আছে এবং সঠিকভাবে কান দিয়ে শুনেন, তার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এতেই সে নসীহত গ্রহণ করে, নিজের জীবনকে পরকালমুখী করে তুলবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

তৃতীয় অধ্যায়

আহ্ওয়ালে জাহান্নাম বা দোযখের জীবন

দোযখের গঠন প্রকৃতি ও অবস্থার বিবরণ

দোযখের গভীরতা ঃ

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দোযখের গভীরতা সম্পর্কে বলেছেন, একটি পাথর যদি দোযখের উপর থেকে ছাড়া হয়, তবে তা দোযখের তলদেশে পৌঁছাতে (গড়াতে গড়াতে) সত্তর বছর অতিবাহিত হবে।

—ইবনে হেব্বান, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু হোবায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় একটি বস্তু পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা কি জান এ শব্দটি কিসের? আমরা বললাম, আল্লাহ্ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে একটি পাথর নিক্ষেপের শব্দ। এ পাথর আল্লাহ্ তাআ'লা দোযখের মুখ থেকে তার তলদেশে পতিত হওয়ার জন্য ছেড়েছেন। এটি সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে এখন দোযখের তলদেশে পৌঁছেছে, আর এ শব্দটি সেই পাথর নিপতিত হওয়ারই শব্দ। —মুসলিম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

দোযখের প্রাচীর ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, চারটি প্রাচীর দ্বারা দোযখ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। এ প্রাচীরগুলোর প্রত্যেকটির প্রশস্ততা হচ্ছে চল্লিশ বছর পথ চলার দূরত্বের পরিমাণ। —তিরমিযী, মেশকাত।

অর্থাৎ দোযখের প্রাচীরগুলো এত মোটা ও প্রশস্ত যে, তার প্রশস্ততা অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়।

দোযখের দরজাসমূহ ঃ

দোযখের দরজার বর্ণনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ *

"তাদের জন্য এমন দোযখের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, যার বিরাট বিরাট সাতটি দরজা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি দরজায় তাদের জন্য বণ্টনকৃত স্বতন্ত্র অংশ রয়েছে।" —সূরা হিজর– ৩য় রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। তার মধ্যে একটি দরজা হচ্ছে তাদের জন্য, যারা আমার উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

—সুনানে তিরমিযী।

দোযখের স্তর ঃ

কোরআন মজীদের পূর্বে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দোযখের সাতটি দরজা রয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বয়ানুল কোরআনের লেখক বলেন, কোন কোন তাফসীরকারকের মতে সাতটি দরজা দ্বারা সাতটি স্তরের কথা বুঝান হয়েছে। সে স্তরগুলোতে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিদ্যমান। যে লোক যে ধরনের শাস্তির যোগ্য হবে, তাকে সে স্তরে প্রবেশ করান হবে। যেহেতু প্রত্যেক শ্রেণীর দরজা পৃথক পৃথক, এ কারণে সাত দরজার ব্যাখ্যায় সাত স্তর বলা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারকের মতে— সাত দরজাই মর্মার্থ। উদ্দেশ্য হচ্ছে— দোযখে বিপুল পরিমাণ লোক প্রবেশ করবে, সে কারণে একটি দরজা যথেষ্ট নয়, তাই সাতটি দরজা নির্মাণ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) হযরত আলী (রা)-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি সাতটি দরজা সম্পর্কে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, দোযখের দরজাগুলো এভাবে অর্থাৎ উপরে নীচে বিন্যস্ত। ইবনে কাছীর হযরত আকরামা (রা)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সাত দরজা দ্বারা সাতটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, দোযখের নীচে ও উপরে সাতটি স্তর বা তলা রয়েছে এবং প্রত্যেক স্তরের জন্য রয়েছে, আলাদা আলাদা দরজা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *

অর্থাৎ মুনাফেকরা থাকবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। এ আয়াতে প্রকাশ পায় যে, দোযখে বিভিন্ন স্তর থাকবে। তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় দোযখের সাতটি স্তরের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন (১) জাহান্নাম (২) লাজা (৩) হুতামা (৪) সাঈর (৫) সাকার (৬) জাহীম (৭) হাবীয়া। তাফসীরে দুররে মানছুরে ইবনে জারীজ থেকে এরূপ ক্রমিককেই উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা সা'বী তার তাফসীরে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় দোযখের স্তরসমূহের এভাবে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে সাথে সাথে প্রত্যেক স্তরের লোকদেরকেও চিহ্নিত করছেন। তিনি লেখেছেন ঃ (১) গুনাহগার মুমিনগণের জন্য হচ্ছে দোযখ (২) নাসারাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য হচ্ছে লাজা (৩) কাফের ইহুদীদের জন্য হচ্ছে হুতামা (৪) সায়েবীনদের জন্য সাঈর (৫) অগ্নিপূজকদের জন্য সাকার (৬) মুশরেকদের জন্য জাহীম আর (৭) মুনাফিক এবং ফেরআউন ও তার বাহিনীর জন্য হচ্ছে হাবীয়া দোযখ।

কোন কোন সুধীজন উপরোক্ত স্তরসমূহে যারা প্রবেশ করবে, তাদের চিহ্নিত করেনে অন্য অভিমতও উল্লেখ করেছেন। তাই তাফসীরে রুহুল মায়ানী গ্রন্থকার لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ (আর প্রত্যেক দরজায় তাদের জন্য নির্ধারণকৃত অংশ রয়েছে।) আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এসব স্তরে অধিবাসীদেরকে চিহ্নিতকরণে অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান, যেরূপ স্তরগুলোর ধারাবাহিকতা নিয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান।

এসব স্তরের ধারাবাহিকতা এবং অধিবাসীদের চিহ্নিতকরণের উপর শরীয়তের কোন বিধান নির্ভর করে না। সুতরাং এজন্য খুব ঘর্মাক্ত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। দোযখের প্রত্যেক স্তরেই রয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি। তা যে কোন রূপরেখাতেই হোক না কেন। আমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে দোযখের এসব স্তরে প্রবেশ হওয়া থেকেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

দোযখের আগুন ও অন্ধকার ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখকে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তার আগুন লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তার আগুন কালো বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং দোযখের আগুন বর্তমানে কালো বর্ণের অন্ধকার রাতের মত। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, দোযখের আগুনের শিখায় কোন উজ্জ্বলতা বা আলো নেই। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা যে আগুন বর্তমানে জ্বালাচ্ছ, তা হচ্ছে দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ বললেন, জ্বালানোর জন্য তো এটাই যথেষ্ট, তারপরও এত বেশী তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমাদের কথা বাস্তব। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার আগুনের তুলনায় দোযখের আগুনের তেজ ও গরমী উনসত্তর ভাগ বেশী। —বোখারী, মুসলিম।

দোযখের শাস্তির অনুমান ঃ

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে সে ব্যক্তির শাস্তি হবে সবচেয়ে অল্প ও হালকা, যাকে আগুনের এক জোড়া জুতো আগুনের ফিতাসহ পড়ান হবে। যার ফলে পাতিলে পানি টগবগ করার ন্যায় তার মাথার মগজ টগবগ করে বিগলিত হয়ে ঝরতে থাকবে। আর সে ব্যক্তি মনে করবে যে, আমাকেই বুঝি সর্বাধিক শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ তার শাস্তি হবে সবচেয়ে কম। —মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন এমন এক দোযখীকে ধরে একবার দোযখে ঝুকানো হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সবচেয়ে অধিক আরাম ও ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন ছিল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন নেয়ামত (শান্তির বস্তু) দেখেছ? তোমার কি কখনো শান্তি লাভের সৌভাগ্য হয়েছে? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে কসম করে বলছি, আমি কক্ষনো শান্তি পাইনি। অতঃপর নবী করীম (সঃ) বললেন, কেয়ামতের দিন এমন এক জান্নাতীকে ধরে জান্নাতের উপর ঝুকানো হবে, যে দুনিয়ায় সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছ ? তোমার কি কখনো কঠিনতর দুঃখ বেদনার মধ্যে দিন কেটেছে? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামে শপথ করে বলছি, আমি কখনও বিপদের সম্মুখীন হইনি এবং কোন দুঃখ-বেদনার মধ্যেও আমার জীবন কাটেনি। —মুসলিম।

দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাস ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যখন খুব বেশি গরম অনুভব হবে তখন জোহর নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা গরমের প্রখরতা সৃষ্টি হয় দোযখের উত্তাপের ক্ষীপ্রতার কারণে। দোযখ তার প্রতিপালকের কাছে এ অভিযোগ করল যে, আমার উত্তাপ ও ক্ষীপ্রতা এমন বেড়ে গেছে যে, আমার কোন কোন অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আমার উত্তাপের প্রখরতা যাতে হ্রাস পায় সেজন্য আমাকে অবকাশ দিন। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা তাকে দু'বার শ্বাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। একবার শীতের মৌসুমে, আর একবার গরমের মৌসুমে শ্বাস ছাড়তে বললেন। সুতরাং তোমরা যে প্রচণ্ড গরম অনুভব কর, তা হচ্ছে দোযখের গরমের প্রতিক্রিয়া (যা শ্বাস ছাড়ার কারণে বাইরে আসে।) আর তোমরা যে খুব বেশি শীত অনুভব কর, তা হচ্ছে দোযখের ঠাণ্ডার প্রতিক্রিয়া।

—বোখারী, মুসলিম।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, প্রতিদিন দুপুরের সময় দোযখকে জ্বালিয়ে অগ্নিশিখায় পরিণত করা হয়।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, দোযখের শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে সৃষ্ট দুনিয়ার সাধারণ একটু শীত ও গরমও আমাদের সহ্য হয় না, আর দোযখের আসল দহন ও ঠাণ্ডাকে আমরা কিভাবে সহ্য করব? হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি! শিক্ষা গ্রহণ করবে কি ?

পরিতাপের বিষয়! মানুষ দুনিয়ার গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কতইনা প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু দোযখের দহন (গরম ও ঠাণ্ডা) হতে বাঁচার জন্য কিছুমাত্রও চিন্তা করে না।

দোযখের ইন্ধন বা জ্বালানী ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ، وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ *

"হে ঈমানদারগণ! দোযখের আগুন থেকে নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে নিরাপদ রাখ। যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।"

—সূরা তাহরীর- ১ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে পাথর দ্বারা কি বুঝান হয়েছে সে সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যে পাথর দোযখের ইন্ধন বা জ্বালানী হবে, তা হচ্ছে গন্ধকের পাথর। সে পাথর আল্লাহ তাআ'লা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনে নিকটবর্তী আকাশে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এ পাথর কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। —হাকেম, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

এ পাথর ছাড়াও সেসব পাথরমূর্তিকে দোযখের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হবে, যেগুলোকে কাফেরগণ পূজা-অর্চনা করত। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ *

"হে মুশরিকগণ! অবশ্যই তোমরা এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের পূজা করতে সেসব মা'বুদ সবাই দোযখে প্রবিষ্ট হবে।"—সূরা আম্বিয়া –শেষ রুকু।

দোযখের লাগাম ও তা টানার ফেরেশতা ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন– "রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখকে সেদিন উপস্থিত করা হবে, যার সাথে থাকবে সত্তর হাজার লাগাম। আর প্রত্যেক লাগামের জন্য সত্তর হাজার করে ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা তা টানতে থাকবে।" —মুসলিম।

আত্তারগীব অত্তারহীব গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মনে করুন ঐ সময় ফেরেশতাগণ যদি দোযখের রশি ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপীগণকে সে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেবে।

দোযখের সাপ ও বিচ্ছু ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে লম্বা গর্দান বিশিষ্ট উটের ন্যায় বিরাট বিরাট সাপ থাকবে। (তার বিষের তেজষ্ক্রিয়া এমন হবে যে,) কোন একটি সাপ দংশন করলে দোযখী ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষক্রিয়া অনুভব করবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় সামান সজ্জিত খচ্চরের ন্যায় দোযখে বিরাট বিরাট বিচ্ছু রয়েছে। (তার বিষক্রিয়াও এত বেশি যে,) কোন একটি বিচ্ছু দোযখের কাউকে দংশন করলে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকবে। —আহমদ, মেশকাত।

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ *

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে শাস্তির পর শাস্তি বাড়িয়ে দেব।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আগুনের সাধারণ শাস্তি ছাড়াও তাদেরকে বাড়তি এ শাস্তিও দেয়া হবে যে, তাদের দংশনের জন্য বিচ্ছু মোতায়েন করা হবে। এ বিচ্ছুগুলোর দাঁত হবে লম্বা লম্বা খেজুরের ন্যায়।

—আত্তারগীব অত্তারহীব, আবু ইয়ালা ও হাকেম।

দোযখে মোতায়েন ফেরেশতাদের সংখ্যা ঃ

দোযখের কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের সংখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থাৎ দোযখে উনিশ জন ফেরেশতা মোতায়েন

রয়েছে। এ উনিশ জন ফেরেশতার প্রধান হচ্ছেন মালেক ফেরেশতা বাকী আঠার জন হচ্ছেন অন্যান্য কর্মকর্তা। যদিও দোযখীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়ার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য উনিশ জন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে।

দোযখের কর্মকর্তা ফেরেশতাদের আলোচনায় আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "দোযখে খুব কঠিন (হৃদয়) সুদৃঢ় (দেহী) ফেরেশতা মোতায়েন করা হয়েছে– যারা আল্লাহ্ তাআ'লার কৃত কোন নির্দেশ অমান্য করে না, বরং যা নির্দেশ করা হয় তাই তারা কার্যকরী করে।" —সূরা তাহরীম – ১ম রুকু।

তাফসীরে বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার তাফসীরে দুররে মানছুরের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, দোযখে নিয়োজিত প্রত্যেক ফেরেশতা সমস্ত মানব ও জি্ন জাতির সমপরিমাণ শক্তির অধিকারী হবে।

দোযখের ক্রোধ, চিৎকার, উচ্চৈঃস্বর দোযখীদেরকে ডাকা এবং তাদেরকে সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করার বিবরণ

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি। সে প্রত্যাবর্তনের স্থানটি খুবই খারাপ। যখন তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার একটি বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে। তা এমনভাবে জ্বলে উঠবে যে, মনে হবে সে যেন গোস্সায় ফেটে পড়ছে। —সূরা মূলক–১ম রুকু।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (র) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখেন, হয় আল্লাহ্ তাআ'লা দোযখকে এমন উপলব্ধি ও ক্রোধ দান করবেন যে, বাস্তবিকই যারা আল্লাহর গজব ও শাস্তির যোগ্য, তাদের প্রতি তারও ক্রোধ সৃষ্টি হবে। অথবা উপরোক্ত আয়াতে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝান হয়েছে যে, মনে হবে যেন দোযখ ক্রোধে ফেঁটে পড়ছে। সূরা ফুরকানে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

"সে যখন দূর হতে তাদেরকে দেখবে, তখন সে ক্রোধে এতটা ক্ষেপে উঠবে যে, তারা দূর হতেই তার ক্রোধের শব্দ ও জ্বালাগ্নির আওয়াজ শুনতে পাবে। আর যখন তাদের হাত-পা বেঁধে একটি শেলে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা কেবল মৃত্যুকেই ডাকতে থাকবে।" —সূরা ফুরকান– ২য় রুকু।

দোযখ যখন দোযখীদের থেকে একশ বছরের দূরত্বে থাকবে, তখনই তাদের প্রতি তার দৃষ্টি পড়বে। দেখামাত্রই সে ঘুরপাক খেতে থাকবে এবং তার থেকে ক্রোধের শব্দ বের হতে থাকবে, যা দোযখীগণ শুনতে পাবে। আর সে দোযখে তাদেরকে ফেলার পর দুনিয়ায় যেমন কোন বিপদে পড়লে মানুষ বলে হায়! আমি যদি মরে যেতাম! এভাবে তারাও মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। বলবে, হায়! মৃত্যু কোথায়? আমাদের মৃত্যু হোক। আমরা এ দহন ও মর্মজ্বালা আর সহ্য করতে পারছিনা।

ইবনে আবু হাতেম (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) اذا راتهم আয়াতটি পাঠ করে দোযখের চোখ থাকার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। —ইবনে কাছীর।

দোযখ যদিও খুব খারাপ স্থান, তারপরও দোযখীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য খুব সংকীর্ণ স্থানগুলোতে রাখা হবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, প্রাচীরে যেভাবে লোহা পোতা হয়, অনুরূপভাবে দোযখীদেরকেও দোযখে ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি করে ভরা হবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

সম্পদ জমাকারীদেরকে দোযখের আহ্বান ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى *

"দোযখ ঐসব লোকদেরকে নিজেই আহবান করবে, যারা দুয়িায় সত্য গ্রহণ করা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং সত্য না মেনে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। আর যারা দুনিয়ায় ধন-সম্পদ জমা করে তা সংরক্ষণ করে রাখে ।"

—সূরা মাআ'রেজ– ১ম রুকু।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, জীবজন্তু যেমন খাদ্য সন্ধান করে তা গলধকরণ করে, অনুরূপভাবে দোযখও হাশর ময়দান হতে সেসব লোকদেরকে দেখে দেখে কুড়িয়ে নেবে, যাদের দোযখে যাওয়া নির্ধারণ হয়ে আছে।

এ আয়াতে সম্পদ জমাকারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র)এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সম্পদ জমাকরণ দ্বারা সেসব লোকদের কথা বুঝান হয়েছে, যারা সম্পদ জমাকরণে হালাল-হারামের প্রতি কোন দৃষ্টি রাখে না। আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে না। আব্দুল্লাহ ইবনে হাকীম (র) এ আয়াত পাঠ করার পর ভয়ের কারণে কখনো থলির মুখ বন্ধ করতেন না।

হাসান বসরী (র) বলেছেন, হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ তাআ'লার সতর্কবাণী শুনছ, তারপরও সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখছ?

—তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৪২১ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার দুনিয়ায় কোন ঘর থাকে না, সে ঘর নির্মাণ করে; যার মাল থাকে না সে মাল অর্জন করে। আর দুনিয়ার জন্য সে লোকই ধন-সম্পদ পূঞ্জীভূত করে রাখে, যার বুদ্ধিজ্ঞান বলতে কিছু নেই।

—আহমদ, বায়হাকী, মেশকাত।

সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস বায়হাকী (র) শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে মারফুউ সনদে উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কারো মৃত্যু হলে ফেরেশতাগণ বলে, এ লোক পরকালের জন্য কি পাঠিয়েছে। আর মানুষ বলে এ লোক দুনিয়ায় কি রেখে গেছে? —মেশকাত, বায়হাকী।

দোযখের একটি বিশেষ গর্দান ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন দোযখ হতে এমন একটি গর্দান বের হবে, যার দু'টি চোখ থাকবে। সে চোখ দ্বারা সে দেখবে। দু'টি কান থাকবে, যা দ্বারা সে শুনবে। আর একটি মুখ থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমি তিনজনকে শাস্তি দেয়ার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। তারা হল- (১) প্রত্যেক আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি (২) সেসব লোক যারা আল্লাহ তাআ'লার সাথে অন্য কাউকে অংশী সাব্যস্ত করেছে বা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। (৩) মূর্তি নির্মাণকারী বা জীবজন্তুর ছবি অঙ্কনকারী। —তিরমিযী, মেশকাত।

দোযখে কারো মৃত্যু হবে না এবং কারো শাস্তি লাঘবও হবে না ঃ

দোযখে কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ *

"তাদের উপর থেকে শাস্তি কিছুমাত্রও লাঘব করা হবে না। তাতে তারা নিরাশ অবস্থায় থাকবে।" —সূরা যুখরুফ- ৭ম রুকু।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا *

"তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালাও হবে না, যার ফলে তাদের মৃত্যু হয় এবং তাদের উপর থেকে দোযখের শাস্তি কিছুমাত্রও হালকা করা হবে না।"
—সূরা ফাতির- ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ দোযখে এমনটি হবে না যে, শাস্তিতে থাকতে থাকতে অবশেষে তাদের মৃত্যু হবে এবং শাস্তি হতে চিরমুক্তি পাবে। বরং সেখানে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট, বেদনা ও মর্মজ্বালার মধ্যেই তারা চিরকাল জীবিত থাকবে।

হাদীসে আছে, জান্নাতীরা সবাই জান্নাতে প্রবেশ করার পর এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছার পর যখন বাইরে আর কোন মানুষ থাকবে না, তখন দোযখ ও জান্নাতের মধ্যবর্তী প্রাচীরের উপর মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর ভেড়াটিকে জবাই করা হবে। তখন জনৈক ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা দেবে যে, হে জান্নাতীগণ! এখন থেকে তোমাদের আর কখনো মৃত্যু ঘটবে না, তোমরা চিরঞ্জীব। এ ঘোষণা শুনে জান্নাতীদের খুশী ও আনন্দের কোন সীমা থাকবে না। আর দোযখীদেরকেও অনুরূপভাবে ঘোষণা দিয়ে বলা হবে- এখন থেকে তোমাদের আর কখনো মৃত্যু ঘটবে না। এ ঘোষণায় দোযখীদের মনে দুঃখ ও বেদনার কোন অন্ত থাকবে না।

দোযখের আওয়াজ, আরো আছে কি ?

আল্লাহ তাআ'লা দোযখের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে বলেন ঃ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ *

"যেদিন আমি দোযখকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পরিপূর্ণরূপে ভর্তি হয়েছ ? তখন সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?" —সূরা কাফ- ৩য় রুকু।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখীদেরকে যতই দোযখে ফেলা হবে, দোযখ ততই বলতে থাকবে, আরো কিছু আছে কি ? সমস্ত দোযখীদেরকে ভর্তি করার পরও দোযখের উদর পূর্তি হবে না। অবশেষে আল্লাহ তাআ'লার কুদরতী পা দোযখের উপর রাখলে দোযখ সংকুচিত হয়ে যাবে আর বলবে, আপনার ইজ্জত ও দয়ার অসীলা দিয়ে বলছি, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।" —বোখারী, মুসলিম, মেশকাত।

ধৈর্যধারণেও শাস্তি হতে মুক্তি মিলবে না ঃ

দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে ধৈর্যধারণ করার পর আরাম ও শান্তি লাভ হয়। কিন্তু দোযখীরা ধৈর্যধারণ করলেও তাদের শাস্তি সামান্য পরিমাণে হ্রাস হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

"তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। অর্থাৎ এতে কোনই ফলোদয় পাবে না। তোমরা যেরূপ কাজ করতে তোমাদেরকে সেরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।"

—সূরা তুর- ১ম রুকু।

আগুনের স্তম্ভের মধ্যে আটক রাখা হবে ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন- "আল্লাহ তাআ'লার সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। সে আগুন অবশ্যই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে দীর্ঘকায় স্তম্ভসমূহে। —সূরা হামাযা।

দুনিয়াতে কারো দেহে আগুন লাগলে সে আগুন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই তার প্রাণ প্রদীপ নিভে যায়। কিন্তু দোযখে যেহেতু কারো মৃত্যু হবে না, তাই সমস্ত দেহ পোড়ানোর সাথে সাথে আগুন তার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং পুড়িয়ে কয়লা করে ফেলবে। দোযখীদেরকে আগুনের মধ্যে আটকে রাখা হবে। অর্থাৎ দোযখীদেরকে দোযখে ভর্তি করার পর দোযখের দ্বার রুদ্ধ করে দেয়া হবে। কেননা সেখানে তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে। তা থেকে কখনোই বের হওয়ার সৌভাগ্য হবে না। এ আয়াতে উল্লিখিত দীর্ঘকায় স্তম্ভসমূহের মর্মার্থ হল- দোযখের অগ্নি শিখা এমন বিরাট ও বিশাল হবে, যেমন স্তম্ভসমূহ হয়ে থাকে। দোযখীরা তাতে আটকে থাকবে। —বয়ানুল কোরআন।

দোযখীদের পানাহার

আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছ ঃ

দোযখীদের পানাহারের বস্তু কি হবে সে বিষয়ে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "দোযখীদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পানি পান করান হবে। তাদের জন্য দারিউ ব্যতীত কোন খাদ্য হবে না। যা তাদের পুষ্টিও যোগাবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।" —সূরা গাশিয়া।

মেরকাত গ্রন্থকার লেখেছেন 'দারিউ' হচ্ছে হিজাজ অঞ্চলের একটি কাঁটাযুক্ত গাছ। সে গাছের ফল এত বিষাক্ত যে, কোন প্রাণী তা খেলেই তার মৃত্যু ঘটে। এ কারণে কোন প্রাণীই সে গাছের ধারে-কাছেও যায় না।

তিনি আরো লেখেন যে, উল্লিখিত আয়াতে 'দারিউ' দ্বারা আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছের কথা বুঝানো হয়েছে, যা হবে অত্যন্ত তিক্ত এবং পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়েও খারাপ দুর্গন্ধযুক্ত। আর তা আগুনের তাপের চেয়েও অধিক উত্তপ্ত হবে। এগুলো খাওয়ার পর তাদের তৃষ্ণা দূর হবে না।

জখম থেকে নির্গত নির্ঝরা ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "আজকের দিন তাদের কোন বন্ধু হবে না এবং জখম থেকে নিঃসৃত স্রাব ছাড়া তারা কোন খাদ্যও পাবে না। যা অপরাধীগণ ছাড়া কেউই আহার করবে না।" —সূরা হাক্কাহ– ১ম রুকু।

ঝাকুম লতাপাতা ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ *

"পাপাচারীদের খাদ্য হবে ঝাকুম লতাপাতা (গাছ)। যা গলিত তামার মত পেটে গিয়ে গরম পানির ন্যায় ফুটতে থাকবে।" —সূরা দুখান– ৩য় রুকু।

আর এক সূরায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "অতএব হে মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্ত লোকেরা! তোমরা ঝাকুম গাছ বা লতাপাতা আহার করবে। আর তা দ্বারাই উদর পূর্তি করবে। তোমরা অত্যুষ্ণ পানি পান করবে। তৃষ্ণার্ত উটের পানি পান করার ন্যায় অত্যুষ্ণ পানি পান করবে। আর এটাই হবে পরকালের দিন তাদের আপ্যায়ন। —সূরা ওয়াকিয়া– ২য় রুকু।

"মূলত ঝাক্কুম হচ্ছে এমন এক গাছ, যা দোযখের তলদেশ হতে উদগত হয়। তার মোচাটি যেন শয়তানের মাথার মত।" —সূরা সাফফাত– ২য় রুকু।

মানুষকে বুঝানোর জন্য 'ঝাক্কুম' শব্দটির তরজমা করা হয় বিখ্যাত তিক্তময় সানডাস গাছ দ্বারা। কিন্তু দোযখের বস্তুগুলো দুনিয়ার বস্তুর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট ও দুর্গন্ধময়। এহেন তিক্ত লতাপাতা ও গাছগাছড়া হবে তাদের খাদ্য। আর ফুটন্ত গরম পানিও হবে তাদের পানীয়।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, ঝাক্কুমের যৎকিঞ্চিৎও যদি এ দুনিয়ায় ফেলা হত, তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসীর খাদ্য বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব এ ঝাক্কুম যাদের খাদ্য হবে তাদের পরিণতি কেমন দাঁড়াবে বল।

—তিরমিযী, নাসাই, ইবনে হেব্বান।

মুহাদ্দিস হাকেম বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, এক ফোঁটা ঝাক্কুম যদি দুনিয়ার নদীসমূহে ফেলা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সমস্ত দুনিয়াবাসীর খাদ্য হবে তিক্ত। এখন বল যাদের খাদ্য হবে এ ঝাক্কুম, তাদের অবস্থা কি হবে! —হাকেম।

গাচ্ছাক ঃ

সূরা নাবাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا *

"দোযখীরা অত্যুষ্ণ গরম পানি ও গাচ্ছাক ছাড়া আর কোন ঠাণ্ডা এবং পান করার মত কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে না।"

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এক বালতি গাচ্ছাক যদি দুনিয়ায় ফেলা হয়, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মৃত্যু ঘটবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

কোরআন মজীদে গাচ্ছাক দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেজ্ঞদের বিভিন্ন অভিমত বিদ্যমান। যেমন—

(১) গাচ্ছাক দ্বারা দোযখীদের দেহগলিত পুঁজ ও জখমের নির্ঝরা বুঝানো হয়েছে।

(২) গাচ্ছাক দ্বারা দোযখীদের অশ্রু বুঝানো হয়েছে।

(৩) গাচ্ছাক দ্বারা যামহারীর অর্থাৎ দোযখের অতিশয় ঠাণ্ডা শাস্তির কথা বুঝান হয়েছে।

(৪) কেউ কেউ বলেছেন, এমন ঠাণ্ডা পুঁজকে গাচ্ছাক বলা হয়, যা অতিশয় ঠাণ্ডার কারণে পান করা যায় না। (কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে পান করতে হবে।) মোট কথা গাচ্ছাক খুবই খারাপ ও অতিশয় দুর্গন্ধময় বস্তু। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ থেকে পরিত্রাণ প্রদান করুন।

গলিত ধাতু ঃ

দোযখীদেরকে গলিত গরম ধাতু পান করতে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা যদি (পিপাসায় কাতর হয়ে) ফরিয়াদ করতে থাকে, তখন তাদেরকে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা দ্বারা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে। তাদের পানীয় কতইনা খারাপ এবং দোযখ কতইনা নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল।" —সূরা কাহাফ– ৪র্থ রুকু।

গলিত পুঁজ ঃ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "আর দোযখীদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। তারা খুবই কষ্টের সাথে পান করতে থাকবে। কিন্তু তা গলধকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন চতুর্দিক থেকে মৃত্যুর আগমন দেখতে পাবে, কিন্তু সে মৃত্যুবরণে সক্ষম হবে না। —সূরা ইবরাহীম– ৩য় রুকু।

অতিশয় উষ্ণ পানি ঃ

দোযখীদেরকে অতিশয় উষ্ণ পানি পান করানো হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন– * وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ "দোযখীদেরকে খুবই উষ্ণ পানি পান করান হবে। যার ফলে তাদের নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যাবে।" —সূরা মুহাম্মদ– ২য় রুকু।

গলায় আটকানো খাদ্য ঃ

দোযখীদেরকে এমন খাদ্য দেয়া হবে, যা মুখে দিলে গলায় আটকে যাবে, গলধকরণ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিশ্চয় কাফের মুশরেকেদের জন্য আমার কাছে আছে বেড়ি ও আগুনের কুণ্ডলী আর গলায় আটকানো খাদ্য এবং জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা মুজাম্মিল– ১ম রুকু।

গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা হবে এমন এক কাঁটা, (যাকে বাংলায় হেউজ গাছ বলা হয়) যা গলধকরণ কালে গলায় আটকে যাবে। তা বেরও হবে না এবং ভেতরেও যাবে না।
—হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখীদের উদরে এমন সূতীব্র ক্ষুধার জ্বালা সৃষ্টি করা হবে যে, শুধুমাত্র এককভাবেই এ ক্ষুধার সুতীব্র জ্বালা-ই তাদের সেই শাস্তির সমান হয়ে দাঁড়াবে যা তাদেরকে ক্ষুধা ছাড়া অন্যান্য উপায়ে দেয়া হতে থাকবে। সুতরাং তারা যখন খাদ্য প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত গাছ খেতে দেয়া হবে। যা তাদেরকে পুষ্টিও যোগাবেনা এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। দ্বিতীয় বার তারা যখন খাদ্য প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য খেতে দেয়া হবে। যা মুখে পোরার সাথে সাথে গলায় আটকে যাবে। তারা তখন তা গলা থেকে বের করার চেষ্টা চালাবে। এমন সময় তাদের মনে পড়ে যাবে যে, কোন কিছু গলায় আটকে গেল পার্থিব জীবনে তারা পানি পানের মাধ্যমে তা গলধকরণ করে নিত। অতএব তারা তখন পানি প্রার্থনা করবে। তখন তাদের সামনে লোহার পাত্রে করে ভীষণ গরম পানি দেয়া হবে। সে পাত্রগুলো যখন তাদের মুখের সামনে তুলে ধরা হবে, তখন তার উত্তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। এরপর যখন উক্ত পানি তাদের উদরে গিয়ে পৌঁছবে, তখন তা তাদের পেটের সব নাড়ীভূড়িকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোরআন মজীদের يُسْقٰى مِنْ مَّاۤءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهٗ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন দোযখীদের মুখের কাছে গলিত পুঁজ নেয়া হবে, তখন তারা খুব ঘৃণাবোধ করবে। যখন তা তাদের মুখের অতি নিকটবর্তী করা হবে, তখন তাতে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসে যাবে এবং তাদের মাথার চামড়া খসে পড়বে। অতঃপর সে পানি পান করলে পেটের নাড়িভূড়ি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। পরিশেষে তা গুহ্য দ্বারপথে বের হবে। অতঃপর নবী করীম (সঃ) প্রথমে সূরা মুহাম্মদের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন–

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ *

"তাদেরকে অত্যুষ্ণ পানি পান করানো হবে। ফলে তাদের নাড়িভূড়ি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে।" এরপর সূরা কাহাফের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهُ بِئْسَ الشَّرَابُ

"তারা ফরিয়াদ করতে থাকলে তাদের এমন পানি পান করতে দেয়া হবে, যা হবে গলিত ধাতুর ন্যায়, আর এতে তাদের মুখমণ্ডল ভূনা ভূনা হয়ে যাবে। তাদের পানীয় খবুই নিকৃষ্ট।" —তিরমীযী, মেশকাত।

দোযখে শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি

দোযখের আগুন, সাপ, বিচ্ছু, আগুনের তাপ, পানাহারের বস্তু, অন্ধকার ইত্যাদি সব কিছুই কঠোরতম শাস্তি। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তা দোযখের শাস্তির খুবই ক্ষুদ্রতম অংশ। কোরআন-হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, শাস্তির এসব প্রকরণ ছাড়া আরো অনেক প্রকরণ ও পদ্ধতি আছে, যা ব্যবহার করে শাস্তি দেয়া হবে। এর কিছু বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ফুটন্ত গরম পানি মাথায় ঢালা হবে ঃ

দোযখীদের মাথায় অত্যুষ্ণ গরম পানি ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের মাথায় অত্যুষ্ণ গরম পানি ঢালা হবে, যার ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং দেহের চামড়ার অভ্যন্তরের সব কিছু বিগলিত হয়ে বের হয়ে আসবে।" —সূরা হাজ্ব –২য় রুকু।

নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে দোযখীদের মাথায় ফুটন্ত গরম পানি ঢালা হবে। আর তা উদরে পৌঁছে উদরে যা কিছু আছে তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে। অবশেষে তা পদযুগল দিয়ে বের হবে। আবার পুনরায় তাদেরকে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে। অনন্তর রাসূল (সঃ) বললেন, এটাই হচ্ছে আয়াতে উল্লিখিত يصهر শব্দের মর্মার্থ। —তিরমিযী, মেশকাত।

লোহার মুগুড়ু দ্বারা পেটান হবে ঃ

দোযখীদেরকে লোহার মুগুড় দ্বারা পেটান হবে। আল্লাহ তাযালা বলেন ঃ

"তাদেরকে পিটাবার জন্য রয়েছে লোহার মুগুড়। যখনই তারা দোযখের কয়েদখানা হতে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে প্রত্যাবর্তন করানো হবে আর বলা হবে, তোমরা আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে।"

—সূরা হজ্ব ২য় রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের একটি লোহার মুগুড় যদি পৃথিবীতে রাখা হয়; তবে সমস্ত জিন-ইনছান একত্রিত হয়েও সে মুগুড় উত্তোলন করতে চাইলেও তা উত্তোলনে সক্ষম হবে না। —হাকেম, আহমদ, আবু ইয়ালা।

আর এক বর্ণনায় আছে, দোযখের লোহার মুগুড় দ্বারা পাহাড়ের উপর আঘাত করা হলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। —হাকেম।

দেহের চামড়া পরিবর্তন করা হবে ঃ

দোযখীদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলে পুনরায় তাদের দেহে নতুন চামড়া সৃষ্টি করা হবে, যাতে সর্বদা শাস্তি পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ *

"যখনই তাদের দেহের চামড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যাবে, তখনই আমি নতুন চামড়া দ্বারা তা পরিবর্তন করে দেব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।" —সূরা নিসা– ৮ম রুকু।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেন, প্রতিদিন দোযখীদেরকে আগুন সত্তর হাজার বার দহন করবে। যখনই আগুনে পোড়ান হবে, তখন প্রত্যেক বারই বলা হবে– যেরূপ ছিলে সেরূপ হও। সুতরাং চামড়া যেরূপ ছিল সেরূপই হয়ে যাবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

আগুনের পাহাড়ে উঠান হবে ঃ

দোযখীদেরকে আগুনের পাহাড়ের উপর চড়ান হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ * سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا "আমি অতিসত্বর তাদেরকে সাউদ নামক আগুনের পাহাড়ে চড়াব।" —সূরা মুদ্দাছির ১ম রুকু।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাউদ হচ্ছে আগুনের একটি পাহাড়। তাতে দোযখীদেরকে সত্তর বছর পর্যন্ত রাখা হবে। অতঃপর সত্তর বছর পর্যন্ত সে পাহাড়ের উপর হতে তাকে নীচের দিকে গড়িয়ে নামান হবে। এভাবেই সর্বদা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বিশাল শিকল দ্বারা বাঁধা হবে ঃ

দোযখীদেরকে লোহার শিকল দ্বারা বাঁধা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওদেরকে ধর এবং গলায় তোওক পরিয়ে দাও। অতঃপর তাদেরকে দোযখে প্রবেশ করাও। অনন্তর তাদেরকে এমন শিকল দ্বারা বেঁধে আবদ্ধ কর, যার পরিধি সত্তর গজ লম্বা।" —সূরা হাক্কাহ্– ১ম রুকু।

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী (র) তাফসীরে বয়ানুল কোরআনে লেখেছেন, এ গজগুলোর পরিমাণ একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই জানেন। কেননা এ গজ হবে সেখানকার গজ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ছোট এক পেয়ালা পরিমাণ রং যদি আসমান থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়, তা হলে রাতের আগমনের পূর্বেই তা পৃথিবীতে এসে পৌছবে, যা পাঁচশত বছরের দূরত্বের পথ। আর যদি দোযখীদের শিকলের এক মাথা হতে ঐ রং নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে অপর মাথায় পৌছতে তার চল্লিশ বছর সময় লাগবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ জিঞ্জির বা শিকল তাদের দেহে জড়ান হবে। অতঃপর গুহ্য দ্বারপথে প্রবেশ করিয়ে মুখ দিয়ে বের করা হবে। অতঃপর তাকে আগুনে এমনভাবে পোড়ান হবে যেমন লোহার শিকে মাংস কাবাব বানানো হয়। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

গলায় বেড়ি পড়ান হবে ঃ

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন–

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا *

"আমি কাফেরদের জন্য লৌহ নির্মিত জিঞ্জির-তোওক ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।" —সূরা দাহার- ১ম রুকু।

আল্লাহ্ আরো বলেন– "অতি সত্বরই তারা অবহিত হতে পারবে, যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানির মধ্যে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।"

—সূরা মুমিন – ৮ম রুকু।

হযরত ইবনে আবূ হাতেম বর্ণিত এক মরফুউ হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, কোন একদিক থেকে কালো রংয়ের মেঘমালা উঠবে এবং দোযখীগণ তা দেখতে পাবে। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কি চাও? তখন দুনিয়ার কালো মেঘমালার কথা তাদের স্মরণ হবে এবং তার উপর অনুমান করে তারা বলবে, আমরা এ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ চাই। তখন ঐ মেঘমালা হতে বেড়ি-জিঞ্জির ও আগুনের অঙ্গারের বর্ষণ হবে। সে আগুনের অঙ্গারে তারা দগ্ধ হবে এবং তাদের বেড়ি ও শৃঙ্খল আরও বৃদ্ধি ঘটবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

দোযখীদেরকে যে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, সে সম্পর্কে কাতাদাহ (র) বলেন, অপরাধীদের মাথার চুল ধরে ঐ পানিতে চুবানো হবে। ফলে তাদের দেহের মাংস বিগলিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তাদের দু'টি চোখ ও হাড়ের কায়া ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

গন্ধকের কাপড় পরিধান করান হবে ঃ

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ *

"তাদের দেহের জামা হবে গন্ধকের এবং আগুন তাদের চেহারার সাথে মিশে থাকবে। —সূরা ইবরাহীম- শেষ রুকু।

হযরত আশ্রাফ আলী থানবী (র) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন যে, আলকাতরাকে আরবী ভাষায় কিতরান বলা হয়। আর এর জামা হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত দেহে আলকাতরা মাখা থাকবে, যাতে খুব দ্রুত তাতে আগুন লেগে দীর্ঘক্ষণ বিরাজমান থাকে।" —বয়ানুল কোরআন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গলিত তামাকে কিতরান বলা হয়। দোযখীদের পোশাক হবে প্রচণ্ড অগ্নি উত্তাপযুক্ত এ গলিত তামার।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কারো মৃত্যুতে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দনকারী মহিলাগণ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কেয়ামতের দিন তারা এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে যে, তার দেহের একটি জামা হবে আলকাতরার, আর একটি হবে খুজলির। অর্থাৎ তার দেহে থাকবে খুজলী-পাঁচড়া, আর তার উপর আলকাতরা মেখে দেয়া হবে। —মেশকাত।

সূরা হাজ্বে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ *

"যারা কুফরী করে, তাদের পরিধানের জন্য আগুনের কাপড় কেটে দেওয়া হবে।" —সূরা হাজ্ব -২য় রুকু।

জাহান্নাম প্রহরীদের তিরস্কার ঃ

দোযখীদেরকে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তি দেয়া ছাড়াও সুতীব্র মনোকষ্টকর এক ধরনের মানসিক শাস্তিও দেয়া হবে। দোযখের প্রহরী ও কর্মকর্তা ফেরেশতাগণ তাদেরকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিয়ে মনোবদনার সৃষ্টি করবে। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ *

"আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা সে আগুনের শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর যাকে তোমরা মিথ্যারোপ করতে।" —সূরা হা-মিম সেজদা- ২য় রুকু।

"সূরা আহকাফে আল্লাহ বলেন- "পার্থিব জীবনেই তোমরা তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা পুরাপুরিভাবে উপভোগ করে নিয়েছ এবং পার্থিব জীবনোপোকরণ হতে তোমরা বিভিন্ন উপায়ে লাভবান হয়েছে। আজকের দিন তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দ্বারা প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গৌরব-অহংকার করতে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত থাকতে।" —সূরা আহকাফ- ২য় রুকু।

হযরত যায়েদ ইবনে আকরাম (রা) বলেন, কোন এক সময় হযরত ওমর (রা) পানি চাইলে তার কাছে মধু মিশ্রিত পানি পেশ করা হল। তিনি তা পান না করে বললেন, এ শরবত তো খুবই উত্তম। কিন্তু আমি পান করব না, কেননা আমি কোরআন মজীদে পড়েছি, আল্লাহ তাআ'লা জৈবিক চাহিদার দাবী পূরণকারীদের নিন্দায় বলেছেন, "পরকালে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পার্থিব জীবনে খুব মজা উপভোগ করেছ। সুতরাং আমার আশঙ্কা হয় যে, আমাদের পুণ্যের বিনিময়ে দুনিয়াতেই মজাদার বস্তুসমূহ দান করা হয় নাকি।"—মেশকাত।

বে-আমল ওয়ায়েজীনের শাস্তি ঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যে রাতে আমাকে মিরাজে (ঊর্ধ্বমণ্ডলে ভ্রমণ) করান হয়েছে, সে রাতে আমি এমন কিছু লোকদের দেখেছি, যাদের দু'ঠোঁট আগুনের কেচি দ্বারা কাঁটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা হচ্ছে আপনার উম্মতের সেই ওয়ায়েজীন, যারা মানুষকে কল্যাণজনক কাজ করতে নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের বেলায় তা ভুলে থাকত। তারা আল্লাহ তাআ'লার কিতাব পাঠ করত, কিন্তু তদানুযায়ী আমল করত না। —বোখারী, মুসলিম, বায়হাকী।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে দ্রুত আগুনে পতিত হবে। অতঃপর সে নিজের আতুড়ি ও নাড়িভুঁড়িগুলো দলিত মথিত করে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা চাক্কি কাঁধে বহন করে ঘুরত থাকে। তার এ অবস্থা দেখে দোযখের অনেক লোক তার কাছে জমায়েত হবে। আর তাকে বলবে, ওহে? তোমার কি হয়েছে। তুমি কি আমাদেরকে কল্যাণকর কাজ করতে নির্দেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করতে না ? তখন সে বলবে, হায়! তোমাদেরকে ভাল কাজ করার নির্দেশ দিতাম বটে কিন্তু নিজে তা করতাম না। তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতাম বটে, কিন্তু তা হতে নিজে বিরত থাকতাম না। —বোখারী, মুসলিম।

সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহারকারীদের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র বা এমন কোন পাত্রে পানাহার করে, যাতে সোনা-রূপার মিশ্রণ থাকে, সে তার উদরে দোযখের আগুন ভর্তি করে। —মেশকাত, দারে কুতনী।

ফটোগ্রাফার বা ছবি অংকনকারীদের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লার কাছে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগকারী হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে (জীবজন্তুর) ছবি অংকন করে। —বোখারী, মুসলিম।

তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যেক ছবি অংকনকারীই দোযখে যাবে। তার প্রতিটি ছবির পরিবর্তে এক একটি প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যারা তাকে দোযখে শাস্তি দিতে থাকবে।

এ বর্ণনার পর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "তোমাকে যদি ছবি নির্মাণ করতেই হয়, তাহলে গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি অংকন কর। —বোখারী, মুসলিম।

আত্মহত্যাকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ পাহাড় থেকে পতিত হয়ে আত্মহত্যা করলে, সে দোযখের আগুনে জ্বলবে। সেখানে সে সর্বদা (পাহাড়ে চড়তে ও পতিত হতে) থাকবে। আর কেউ বিষ পানে আত্মহত্যা করলে, সে বিষ তার হাতে থাকবে এবং দোযখের আগুনে বসে সে সর্বদা তা পান করতে থাকবে।

আর কেউ লৌহ অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করলে, সে অস্ত্র তার হাতে থাকবে। আর দোযখে অবস্থান করে উক্ত অস্ত্র দ্বারা সে নিজের পেটে সর্বদা আঘাত করতে থাকবে। —বোখারী, মুসলিম।

অহংকারী ব্যক্তির শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গৌরব ও অহংকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন মানুষরূপে পিপীলিকার আকারে উত্থিত হবে। অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে আবেষ্টন করে রাখবে। তাদেরকে জাহানান্নামের বন্ধিখানার দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। আর সে জেলখানার নাম হচ্ছে বাওলাস। সেখানে তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। আর দোযখীদের দেহের গলিত রক্ত-পুঁজ ও নির্ঝরা (তিনাতুল খাব্বাল) তাদেরকে পান করান হবে। —তিরমিযী মেশকাত।

তিরমিযীর আর এক হাদীসে আছে, দোযখে একটি উপত্যকা রয়েছে. যার নাম হাবহাব। সেখানে প্রত্যেক অহংকারী ও দাম্ভিকগণ অবস্থান করবে।

—হাকেম, তাবারানী, আবু ইয়ালা, তারগীব অততারহীব।

রিয়াকার আবেদগণের শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা হুব্বুল হুজন (দুঃখ-চিন্তার কূপ) থেকে আল্লাহ তাআ'লার নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা কর। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হুব্বুল হুজন কি ? নবী করীম (সঃ) বললেন, হুব্বুল হুজন হচ্ছে দোযখের একটি কূপ। তার ব্যাপারে স্বয়ং দোযখই প্রতিদিন চল্লিশবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। সাহাবী (রা)গণ আবার জিজ্ঞেস করলেন, সে স্থানে কারা থাকবে? তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, মানুষকে দেখাবার জন্য যারা এবাদাত করে, সেসব রিয়াকার আবেদগণই সেখানে যাবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজা, আত্তারগীব অত্তারহীব।

ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, এবাদাতকারীদের মধ্যে আল্লাহ তাআ'লার নিকট সে-ই বেশী ঘৃণিত ও রোষানলের পাত্র; যে জালেম শাসকদের কাছে যায়। অর্থাৎ যারা তোশামোদ-চাটুকারিতা ও পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদের কাছে যায়। —ইবনে মাজা।

এলমেদ্বীন গোপনকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো কাছে যদি শরীয়তের কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরান হবে। —তিরমিযী, আবু দাউদ, মেশকাত।

মদ পান ও নেশারকর দ্রব্য গ্রহণকারীর শাস্তি ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার মহান প্রতিপালক নিজের নামে কসম করে বলেছেন যে, আমি আমার সম্মানের কসম করে বলছি, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ এক ঢোক শরাব পান করলে, তাকে আমি সে পরিমাণই পুঁজ পান করাব। আর যে বান্দা আমার ভয়ে শরাব পান করা পরিত্যাগ করবে, তাকে আমি পবিত্র হাউজের পানি পান করাব।

সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা নিজ দায়িত্ব করে নিয়েছেন যে, কেউ নেশার দ্রব্য পান করলে–

কেয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে তিনাতুল খাবাল পান করাবেন। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, তিনাতুল খাবাল কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, দোযখীদের দেহের ঘাম অথবা তিনি বলেছেন, দোযখীদের নির্ঝরা। —মেশকাত।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কারো যদি মদ পানের অভ্যাস থাকে এবং এ অভ্যাস থাকা অবস্থায়-ই যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তাকে পরকালে নহরুল গুতাত বা গুতাত নহর থেকে পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, নহরুল গুতাত কি? নবী করীম (সঃ) বললেন, নহরুল গুতাত হচ্ছে যিনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত স্রোতধারা। —আত্তারগীব, অত্তারহীব, আহমদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান।

দোযখীদের অবস্থার বিবরণ

দোযখে প্রবেশের অবস্থা ঃ

কোরআন মজীদের কয়েক স্থানে দোযখে প্রবেশকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যার একটি হচ্ছে দোযখীরা পিপাসাকাতর অবস্থায় দোযখের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হবে। দোযখে প্রবেশের পূর্বে দরজায় দণ্ডায়মান থাকা অবস্থায় ফেরেশতারা তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কোরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, জালেমগণ (কাফের মুশরেকগণকে) ও তাদের সাথীগণকে এবং আল্লাহ তাআ'লাকে পরিত্যাগ করে তারা যাদের এবাদত-বন্দেগী করত তাদেরকে জমায়েত কর। অতঃপর তাদেরকে দোযখের পথ দেখাও। (তারপর নির্দেশ হবে) ওদেরকে (কিছু সময়ের জন্য) থামাও, এদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (তারপর জিজ্ঞেস করা হবে) তোমাদের কি হল যে, তোমরা এখন একে অপরকে সহায়তা করছ না? (কিন্তু একথার পরও তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে না) বরং তারা সকলেই তখন মাথা অবনত করে দাড়িয়ে থাকবে।" —সূরা সাফ্ফাত– ২য় রুকু।

সূরা মরিয়মে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا *

"অপরাধীগণকে আমি পিপাসাকাতর অবস্থায় দোযখের দিকে হাকিয়ে নেব।" —সূরা মরিয়ম– ৬ রুকু।

সূরা কামারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ *

"সেদিন অপরাধীগণকে অধঃমুখ অবস্থায় টেনে হেঁচড়ে দোযখে নেয়া হবে। (এ অবস্থায় তাদেরকে বলা হবে) দোযখের আগুনের দহনস্বাদ গ্রহণ কর।" —সূরা কামার– ৩য় রুকু।

"অপরাধীগণকে তাদের মুখমণ্ডলের আকৃতি দেখে চেনা যাবে। (কারণ তাদের মুখমণ্ডল হবে কালো এবং চোখ হবে নীল বর্ণের।) অতঃপর তাদের মাথার চুল ও পা ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" —সূরা আররহমান- ২য় রুকু।

"সুতরাং মুশরেক ও ভ্রান্ত লোক এবং ইবলিস বাহিনীর সকলকে অধঃমুখী করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" —সূরা শুআরা- ৫ম রুকু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অপরাধীগণের হাত-পা মোচড়িয়ে একত্রিত করা হবে। অতঃপর লাকরীর ন্যায় মুড়িয়ে দোযখে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড--৫০ পৃঃ।

পুলসেরাত পার হওয়ার সময় দোযখে নিপতিত হওয়া ঃ

দোযখের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। নেককার ও বদকার সব লোককেই এ পুল অতিক্রম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّاوَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا *

"তোমাদের প্রত্যেককেই এ পুল অতিক্রম করতে হবে। এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" —সূরা মরিয়ম- ৭১ ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। সমস্ত নবীদের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রে আমার উম্মতদেরকে নিয়ে এ পুল অতিক্রম করব। সেদিন একমাত্র নবীদের মুখেই এ কথা উচ্চারিত হবে- আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম! হে আল্লাহ! নিরাপদ কর, নিরাপদে রাখ। অতঃপর তিনি বললেন, দোযখে সুউদান কাঁটার ন্যায় বড় বড় কাঁটাযুক্ত সাড়াশী থাকবে। সেগুলো কতটা লম্বা হবে তা আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। সে সাড়শীগুলো পুলসেরাত অতিক্রমকারীদেরকে তাদের বদ আমল ও খারাপ কর্মের কারণে ধরে টেনে দোযখে পতিত করার চেষ্টা করবে। ফলে কিছু লোক দোযখে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে। তারা দোযখ হতে কখনো বেরোতে পারবে না। এ পরিণতি হবে অবিশ্বাসীদের। আর কিছু লোক অঙ্গ কেটে কেটে দোযখে পতিত হবে। অবেশেষে তারা দোযখ হতে নাজাত প্রাপ্ত হবে (এরা হল ফাসেক মুমিন লোক)। —বোখারী, মুসলিম।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিছু কিছু মুমিন লোক চোখের পলকে পুলসেরাত অতিক্রম করবে। আর কিছু লোক বিদ্যুতের ন্যায়, কিছু লোক বাতাসের গতির ন্যায়, কিছু লোক পাখি উড়ার গতির ন্যায়, কিছু লোক গতিসম্পন্ন ঘোড়ার ন্যায়, কিছু লোক উটের চলার ন্যায়, কিছু লোক দ্রুতবেগে দৌড়ের ন্যায় এবং কিছু লোক পায়ে চলার ন্যায় এবং কিছু লোক শিশুদের চলার ন্যায় পথ অতিক্রম করবে। এদের মধ্যে কিছু লোক নিরাপদে দোযখ হতে নাজাত লাভ করবে। কিছু লোক সাড়াশীর বাঁধন থেকে ছাড়াছাড়ি করে ছুটে যাবে। আর কতককে অধঃমুখী করে দোযখে ধাক্কিয়ে ফেলা হবে। —মুসলিম, হাকেম, মেশকতা।

হযরত কাআ'ব (রা) বলেন, দোযখ তার পৃষ্ঠদেশে সমস্ত লোককে একত্রিত করবে। সমস্ত ভাল ও খারাপ লোক সেখানে জমায়েত হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা দোযখকে বলবেন, তুমি তোমার লোকদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে যাও, আর জান্নাতীদেরকে ছেড়ে দাও। সুতরাং দোযখ খারাপ লোকদেরকে এমনভাবে চিনতে পারবে, যেমন করে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে চিনতে পার। বরং তার চেয়েও বেশি চিনবে এবং তাদেরকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে ভর্তি করবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড ১৩৩ পৃঃ।

মোটকথা জান্নাতীগণ পুলসেরাত পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যাদের জন্য জান্নাতের দরজা পূর্ব থেকে খোলা রাখা হবে। আর দোযখীদেরকে দোযখে ফেলে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا *

"যারা পরকালকে ভয় করত, তাদেরকে আমি নিষ্কৃতি দেব। আর যারা জালেম তাদেরকে আমি দোযখে এমনভাবে ফেলব যে, তারা তাতে হাঁটুর উপর ভর করে উপুড় হয়ে পড়বে।" —সূরা মরিয়ম– ৫ম রুকু।

দোযখে প্রবেশের সময় একে অপরের প্রতি অভিশাপ ঃ

এ পার্থিব জীবনে দোযখীদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ ও ভালবাসা বিদ্যমান। তারা একে অপরকে ফুসলিয়ে শেরক ও কুফরী কর্মে লিপ্ত করে। কিন্তু তারা যখন খারাপ কর্মের পরিণাম স্বরূপ নিজেদেরকে দোযখে প্রবেশ করতে দেখবে, তখন তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করে অভিশাপ দিতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যখনই কোন দল দোযখে প্রবেশ করবে, তখনই তারা নিজেদের অপর দলকে লা'নত করবে। অবশেষে তারা সকলে যখন তাতে একত্রিত হবে, তখন পরের লোকেরা আগের লোকদেরকে লানত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং দোযখে ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।" —সূরা আরাফ।

দোযখে প্রবেশকারীদের সংখ্যা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা হযরত আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন, হে আদম! প্রত্যুত্তরে তিনি বলবেন, আমি উপস্থিত, আপনার হাতেই সমস্ত কল্যাণ। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকেদোযখীদেরকে বের কর। তিনি আরয করবেন, দোযখীদের সংখ্যা কত? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। একথা শুনে হযরত আদম (আ) খুব অস্বস্তি বোধ করবেন। দুঃখ-চিন্তায় এ সময় শিশু বৃদ্ধে পরিণত হবে এবং গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত ঘটে যাবে। আর সবাই তখন চেতনা হারিয়ে ফেলবে। আসলে তারা বেহুঁশ হবে না। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি হবে খুবই কঠিন (যার ফলে তারা বোধজ্ঞান হারিয়ে ফেলবে)।

এ কথা শুনে সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে একজন জান্নাতী কে সে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমরা ভীত হয়োনা। সুখবর হল, সেই একজনই হবে তোমাদের মধ্য থেকে, আর এক হাজার হবে ইয়াজুজ মাজুজ থেকে। এভাবেই হিসাব হবে।

—বোখারী, মুসলিম।

এ হাদীসের মর্মার্থ হল, ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যাই হবে অধিক। তোমাদের সাথে তাদের মোকাবিলা হলে তোমাদের একজনের মোকাবিলায় তারা হাজারজন উপস্থিত হবে। যেহেতু তারাও আদম (আ)-এর বংশোদ্ভূত। তাদেরকেই মিলিয়ে প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোযখে প্রবেশ করবে।

দোযখের অধিকাংশই হবে মহিলা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতের প্রতি তাকালে সেখানকার অধিকাংশ লোকই দেখলাম পেশাহীন (দরিদ্র) লোক। আর দোযখের প্রতি তাকালে দেখলাম, সেখানকার অধিকাংশ হচ্ছে মহিলা। —মেশকাত।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) ঈদুল আজহা অথবা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য ঈদগাহে আসছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে অনেক মহিলাকে দেখে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা বেশি বেশি দান-সদকা কর। কেননা আমাকে দোযখীদের মধ্যে অধিকাংশই দেখান হয়েছে তোমাদের। মহিলাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কারণে হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, কেননা, তোমর খুব বেশী অভিশাপ কর এবং স্বীয় স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। —বোখারী, মুসলিম।

দোযখীদের জিহ্বা ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কাফেরগণ তাদের জিহ্বাকে এক ফারসখ এবং দু' ফারসখ (তিন মাইলে এক ফারসখ হয়) পর্যন্ত বের করে ফেলবে। আর মানুষ তার উপর দিয়ে পথ চলবে। —আহমদ, তিরমিযী।

দোযখীদের দেহ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে কাফেরদের দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে দ্রুতগতীসম্পন্ন কোন বাহনের তিন দিনের পথ চলার সমান দীর্ঘ। আর তাদের মেরুদণ্ড হবে ওহুদ পাহাড় সমান। আর তাদের দেহের চামড়ার পুড়ুত্ব হবে তিন দিনের পথের সমান। —মুসলিম, মেশকাত।

তিরমিযী বর্ণিত এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদের মেরুদণ্ড হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান। আর তাদের উরু হবে বয়দা পাহাড়ের ন্যায় মোটা। আর দোযখে তাদের বসার স্থানটি হবে তিন দিনের পথের সমান লম্বা। যেমন মদীনা থেকে রবযা গ্রামের দূরত্ব। —মেশকাত।

আর এক বর্ণনায় আছে, দোযখীদের বসার স্থান এত লম্বা হবে যেমন মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত দূরত্ব বিদ্যমান। —মেশকাত, তিরমিযী।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, কাফেরদের দেহের চামড়ার পুড়ত্ব হবে বেয়াল্লিশ হাত। (তিরমিযী) মুসলিমে বর্ণিত আর এক হাদীসে বলা হয়েছে, কাফেরদের দেহ তিন দিনের দূরত্বের দৈর্ঘ্যের ন্যায় মোটা হবে। এসব কথা অবিশ্বাসের কোন বিষয় নয়। কেননা বিভিন্ন কাফের লোকের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে। কারো শাস্তি কম হবে এবং কারো শাস্তি বেশি হবে।

আর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দোযখে আমার উম্মতের কারো কারো প্রশস্ততা এত বানান হবে যে, একই ব্যক্তিই দোযখের পুড়ো এক কোনা জুড়ে যাবে। —ইবনে মাজা, হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে বলেছেন যে, তোমরা কি জান; দোযখ কতটা প্রশস্ত ? আমি বললাম, না, জানি না। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! তোমরা আসলেই জান না? দোযখীদের দু'কানের মধ্যবর্তী এবং দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে সত্তর বছর পথ চলার সমান।যাতে রক্ত ও পুঁজের প্রণালীও প্রবাহিত হবে।

—আহমদ, হাকেম, আত্তারগীব অত্তারহীব।

দোযখীদের কুৎসিৎ আকৃতি

দোযখীদের কুৎসিৎ আকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

"যারা পাপ অর্জন করে, সে পাপের অনুরূপ। লাঞ্ছনা ও অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আল্লাহ তাআ'লার শাস্তি থেকে মুক্ত করার মত তাদের কেউই থাকবে না। তাদের দুরাবস্থা এমন হবে যে, যেন তাদের মুখমণ্ডল কালো রাতের একটি অংশ দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে।" —সূরা ইউনুছ– ৬ রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, দোযখীদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত কালো হবে। হাদীসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, দোযখীদের কাউকে যদি সেখান থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠান হয়, তাহলে তাদের কুৎসিৎ আকৃতির দৃশ্য এবং দুর্গন্ধের কারণে দুনিয়ার মানুষ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। এ কথা বলার পর হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) খুব কাঁদলেন।

—আত্তারগীব অত্তারহীব, ইবনে আবী দুনিয়া।

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ *

"আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে পুড়িয়ে ফেলবে। সেখানে তারা থাকবে বীভৎস চেহারায়।" —সূরা মুমিনুন– ১০৩।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) كالحون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আগুন দোযখীদেরকে দগ্ধ করবে। যার ফলে তাদের উপরের ঠোট কুচকে মাথার মধ্যে বরাবর উঠে যাবে, আর নীচের ঠোট ঝুলে নাভী পর্যন্ত ঝুলে পড়বে। —তিরমিযী, মেশকাত।

দোযখীদের অশ্রু ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবা (রা)গণকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা কাঁদ। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভান কর। কেননা দোযখীরা দোযখে এতটা কাঁদবে যে, তাদের অশ্রুতে তাদের মুখমণ্ডলে নালার সৃষ্টি করবে। কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অবশেষে রক্ত বের হবে। যার ফলে চোখে জখম ও ঘা সৃষ্টি হবে। —আবু ইয়ালা, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

মুহাদ্দিস হাকিম তাঁর মুস্তাদরিক গ্রন্থে মারফুউ সনদে বর্ণনা করেছেন, দোযখীরা এত বেশি কেঁদে অশ্রু প্রবাহিত করবে যে, তাদের অশ্রুর স্রোতে নৌকা ভাসালেও তা চলতে থাকবে। নবী করীম (সঃ) আরও বলেছেন, অশ্রু শেষ হওয়ার পর রক্ত প্রবাহিত করে তারা কাঁদবে। —আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

দোযখীদের চিৎকার ও হাক ডাক ঃ

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا *

"যারা পাপিষ্ঠ, তারা দোযখে এমন অবস্থায় থাকবে যে, তারা সেখানে গাধার ন্যায় চিৎকার দিতে থাকবে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।"

—সূরা হুদ–৯ রুকু।

অভিধানে আছে যে, গাধার প্রাথমিক আওয়াজকে আরবীতে زفير বলা হয়। আর শেষের আওয়াজকে شهيق বলা হয়।

দোযখ থেকে ছাড়া পাবার জন্য মুক্তিপণ দিতেও সম্মত হবে ঃ

দোযখের শাস্তি হতে রেহাই পাবার জন্য কাফেরগণ দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ মুক্তিপণ দিতে সম্মত হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আর জালেমদের (কাফের মুশরেকদের) কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত বস্তু এবং তার সাথে সে পরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তাহলেও কেয়ামতের দিন মর্মান্তিক শাস্তি হবে বাঁচার জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে সে তা মুক্তিপণ হিসাবে দিতে সম্মত হবে। —সূরা যুমর–৫ রুকু।

"অপরাধীগণ সেদিনকার শাস্তি হতে বাঁচার জন্য নিজেদের পুত্রসন্তান স্ত্রী ভ্রাতাগণ নিজ সম্প্রদায়ের সে সব লোকজন যাদের মধ্যে তারা বসবাস করত এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে নিজেদের মুক্তিপণরূপে দিতে পছন্দ করবে, যাতে তারা বাঁচতে পারে। কিন্তু তা কখনো সম্ভব হবে না।" —সূরা মায়ারিজ- ১ম রুকু।

সূরা মায়েদায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "যারা কুফরী করে তাদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও থাকে এবং সে সাথে তাদের কাছে যদি সে পরিমাণ অতিরিক্ত আরও সম্পদ থাকে, যাতে তারা তা মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে কেয়ামতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি পায়, তবুও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে জ্বালাময়ী শাস্তি।" —সূরা মায়িদা – ৬ রুকু।

বেহেশতীগণের উপহাস ঃ

কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেহেশতীগণ দোযখীদের অবস্থা অবলোকন করে উপহাস করবে। যেমন বলা হয়েছে–

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ *

"আজকের দিন ঈমানদারগণ সুখময় আসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করে কাফেরদের দিকে তাকাবে এবং তাদের অবস্থা দেখে উপহাস করবে।" —সূরা মুতাফ্‌ফীন।

তাফসীরে দূররে মানছুরে হযরত কায়াব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, বেহেশতে এমন কিছু দরজা ও জানালা থাকবে যা দিয়ে বেহেশতীগণ দোযখীদেরকে দেখতে পাবে। আর তাদের দুরাবস্থা অবলোকন করে নিজেদের প্রতি আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহের শুকরিয়া স্বরূপ হাসবে। পার্থিব জীবনে যেমন কাফেরগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসাহাসি করত এবং চোখের ইঙ্গিতে পরস্পর কৌতুক করত। আর নিজেদের ঘরে বসেও আমোদ করার জন্য ঈমানদারদের সম্পর্কে আলোচনা করত। আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ *

'যারা অপরাধী হয়েছে তারা দুনিয়ার জীবনে ঈমানদারগণকে দেখে হাসাহাসি করত।" সূরা মুমিনুনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআ'লা দোযখীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

"আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি করুণাবর্ষণ করুন। অনুগ্রহকারীদের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। অথচ তোমরা তাদেরকে উপহাস করতে। এমনকি তারা আমার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়াসত্ত্বেও তোমরা তাদেরকে দেখে হাসাহাসি করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান দিয়েছি যে, তারাই হচ্ছে সফলকাম।"
—সূরা মুমিনুন– শেষ রুকু।

দুনিয়ায় কাফের মোশরেকগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। কোন কোন সময় তাদের অভাব অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে উপহাস করত। কোন কোন সময় তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাপড়-চোপড় দেখে নাক ছিটাত। কোন কোন সময় তাদের নামায ও এবাদত-বন্দেগী দেখেও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। ঈমানদারগণকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করে এমনভাবে তাতে মশগুল হত যে, তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআ'লাকে ভুলে থাকত। নিজেদের কুফরী করার পরিণাম কি হবে সে সম্পর্কে আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা করত না। পার্থিব ধন সম্পদের মধ্যে তারা আত্মহারা হয়ে থাকত। মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তাও তাদের মনে উদয় হত না। যদি তারা মৃত্যুর কথা চিন্তা করত, তবে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য তাদের হত। কিন্তু যেহেতু তারা কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত, কুফরী অবস্থায়ই তারা মৃতুবরণ করে। ফলে তাদের স্থান হবে দোযখে। কিন্তু মুমিন লোকেরা নিজেদের অভাব অনটনে খুবই ধৈর্যের পরিচয় দিত এবং কাফেরদের উপহাসকেও বরণ করে নিত মুখ বুঝে। ফলে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনগণকে সাফল্য দান করে বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য দান করেছেন। দুনিয়ায় কাফেরগণ মুমিনদেরকে উপহাস করত, কিন্তু পরকালে মুমিনগণ কাফেরদেরকে উপহাস করবে। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে ঈমান গ্রহণের তাওফিক দিয়ে বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

দোযখীদের বিস্ময়কর অনুশোচনা ঃ

দুনিয়ায় কাফের মোশরেকগণ মুমিনদেরকে দেখে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। কিন্তু তারা দোযখে প্রবেশ করার পর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদেরকে তাদের সাথে না দেখে তারা বিস্ময়বোধ করবে এবং অনুশোচনায় ভুগতে থাকবে যেমন সূরা সোয়াদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"(দোযখে পৌছে) কাফেরগণ বলবে, কি ব্যাপার ঘটল, যাদেরকে আমরা খারাপ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম তাদের তো দেখাই পেলাম না। আমরা কি তাদেরকে (ভুলবশত) উপহাস করতাম, না তাদেরকে দেখে আমাদের চোখ চক্কর খেত।" —সূরা সোয়াদ– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ তাদেরকে এখানে দেখছি না, তাহলে বলা যায় যে, তাদেরকে উপহাস করা এবং তাদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা আমাদের ভুল হয়েছে। আসলে তারা ভাল লোক ছিল তাই আজ তারা এখানে অনুপস্থিত। অথবা হয়ত তারা দোযখেই আছে, কিন্তু আমরা চোখে ধাঁধা দেখছি, তাই তাদেরকে দেখছি না। অতঃপর বেহেশতীগণ যখন তাদের বালাখানায় অবস্থান করে দোযখীদের দেখে হাসবে তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, তারাই সাফল্য লাভ করেছে।

বিভ্রান্তকারীদের প্রতি দোযখীদের আক্রোশ ঃ

দুনিয়ার জীবনে যারা কাফেরদের ইসলামের পথ হতে দূরে সরিয়ে রাখত এবং বিভ্রান্ত করত, তাদের প্রতি তারা উত্তেজিত হয়ে সম্বোধন করে বলবে ঃ

"আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আমাদের উপর হতে আল্লাহর শাস্তিকে কিছুমাত্র দূরে সরিয়ে রাখতে পার না? প্রত্যুত্তরে তারা বলবে ঃ

"(তোমাদেরকে কিভাবে বাঁচাব? আমরা নিজেরাই তো মুক্তি পাচ্ছি না) আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদেরকে বাঁচার কোন পন্থা বলে দিতেন তাহলে আমরা তোমাদেরকেও সে পন্থা বলে দিতাম। অস্থির হই বা ধৈর্যধারণ করি আমাদের ব্যাপারে উভয়ই সমান। আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।" —সূরা ইবরাহীম- ৪র্থ রুকু।

এ সময় কাফেরগণের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও উত্তেজনার মাত্রা অতিক্রম করবে এবং আক্রোশে আল্লাহ তাআ'লার কাছে ফরিয়াদ করবে ঃ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তাদের দেখিয়ে দিন, জিন ও মানুষদের মধ্য যারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। আমরা তাদেরকে পদতলে দলিত মথিত করব, যাতে তারা অধিকতর লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়।"

—সূরা সেজদা- ৪র্থ রুকু।

নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়ার আবেদন ঃ

কাফেরগণ তাদের লিডার বা নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআ'লার কাছে আবেদন পেশ করবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ তাআ'লাকে এবং রাসূলকে মানতাম। তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনে চলতাম এবং তাদের আনুগত্য করতাম। তাই আমাদেরকে তারা সত্য পথ হতে বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে আপনি দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি বর্ষণ করুন বিরাট অভিসম্পাত।" —সূরা আহযাব- ৮ রুকু।

জাহান্নাম প্রহরীদের কাছে আবেদন-নিবেদন ঃ

দোযখীগণ দোযখের শাস্তি ভোগে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট পেয়ে জাহান্নাম প্রহরীদের কাছে শাস্তি লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার আবেদন-নিবেদন জানাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ *

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে (আমাদের জন্য এ মর্মে) সুপারিশ কর যে, তিনি যেন কোন এক দিনের জন্য আমাদের শাস্তিকে হালকা করে দেন।"

তারা বলবে, اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ "তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ মুজিযা ও দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছিল না ?"

জওয়াবে দোযখীরা বলবে, হা নিশ্চয় এসেছিল, কিন্তু আমরা তাদের কথা মানিনি।

তখন ফেরেশতাগণ বলবে ঃ فَادْعُوْا وَمَا دُعٰؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

"তবে (আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করতে পারব না) তোমরাই দোয়া কর। (তাদের দোয়াতেও কোন উপকার হবে না) কেননা পরকালে কাফেরদের দোয়া নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।" —সূরা মুমিন- ৫ রুকু।

এরপর দোযখের প্রধান কর্মকর্তা মালেক ফেরেশতার কাছে তারা আবেদন করে বলবে ঃ يَا مٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "হে মালেক! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর, যাতে তিনি মৃত্যু দান করে আমাদেরকে চিরতরে শেষ করে দেন।"

তখন মালেক ফেরেশতা বলবে ঃ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ তোমরা সর্বদ্যাই এ অবস্থায় থাকবে (তোমরা এ শাস্তি হতে মুক্তিও পাবে না এবং মারা যাবেও না।)

হযরত আয়ামাশ (র) বলেন, আমি এ মর্মে এক হাদীস পেয়েছি যে, মালেক ফেরেশতার কাছে দোযখীদের আবেদন এবং মালেক ফেরেশতার জবাবের মধ্যে হাজার বছরের দীর্ঘ ব্যবধান হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এরপর মালেক ফেরেশতা তাদেরকে বলবেন, তোমরা সরাসরিই আল্লার তাআ'লার কাছে আবেদন ও দোয়া কর। কেননা তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। তাই কাফেরগণ আবেদন করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্যই আমাদেরকে আবেষ্টন করে ফেলছিল। আমরা বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আমরা পুণরায় যদি কুফরী করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ও জালেম গণ্য হব। এর উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন ঃ اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ "তোমরা এখানে লাঞ্ছিত অবস্থায়ই অবস্থান কর। তোমরা আমার সাথে কথা বল না।"

—সূরা মুমিনুন শেষ রুকু।

হযরত আবুদারদা (রা) বলেন, আল্লাহ তাআ'লার এ উত্তর শুনে কাফেরগণ সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হবে এবং গাধার ন্যায় চিৎকার করতে থাকবে এবং দুঃখ ও অনুশোচনা করতে থাকবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, এরপর কাফেরদের চেহারা পরিবর্তন হয়ে তাদের আকৃতি বিবর্তন লাভ করবে। অবশেষে কোন কোন মুমিনলোক শাফায়াত করে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য এসে দোযখীদের কাউকেই চিনতে পারবে না। দোযখীরা তাকে দেখে বলবে, আমি অমুক। তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, তুমি ভুল বলছ। আমি তোমাকে চিনি না। —তাফসীরে ইবনে কাছীর- ২৫৮ পৃঃ।

তোমরা ওখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাক– এ জবাবের পর দোযখের দরজা বন্ধ করা হবে এবং সেখানেই তারা চিরদিন অগ্নিদগ্ধ হতে থাকবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

"যারা কুফরী করে (ইসলাম গ্রহণ না করে) এবং আমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে দোযখের অধিবাসী। তাতেই তারা চিরদিন অবস্থান করবে।"

শেষ কথা

পাঠক মণ্ডলী এ পর্যন্ত দোযখের গঠন প্রকৃতি ও দোযখীদের মর্মান্তিক চিরন্তন শাস্তির অবস্থা পাঠ করলেন। এ কথাগুলো আমি এজন্য লেখিনি যে, ভাসমান দৃষ্টিতে পাঠ করে পুস্তকখানি আলমারিতে উঠিয়ে রাখবেন আর অপরাপর কেচ্ছা, কাহিনীর ন্যায় এ বিষয়গুলোকে পাঠ করে তা স্মৃতির অতল তলে লুকিয়ে রাখবেন। ইতিপূর্বে আমি যেসব বিষয় ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেছি, তা সবই কোরআন ও হাদীসের। নিঃসন্দেহে এগুলো বিশুদ্ধ ও সহীহ। এ বিষয়গুলো যদি বারবার পাঠ করা যায় এবং নিজের খারাপ চরিত্র ও বদ আমলের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তাহলে কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তিও নিজের জীবনকে খুব সহজেই পরিবর্তন করে নিতে পারে। নিজকে দোযখের পথ হতে ফিরিয়ে রেখে বেহেশতের পথে পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু শর্ত হল আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসূলকে সত্য মনে করতে হবে এবং তাদের বর্ণনাকৃত দোযখের অবস্থাকে সত্য, সঠিক ও বাস্তব মনে করতে হবে।

মুমিন বান্দারা সর্বদা নিজের জীবনের হিসাব নিজেই গ্রহণ করেন। আল্লাহর দরবারে দোযখের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'নয়ন ভাসিয়ে দোয়া করতে থাকেন। যে ব্যক্তি দোযখের এসব অবস্থাকে সঠিক মনে করে নিজের জীবনকে দুনিয়ার, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা এবং ক্ষণস্থায়ী মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের মধ্যে বিভোর থাকা হতে রক্ষা করে, সে ব্যক্তিই ভাল কাজ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে দোযখকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর বেহেশত গোপন রাখা হয়েছে নফসের অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে।" —বোখারী, মেশকাত।

অর্থাৎ গুনাহগার ও ফাসেক লোকেরা পার্থিব জীবনে আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার মধ্যে দিন যাপনের জন্য এমন কাজে লিপ্ত হয়, যার আড়ালে রয়েছে দোযখ। আর পুণ্যময় লোকেরা নাফসের অপছন্দনীয় জিনিসের মধ্যে জড়িত হয়ে এমন সব কাজে নিয়োজিত হয়, যার অন্তরালে রয়েছে বেহেশত। যারা আত্মহত্যা করে মনে করে যে, আমরা দুনিয়ার বিপদমুক্ত হলাম, তাদের তো দোযখের অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। আর যারা দুনিয়ার বিপদ-আপদ বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশায় অস্থির হয়ে বলে, আমার জন্য দোযখেও কি জায়গা নেই? তাদেরও দোযখের অবস্থা সম্পর্কে কোন খবর নেই।

আসল কথা হল দোযখের আগুন, দোযখের সাপ, বিচ্ছু, আগুনের কাপড়ের শাস্তির অবস্থা এবং দোযখের খাদ্যবস্তু ইত্যাদি বিষয় যদি মনের কিনারায় জাগরুক থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া, মন্ত্রীত্ব করা, নেতৃত্ব করা, এবং অন্যান্য পদলাভের জন্য গুনাহের কাজ করা, হারাম কামাই করা, ধন-সম্পদ প ীভূত করা ও বিষয়-সম্পত্তি লাভকরণে কখনও কেউ নিজের পরকালকে বিনষ্ট করত না। যার মনের আঙ্গিনায় দোযখের পিপাসাকাতর ও ক্ষুধার্ত থাকার কথা জাগরুক থাকে, সে কি কখনো রোযা পরিত্যাগ করতে পারে? যার মনে দোযখের লেলিহান শিখার কথা স্মরণ থাকে সে কি কখনো নিদ্রা ও ক্ষণস্থায়ী

আরামের জন্য নামায নষ্ট করতে পারে? দোযখের সাপ বিচ্ছুর দংশনের বিষক্রিয়ার কথা জানা থাকলে, সে কি কখনো বলতে পারে যে, দাড়ি রাখলে খুজলী হয় ? যাদের হুব্বুল হুজনের কথা জানা আছে, তারা কি রিয়াকার হয়ে ইবাদত করতে পারে ? ছবি নির্মাণ ও মূর্তি বানানোর পরিণামের কথা যারা জ্ঞাত, তারা কি কখনো প্রাণীর ছবি বানাতে পারে ? যাদের এ কথা স্মরণে থাকে যে, মদ পান করার শাস্তি হচ্ছে দোযখীদের দেহ হতে গলিত পুঁজ ও নির্ঝরা পান করা, তারা কি কখনো মদের ধারে কাছও যেতে পারে? কখনও নয়, কখনও নয়।

আসল কথা হচ্ছে, বেহেশত ও দোযখের অবস্থাটি শুধু আমাদের মুখের সীমায়ই আবদ্ধ হয়ে আছে, অন্তর ও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছেনি। নতুবা বড় গুনাহ তো দূরের কথা, আমাদের দ্বারা ছোট গুনাহ সংঘটিত হওয়াও সম্ভব হত না। হযরত আলী (রা) বলেন, বেহেশত ও দোযখ যদি আমার সম্মুখে রাখা হয়, তাহলে আমার ইয়াকীন ও বিশ্বাসে কিছুমাত্রও বৃদ্ধি ঘটবে না। অর্থাৎ গায়েব বিষয়ের প্রতি আমার ঈমান এতটা দৃঢ় ও মজবুত যে, নয়ন দ্বারা অবলোকন করলে যেরূপ বিশ্বাস হয়, বিনা দর্শনেও আমার অনুরূপ ঈমান রয়েছে। দোযখের অবস্থার বিশ্বাস যাদের হৃদয়ের গভীরে স্থান পেয়েছে তারা গুনাহ করা তো দূরের কথা; এ দুনিয়ায় তারা কখনো হাসতে পারে না, খুশীতে আহ্লাদিত হতে পারে না।

আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফেরেশতা জিবরীল (আঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ফেরেশতা মিকাইলকে কখনো হাসতে দেখিনি, এর কারণ কি? জিবরীল (আ) বললেন, দোযখ সৃষ্টির পর থেকে সে কখনো হাসেনি। —আহমদ, আততারগীব অততারহীব।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে,কোন এক সময় রাসূলুলাহ (সঃ) বলেছেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি যে দৃশ্য অবলোকন করেছি, তোমরা যদি সে দৃশ্য অবলোকন করতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি দৃশ্য দেখেছেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি বেহেশত ও দোযখ দেখেছি। —আততারগীব।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের হাসি দেখে আমার খুব বিস্ময় লাগে, অথচ দোযখ হতে রক্ষা পাওয়ার তাদের কোন নিশ্চয়তা নেই। হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন,কোন এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘর থেকে বাইরে গেলেন। তিনি দেখলেন, লোকেরা হা হা করে হাসছে। এ হাসি দেখে তিনি বললেন, তোমরা যদি স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটি অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে, তাহলে তোমাদেরকে এ অবস্থায় দেখতাম না, যে অবস্থায় এখন তোমাদেরকে দেখছি। —মেশকাত।

মোটকথা সচেতন মানুষ সে-ই, যে নিজের পরকালের জীবন গঠনে এবং গুনাহের মাধ্যমে দু'চার দিনের ধন-সম্পদ মান-সম্মান শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিজকে দোযখের পাত্রে পরিণত না করে। পরকালে যখন কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে, তখন অনুশোচনা করায় কোনই ফলোদয় হবে না।

বেহেশতের ন্যায় চির সুন্দর ও শান্তিময় স্থান লাভ করা সম্পর্কে উদাসীন হওয়া এবং চির অশান্তি ও দুঃখ-বেদনাপূর্ণ স্থান দোযখ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন চিন্তা না করা নির্বোধের কাজ ছাড়া কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমারা যতটা সম্ভব বেহেশতের সন্ধান কর, এবং যতটা সম্ভব দোযখ হতে দূরে পালাও। কেননা যে লোক বেহেশতের সন্ধানী হয় এবং দোযখ হতে ভয়ে পালায়, তার কখনো চিন্তাহীন নিদ্রা হতে পারে না।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ (রা) বলেন, মানুষ অভাব-অনটন ও দরিদ্রতাকে যতটা ভয় করে যদি দোযখকেও ততটা ভয় করত, তাহলে তারা সরাসরি বেহেশতে পৌঁছে যেত। হযরত মুহাম্মদ বিন আল মুনকির (রা) যখন রোনাজারী করতেন, তখন অশ্রু দিয়ে স্বীয় চেহারা ও দাড়ি মুছে নিতেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন ঃ আমি এ হাদীস অবগত হয়েছি যে, সে স্থানে দোযখের আগুনের স্পর্শ লাগবে না, যে স্থানে আল্লাহর ভয়ে নয়নের অশ্রু প্রবাহিত হয়।

জয়নাল আবেদীন (রা) কোন এক সময় নামায পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে গেল। কিন্তু তিনি নামায ছেড়ে আগুন নেভাতে আসলেন না। নামাযেই মশগুল রইলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি ঘরে আগুন লাগার খবর পাননি ? তিনি বললেন, আমাকে পরকালের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে অমনোযোগী করে রেখেছিল।

কথিত আছে যে, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি নিদ্রার জন্য শয্যায় গেলেন। তিনি ঘুমাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘুম আসছিল না। তিনি উঠে অজু করে নামায পড়া শুরু করলেন। আর আল্লাহ পাকের দরবারে এ মোনাজাত করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, দোযখের আগুনের ভয়ে আমি ঘুম হারিয়ে ফেলেছি। অতঃপর সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামাযেই মশগুল রইলেন।

আবু ইয়াজিদ (রা) সর্বদাই কাঁদতে থাকতেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা যদি বলতেন যে, গুনাহের কাজ করলে সর্বদা গোসলখানায় বন্দী করে রাখা হবে, তাহলে সে ভয়েও কখনো আমার অশ্রুধরা বন্ধ হত না। তিনি যখন গুনাহের কারণে সেই দোযখে বন্দী করে রাখার কথা বলেছেন, যার আগুন তিন হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়েছে, তখন কিভাবে আমি অশ্রু সংবরণ করতে পারি। আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে দোযখ থেকে রক্ষা করুন। আমীন!!

পরিশিষ্ট

দোযখ হতে রক্ষা পাওয়ার কিছু দোয়া

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবী (রা)গণকে যেভাবে কোরআন মজীদের সূরা শিক্ষা দিতেন, এ দোয়াটিও অনুরূপ গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিতেন। —মুসলিম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে দোযখের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবর আযাব থেকে। দাজ্জালের জীবন ও মৃত্যুর ফেৎনা হতে। —মুসলিম।

২. হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব বেশি বেশি করে এ দোয়া করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান আর আগুনের আযাব থেকে পরিত্রাণ দান করুন। —বোখারী, মুসলিম।

৩. রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নামক এক সাহাবীকে বলেছেন, মাগরিব নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ "হে আল্লাহ আমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

এ দোয়া পাঠ করার পর যদি ঐ রাতে তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে দোযখের আযাব থেকে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর ফজর নামাযের পর কারো সাথে কথা না বলে এ দোয়া সাতবার পাঠ করলে ঐ দিন যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে অবশ্যই তোমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

—নাসায়ী, আবু দাউদ, আততারগীব।

৪. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তিনবার আল্লাহ তাআ'লার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করলে বেহেশত তার জন্য এ দোয়া করে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ "হে আলাহ! একে বেহেশতে দাখিল করুন।"

আর কোন ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে দোযখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে দোযখ তার জন্য এ দোয়া করে ঃ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

"হে আল্লাহ! একে দোযখের আগুন হতে বাঁচান।" —তিরমিযী।

এখানেই শেষ করছি। চক্ষুসমানদের জন্য অল্পই যথেষ্ট, কিন্তু গাফেলদের জন্য গাদা গাদা পুস্তকও কিছু নয়। সর্বশেষ পাঠকবর্গের কাছে এ ফকীর ও অধমের জন্য এবং আমার পিতা সুফী মুহাম্মদ সাদেক (র)-এর জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি ও বেহেশতুল ফেরদাউস লাভের জন্য দোয়া করার আবেদন পেশ করছি।

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাতের নেয়ামত বা বেহেশতের সুখ-শান্তি

বেহেশতের নির্মাণ সামগ্রী

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশত কি দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, একটি স্বর্ণের ইট এবং একটি রৌপ্যের ইট এবং তার গাঁথুনীর মশল্লা হচ্ছে সুগন্ধী মেশক, আর কঙ্কর হচ্ছে মনিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথর। আর তার মাটি হচ্ছে জাফরান। যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে সর্বদাই অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে জীবন যাপন করবে। সে কখনো কোন কিছুর অভাব বোধ করবে না, চিরকাল সেথায় অবস্থান করবে। কখনো তার মৃত্যু ঘটবে না। বেহেশতীদের কাপড় কখনো পুরন হবে না এবং তাদের যৌবনও কখনো বিনষ্ট হবে না। —তিরমিযী, আহমদ, মেশকাত।

বেহেশতের প্রশস্ততা

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের প্রশস্ততা বর্ণনায় বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেশতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও, যে বেহেশতের প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান। তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তার শেষ রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।" —সূরা হাদীদ- ৩য় রুকু।

বেহেশত হচ্ছে এক বিশাল প্রশস্তময় স্থান। একজন সাধারণ মানুষ যে বেহেশত লাভ করবে, তার প্রশস্ততা দ্বারা বেহেশত যে কত বড় ও বিশাল তা অনুমান করা যায়। এক হাদীসে আছে, একজন সাধারণ বেহেশতী এক হাজার বছর পথ চলার দূরত্বে আপন নেয়ামতকে দেখতে পাবে।

—তিরমিযী, বায়হাকী, আততারগীব অততারহীব।

অন্য এক হাদীসে আছে, একজন সাধারণ বেহেশতী যে স্থান লাভ করবে, তা সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার দশগুণ স্থানের সমান হবে। —মুসলিম, মেশকাত।

মানুষের বোধগম্য করা এবং তাদেরকে সহজে বুঝানোর জন্য সূরা হাদীদে বেহেশতের প্রশস্ততাকে আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান বলা হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানে عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (বেহেশতের প্রশস্ততা সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সমান) বলা হয়েছে। আর এর বিশ্লেষণে সাধারণ বেহেশতী ব্যক্তির বেহেশত লাভের উপমা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একশত দরজা রয়েছে। সেসব দরজার কোন একটিতে যদি সমস্ত সৃষ্টি জগত রাখা হয়, তাহলে তা সবই রাখা যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতের দরজাসমূহ

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি ভালভাবে অযু করে, অতঃপর এ কালিমা পাঠ করে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ *

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল) তাহলে তার জন্য বেহেশতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। সে আপন ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজাপথে প্রবেশ করতে পারবে।

—মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের আটটি দরজা রয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পথে একই রকম দু'টি জিনিস ব্যয় করে। (যেমন– দু'দিরহাম, দু'দিনার, দু'টাকা, দু'টি কাপড়) তাহলে বেহেশতের দরজাসমূহ হতে তাঁকে আহ্বান করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযী ছিল, নামাযের দরজা হতে তাঁকে ডাকা হবে। যে জিহাদ করেছেন, তাকে জিহাদের দরজা হতে ডাকা হবে। সে দানকারী হলে তাকে দানের দরজা হতে ডাকা হবে। সে রোযাদার হলে তাকে বাবে রাইয়ান দরজা হতে ডাকা হবে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। সকল দরজা থেকেও কি কাউকে ডাকা হবে। আসলে এর তো কোন প্রয়োজন নেই, কেননা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই বেহেশতে প্রবেশ করা হয়। তারপরও জিজ্ঞেস করছি এমনটি কি হবে যে, কাউকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য সকল দরজা থেকে ডাকা হবে?

প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, হ্যাঁ এমন লোকও হবে (যাকে সমস্ত দরজা থেকে ডাকা হবে।) আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।

—বোখারী, মুসলিম।

ফাতহুলবারী গ্রন্থকার লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা বেহেশতের চারটি দরজার কথা জানা যায়। একটি হচ্ছে নামযের দরজা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে জিহাদের দরজা, তৃতীয়টি হচ্ছে দান-সদকার দরজা এবং চতুর্থটি হচ্ছে রাইয়্যান বা রোযার দরজা।

অতঃপর তিনি লিখেছেন , নিঃসন্দেহে বেহেশতে হজ্বের একটি দরজা থাকবে। আর সেসব ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্র একটি দরজা হবে, যারা গোস্‌সাকে দমন করে। যে সম্পর্কে মসনদে আহমদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, বেহেশতে আরও একটি দরজা হবে তাওয়াক্কুলকারী বান্দাদের জন্য, যারা বিনা

হিসাবে ও বিনা দুঃখ-কষ্টে এ দ্বারপথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর একটি দরজা হবে যিকিরের দরজা। এ সম্পর্কে তিরমিযীতে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অষ্টম দরজাটি যিকিরের দরজা না হয়ে বরং ইলমের দরজা হবে। —ফাতহুল বারী- ৭ম খণ্ড ২৮ পৃঃ।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "নেক আমলকারীদের জন্য আলাদা আলাদা দ্বারপথ নির্ধারণ করা হয়েছে", এখানে নেক আমল দ্বারা ফরজ-ওয়াজিব বুঝান হয়নি বরং তা দ্বারা নফল নেক আমলকে বুঝান হয়েছে। কেউ কোন নফল আমল খুব বেশি পরিমাণে করলে, সেই নফল আমলের জন্য সে ব্যক্তি নির্ধারিত দ্বারপথে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। —ফাতহুল বারী-ঐ।

এক সময় বসরা প্রদেশের আমীর হযরত উৎবা ইবনে গাজওয়ান (রা) খুৎবার সময় বললেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এমন এক জগতের অভিযাত্রী হবে, যেখান থেকে তোমাদের আর কোথাও যেতে হবে না। সুতরাং এখান থেকে তোমাদের উত্তম আমল নিয়ে রওয়ানা হওয়া উচিত। আমাদেরকে জানান হয়েছে যে, বেহেশতের দরজাসমূহের দু'দরজার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হচ্ছে চল্লিশ বছর পথ চলার সমান। আর এটা নিশ্চিত বিষয় যে, এমন একটি দিন আসবে যে, প্রবেশকারীদের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে এত বড় বিশাল দরজাও সংকীর্ণ হয়ে যাবে।
—মুসলিম, আততারগীব অততারহীব।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! বেহেশতের দরজাসমূহের দু'দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব এত বিশাল হবে। যেমন মক্কা ও হিজরের মধ্যবর্তী দূরত্ব।
—বোখারী, মুসলিম।

মাজমাউল বোখারী গ্রন্থকার লিখেন, হিজর হচ্ছে বাহরাইনের তৎকালীন রাজধানীর নাম।

উপরোক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা বেহেশতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। প্রথম হাদীসে দু'দরজার মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্বের কথা বলা হয়েছে চল্লিশ বছর পথ চলার সমান। আর দ্বিতীয় হাদীসে মধ্যবর্তী দূরত্বকে মক্কা ও হিজরের দূরত্বের উপমা দেয়া হয়েছে। বুঝার সহজকরণের জন্যই পরিভাষায় কখনো এভাবে কখনো ওভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বেহেশতের দরজাসমূহের প্রশস্ততা যে, অনেক অনেক বিশাল সেকথা নিশ্চিত। যেমন ঘর তেমনই তার দরজা।

হযরত সহল ইবনে সায়াদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মতের সত্তর হাজার অথবা সাত লাখ লোক পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের কাতারের প্রথম ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাতারের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে। (অর্থাৎ তাদের কাতারের সব লোক একই সময় প্রবেশ করবে।) অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, তাদের চেহারা এতটা উজ্জ্বল হবে, যেন চতুর্দশী পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ। —বোখারী, মুসলিম, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

বেহেশতে প্রবেশকারীদের দু'টি দল

সূরা ওয়াক্বিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা তিন দল লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে।

১. আসহাবুল ইয়ামীন বা আসহাবুল মায়মানা– অর্থাৎ ডানহাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ।

২. মুকার্‌রিবীন অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেমন– নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহর অলীগণ।

৩. আসহাবুশ শিমাল বা আসহাবুল মাশয়ামা অর্থাৎ বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণ।

উপরোক্ত প্রথম দু'দল বেহেশত লাভ করবেন বটে, কিন্তু তাদের পদমর্যাদায় অনেক ব্যবধান থাকবে। নৈকট্যপ্রাপ্তগণ বিশেষ বিশেষ উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর ডানহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত সাধারণ মুমিনগণ সেই অনুসারে নিম্ন শ্রেণীর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। আর তৃতীয় দলটির ভাগ্যে জুটবে দোযখ।

আল্লাহ তাআ'লা প্রথমত নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের মধ্যে বিরাট একটি দল হবে পূর্বকালের অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর আগের জমানার লোক। আর ক্ষুদ্র একটি দল হবে পরবর্তী কালের লোক।

পূর্বকালের এবং পরবর্তীকালের লোক কারা হবে সে সম্পর্কে বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন, مُتَقَدِّمِيْنَ পূর্বকালের লোকদের দ্বারা হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জমানার আগেকার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর পরবর্তীকালের দ্বারা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের কথা বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর তিনি লিখেছেন, পূর্ব জমানায় অধিক লোক হওয়া এবং পরের জমানায় কম লোক হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিশেষ লোকের সংখ্যা প্রত্যেক জমানাতেই কম হয়ে থাকে। যেহেতু নবী করীম (সঃ)-এর পূর্বের সময় কালটি ছিল অনেক অনেক দীর্ঘ। সুতরাং দীর্ঘ এ সময়ে যে পরিমাণ বিশেষ লোক পাওয়া যাবে, তাদের মধ্যে এক লাখ বা দু'লাখই হবেন নবী-রাসূল। আর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী সে অনুসারে ছোট জমানায় বিশেষ লোকদের সংখ্যা হবে কম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তার তাফসীরে পূর্ব জমানা ও পরের জমানার সূত্র আলোচনায় আর একটি মতবাদও উল্লেখ করেছেন।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড ১০৪ পৃঃ।

এখন নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কারের আলোচনায় আসুন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

"অগ্রগামীগণ তো অগ্রগামী হয়েছে। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত। তারা হবেন নেয়ামতপূর্ণ বেহেশতের অধিবাসী। তাদের মধ্যে বিরাট একটি দল হবে আগের জমানার, আর ছোট একটি দল হবে পরবর্তী জমানার। তারা স্বর্ণনির্মিত আসনে একে অপরের সম্মুখে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবেন। আর তাঁদের চতুর্পাশে ঘুরবে চির কিশোর বালকগণ, তাদের সেবায় পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত শূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। সে শূরা পানে তাদের শীরঃপীড়া হবে না এবং তারা অজ্ঞানও হবেন না। আর তাদের পছন্দমত ফলমূল এবং তাদের চাহিদা মাফিক পাখীর গোশত নিয়ে (তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে)। আর তাদের জন্য থাকবে আয়াতলোচনা হুর। যারা সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ। এসব দেয়া হবে তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। সেখানে তারা কোন অসার কথা ও পাপ বাক্য শুনবে না। কেবল শুনবে তারা সালাম আর সালাম অর্থাৎ শান্তিময় কথা। —সূরা ওয়াকিয়া, ১০-২৬।

এরপর আল্লাহ তাআ'লা আসহাবুল ইয়ামীন বা আমলনামা ডানহাতে প্রাপ্তদের পুরস্কার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"আর যারা ডান হাতের মালিক অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামা পেয়েছে, সে কতই না উত্তম। তাঁরা অবস্থান করবে এমন এক বেহেশতে, যেখানে থাকবে কণ্ঠকহীন কুল বৃক্ষ, কাদিভরা কদলী গাছ, সম্প্রসারিত বিরাট ছায়া, সদা প্রবাহমান পানি ও প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না এবং যা বন্ধ করাও হবে না। আর থাকবে উঁচু উঁচু বিছানা। আর আমি হুরদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা আসহাবুল ইয়ামীন বা ডানদিকের লোকদের জন্য। তাদের এক বিরাট দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে, আর এক বড় দল হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

—সূরা ওয়াকিয়া- ২৭-৪০

নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সেসব সামগ্রী যা শহুরে লোকদের কাছে খুব প্রিয়, আর ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সেসব সামগ্রী যা গ্রাম্য লোকদের কাছে খুব পছন্দনীয়। সুতরাং এর দ্বারা এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, শহুরে ও গ্রাম্য লোকদের মধ্যে মান ও মর্যাদায় যেরূপ পার্থক্য বিদ্যমান, অনুরূপ নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের মান-মর্যাদায়ও ব্যবধান হবে। —বয়ানুল কোরআন।

এখানে এ অর্থ বুঝার কোন অবকাশ নেই যে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের পুরস্কার স্বরূপ যেসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ডান হাতে আমলমানা প্রাপ্তগণ তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পুরস্কারে যেসব সামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য থাকবে না। কেননা নেয়ামতের মধ্যে তো সবই থাকবে, এবং কচি বালক, হুর গেলমান শরাবের পাত্র, ফলমূল ইত্যাদি সবই তারা পাবে। তবে এ আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের শ্রেণী ও মর্যাদায় বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকবে।

সাধারণ বেহেশতীদেরকেই আসহাবুল ইয়ামীন (ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে। কেননা তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। যদিও এ বিষয়টি নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণ মুমিনগণকে বিশেষভাবে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে আসহাবুল ইয়ামীন হওয়ার বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অধিক কোন বৈশিষ্ট্য, যেমন বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি নেই। —বয়ানুল কোরআন।

সম্মানের সাথে বেহেশতে প্রবেশ ও ফেরেশতাদের মুবারকবাদ

এ প্রসঙ্গে সূরা হিজর এ আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ *

"নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ প্রবাহিত প্রস্রবণ ও বেহেশতের অধিবাসী হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা চিরশান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বেহেশতে প্রবেশ কর।" —সূরা হিজর-৪র্থ রুকু।

সূরা ঝুমারে বলেন ঃ "অবশেষে তারা যখন বেহেশতের কাছে আসবে, তখন বেহেশতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হবে। আর বেহেশতের প্রহরী ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা চিরসুখী হও এবং চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে প্রবেশ কর।" —সূরা যুমার শেষ রুকু।

অর্থাৎ তাদেরকে বেহেশতে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য সম্মান প্রদর্শন ও অভ্যর্থনার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করান হবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য আগে থেকেই বেহেশতের দরজা খুলে রাখা হবে। বেহেশতের প্রহরী ফেরেশতা তাদেরকে সালাম করবে এবং সুখী-সমৃদ্ধশালী ও বিলাসবহুল জীবনের জন্য মুবারকবাদ জানাবে। আর তাদেরকে শুনানো হবে যে, আপনারা এমন এক স্থানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাচ্ছেন, যেখানে রয়েছে শান্তি আর শান্তি। সেখানে ভয়-ভীতি, দুঃখ-চিন্তা, বেদনা, অস্থিরতা ইত্যাদি কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সেখানে শান্তি ও আমোদ-প্রমোদের পরিবেশ থাকবে চির বিরাজমান।

বেহেশতে প্রবেশের পর মুবারকবাদ

বেহেশতে প্রবেশের পর ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে এসে মুমিনদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"যারা স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য পার্থিব জীবনে ধৈর্য ধারণ করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করেছে। আর ভাল ও পুণ্যময় কর্ম দ্বারা খারাপ ও পাপ কাজের অপনোদন করেছে। তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।

অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তাদের পিতা-মাতা স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে যারা উপযুক্ত হবে, তারাও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেক দরজা হতে মুবারকবাদ জানানোর জন্য তাদের কাছে আসবে। তারা বলবে, ধৈর্য ধারণ করার কারণে তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের শুভ পরিণাম কতই না সুন্দর ও উত্তম।" —সূরা রা'আদ – ৩ রুকু।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতীদেরকে বেহেশতে প্রবেশের জন্য মুবারকবাদ জানাতে ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে দলে দলে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। আর তাদের পুরস্কার আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ এবং চিরশান্তি নিকেতনে নবীগণ এবং সিদ্দীকগণের প্রতিবেশীরূপে বসবাস করার যে সৌভাগ্য হয়েছে। সে জন্য তারা তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবেন। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ২য় খণ্ড ৫১০ পৃঃ।

বেহেশতে প্রবেশের পর বেহেশতীদের শুকরিয়া আদায়

বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশের পর আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনে পঞ্চমুখ হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"বেহেশতীগণ (বেহেশতে প্রবেশ করার পর) বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার জন্য নিবেদিত, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে আমাদের কাছে সত্য প্রমাণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ সুখময় বেহেশতের অধিকারী করেছেন। ফলে বেহেশতের যে স্থানে ইচ্ছে আমরা স্থানগ্রহণ করে নিতে পারি। বাস্তবিকই (পার্থিব জীবনে) উত্তম আমলকারীদের জন্য এটা চমৎকার প্রতিদান।"

—সূরা যুমার– শেষ রুকু।

"আমাদের যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানেই স্থান গ্রহণ করে নিতে পারি" এ কথাটির অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক বেহেশতীকে বিরাট বিরাট স্থান দান করবেন। তাদের পুরোপুরি অধিকার রয়েছে যে, তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানেই অবস্থান করতে পারবে, তাতে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে না। আর সেখানে এমন কোন জায়গাও থাকবে না যা বসবাসের অনুপযোগী। তারা যদি আপন স্থান ছেড়ে অন্য কোন বেহেশতীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তবে তাও তাঁরা করতে পারবে।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের একে অপরের প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল, আমি তা তাদের অন্তর থেকে দূর করে দেব। আর বেহেশতের তলদেশে নহর প্রবাহিত হবে। আর তারা বলতে থাকবে, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআ'লার জন্য যিনি আমাদেরকে এ স্থানে পৌঁছিয়েছেন। আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন, তাহলে আমরা এ স্থানে পৌঁছতে পারতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূল মহাসত্যসহ এসেছিলেন । অতঃপর তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, তোমরা যে পার্থিব জীবনে আমল করতে তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এ বেহেশতের অধিকারী করা হল।" —সূরা আর'াফ– ৫ম রুকু।

বেহেশতীদের প্রথম নাস্তা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মত হয়ে যাবে। আর মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী সত্তা আপন কুদরতের সাহায্যে তাকে এমন ভাবে ওলট পালট করবেন। তোমরা যেমন পরিভ্রমণের সময় রুটি এপিঠ ও পিঠ করে থাক। আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের জন্য পৃথিবীকে প্রথম নাস্তার বস্তুতে পরিণত করবেন। নবী করীম (সঃ) একথা বলার সময়ে সেখানে জনৈক ইহুদীলোক এসে উপস্থিত হয়ে বলে উঠল, হে আবুল কাসেম, দয়াময় তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন। আমি কি তোমার কাছে একথা বলব যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীগণকে প্রথমত কি দ্বারা মেহমানদারী করবেন? নবী করীম (সঃ) বলবেন, হ্যাঁ বল। তখন সে অনুরূপ কথাই বলল, ইতিপূর্বে নবী করীম (স) যেরূপ বলেছিলেন। পৃথিবীকে একটি রুটিতে পরিণত করা হবে। (আর বেহেশতবাসীরা সর্বাগ্রে তা নাস্তারূপে আহার করবে।) বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম (সঃ) ইহুদী ব্যক্তির মুখে একথা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তার নীচের দাঁড়ি মুবারকও দেখা যাচ্ছিল।

তিনি এ আনন্দেই হেসেছিলেন যে, মহান আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী নবীদেরকে যে জ্ঞান দান করে ছিলেন, তা আমাকেও দান করেছেন। যে জ্ঞানের কিছু কিছু অংশ বর্ণনা পরম্পরায় ইহুদীদের মাঝেও প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে। এরপর ঐ ইহুদী ব্যক্তি বলল, আমি কি আপনাকে এও জানাবো যে, বেহেশতীগণের ব্যঞ্জন বা তরকারী কি হবে? যা দ্বারা তারা প্রথম মেহমানীর পৃথিবীর জমীনের তৈরী রুটি ভক্ষণ করবে? রাসূল (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, তাও বল। ইহুদী বললো ঃ তাদের ব্যঞ্জনা বা রুটি খাবার তরকারী হবে ষাঁড়ের গোশত ও মাছ। আর সে ষাঁড় ও মাছের কলিজা এত বড় হবে যে, তার বাড়তি অংশ দ্বারা সত্তর হাজার ব্যক্তি নাস্তা খেতে পারবে। —জামউল ফাওয়ায়েদ।

বেহেশতে পানাহারের জন্য থাকবে অফুরন্ত নেয়ামতরাজী। সেখানে অবস্থান নেয়ার পর বেহেশতীগণ নিয়মিতভাবে পানাহার করতে থাকবেন। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রথম মেহমানদারীর জন্য তাদেরকে যে নাস্তা প্রদান করা হবে, তা হবে পৃথিবীর রুটি। এ নাস্তা খাওয়ানোর মধ্যে এ ফায়দা নিহিত আছে যে, পৃথিবীতে নানা প্রকার মজাদার জিনিস রয়েছে, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের ফল-মূল শস্য ও সব্জীসহ অন্যান্য বস্তুতে বিদ্যমান। যেহেতু কোন মানুষই পৃথিবীতে উৎপাদিত সমস্ত নেয়ামত আহার করেনি বরং অনেক ফলমূল ও খাদ্যবস্তু হতে তারা ছিল বঞ্চিত। এ কারণে পৃথিবীকে রুটিতে পরিণত করে বেহেশতীগণকে মোটামুটিভাবে সমস্ত বস্তুর স্বাদ আহরণ করান হবে। ফলে তারা যখন বেহেশতের নেয়ামতসমূহ পানাহার করবে, তখন বাস্তবভাবে সকলের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, দুনিয়াতে যা কিছুই আমরা আহার করেছি তা বেহেশতের নেয়ামতের তুলনায় কিছুই নয়।

উপরোক্ত হাদীসে ইহুদী ব্যক্তি যে রুটির সাথে ষাঁড়ের গোশত ও মাছের নাস্তার কথা উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (সঃ) তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় সে সঠিক কথাই বলেছে। আর কলিজার বাড়তি অংশ দ্বারা সত্তর হাজার মানুষ খেতে পারবে, এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী (র) লেখেছেন, কলিজার সাথে এক টুকরা মাংস থাকে। যা পুরো কলিজার সর্বোত্তম অংশ। কলিজার বাড়তি অংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আমরা তো সাভাবিকভাবে দেখি যে, যখন কোন পোকা-মাকড় ধরনের কিছু খাদ্যের সাথে মিশে যায়, তখন সে খাদ্য খাওয়া হয় না। সুতরাং পৃথিবীকে রুটিতে পরিণত করা হলে তা কিভাবে আহার করা যাবে?

এর উত্তর হচ্ছে, পৃথিবীতে যত প্রকার খাদ্যশস্য ফলমূল, তরিতরকারি ও শাকসব্জি পাওয়া যায় সবই মাটি থেকে উৎপন্ন হয়। যে মহাশক্তিমান সত্তা মাটি হতে এসব মজাদার জিনিস উৎপন্ন করেন, তার এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, মূল মাটিকেও তিনি খাদ্যসামগ্রীতে পরিণত করতে পারেন এবং তাকে তিনি এমনভাবে তৈরী করবেন যে, তা খেতে যেমন মজাদার হবে এবং গলধকরণেও হবে তদরূপ সহজ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআ'লা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

বেহেশতীদের অবয়ব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুলাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে সর্বপ্রথম যে দলটি প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে চতুর্দশী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। এরপর দ্বিতীয় দলে যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় । বেহেশতের সমস্ত লোক একমনা হবে। (তাদের দেহ বিভিন্ন হলেও তারা হবে একমনা এবং পরস্পর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ।) তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং তাদের মধ্যে থাকবে না কোন হিংসা-বিদ্বেষ। তাদের প্রত্যেকের জন্য (হুরদের মধ্য থেকে) কম পক্ষে দু'জন স্ত্রী থাকবে। সে স্ত্রীদের প্রত্যেকের পায়ের নলার হাড় মাংসের উপর দিয়ে পরিদৃষ্ট হবে। বেহেশতীগণ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআ'লার গুণগানে নিমগ্ন থাকবেন। সেখানে তারা কেউ অসুস্থ হবেন না এবং পায়খানা-প্রস্রাবেরও প্রয়োজন থাকবে না। তাদের নাক থেকে সর্দিও ঝরবে না। তাঁরা থুথু ফেলবেন না। তাদের আসবাব ও তৈজষপত্রগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। হাতের কাঙ্কন হবে স্বর্ণ নির্মিত। তাদের আংটিতে সুগন্ধি প্রবাহিত করার জন্য উদকাঠ প্রজ্জ্বলিত করা হবে। আর তাদের ঘাম মেশকের সুঘ্রাণ যুক্ত হবে। তারা সকলে আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর অবয়ব কাঠামোর অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট হবে। আর দৈর্ঘ্যে হবে আদম (আঃ)-এর অনুরূপ ষাট গজ। —বোখারী, মুসলিম।

এ হাদীস দ্বারা বেহেশতীদের সৌন্দর্য এবং তাদের স্ত্রীদের রূপমাধুরীর কথা জানা যায়। তাছাড়া তাদের পাক পবিত্রতার কথাও সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে যে,

তাদের নাক ঝাড়া, পেশাব-পায়খানা ও থুথু নিক্ষেপ ইত্যাদি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। তাদের দেহে গরমের কারণে কোন ঘাম হবে না বরং তাদের দেহ থেকে যে ঘাম বের হবে, তা হবে খুবই সুগন্ধযুক্ত মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ।

উপরোক্ত হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, বেহেশতীদের আংটিতে থাকবে জ্বলন্ত উদকাঠ। এর অর্থ হচ্ছে উদ্‌কে যদি কাঠ মনে করা হয়, যার দ্বারা সুগন্ধি আগর বাতি বানান হয়। আর এটা খুবই মূল্যবান জিনিস, যা তরল করে ছোট ছোট কাঠিতে মিশিয়ে বাতি জ্বালান হয়। বেহেশতে কোন বস্তুর ঘাটতি থাকবে না। তাই সেখানে সুঘ্রাণের জন্য উদের জ্বলন্ত কাঠ দ্বারা আগরবাতি বানানোর কোন প্রয়োজন হবে না। এ উদকাঠ দুনিয়ার উদকাঠের মত নয়, আর এ আংটি যে আগুন দ্বারা জ্বলতে থাকবে, অন্য কোন জিনিস দ্বারা সে সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

সহীহ বোখারী শরীফে আছে, আল্লাহ তাআ'লা যখন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি ছিলেন লম্বায় ষাট হাত। আর বেহেশতে যারাই প্রবেশ করবে, তারা সকলেই লম্বায় আদম (আ)-এর অনুরূপ ষাট হাত হবেন। —বোখারী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়া যে, এত বড় লম্বা লম্বা মানুষ দেখতে কি ভাল দেখাবে?

এর উত্তর হল, সমস্ত মানুষ যখন একই আকারেই হবে, তখন কারো আকারই কারো কাছে বেমানান মনে হবে না। বরং সকলের কাছেই তা হবে পছন্দনীয়।

উপরোক্ত হাদীসের বক্তব্য "সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ" সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারকগণ লিখেছেন, এর দ্বারা আসল সকাল সন্ধ্যাকে বুঝান হয়নি। কেননা বেহেশতে কোন উদয়-অস্ত থাকবে না। বরং সব সময় একই অবস্থা বিরাজমান থাকবে। সেখানে দিবা-রাতের আগমন হবে না, ফাতহুল বারী গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদের হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআ'লার আরশের নিচে একটি পর্দা ঝুলন্ত আছে। সে পর্দাটি আবৃত করায় সন্ধ্যা বুঝা যাবে, আর সরিয়ে ফেললে ভোর হওয়া বুঝা যাবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিরতি অতিবাহিত হওয়া দ্বারা সকাল-সন্ধ্যার নিদর্শন প্রকাশ পাবে। আর এ সময়টি হবে আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ তাহলীলে মাশগুল হওয়ার সময়। যদিও বেহেশতে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ন্যায় সর্বদা স্বাভাবিকভাবেই তাসবীহ তাহলীল জারি থাকবে, কিন্তু বেহেশতীগণ নিজের ইচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ তাহলীল পাঠে মশগুল থাকাকে পছন্দ করবে। —তিরমিযী, দারেমী।

বেহেশতীদের দাড়ি থাকবে না, তাদের চোখ হবে সুরমা মাখানো

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের দাড়ি থাকবে না। তাদের নয়নযুগল এমন সুন্দর হবে যে, সুরমা লাগান ছাড়াই তা সুরমা বিশিষ্ট হবে। তাদের যৌবন কখনো বিনষ্ট হবে না এবং তাদের কাপড়ও কখনো পুরান হবে না। —তিরমিযী, দারেমী।

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বেহেশতীগণ আজরদ ও আমরদ হবেন। এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেহে কোন পশম থাকবে না এবং নারী পুরুষ সকলেই দাড়িহীন হবেন। দেহে পশম না থাকার দু'টি অর্থ হয়, একটি হচ্ছে– মাথার চুল ছাড়া দেহের কোন স্থানেই চুল বা পশম থাকবে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– দেহের যেসব স্থানের চুল কাটতে হয়, যেমন বগল ও নাভীর নীচের চুল। সেসব স্থানে আদৌ কোন চুল থাকবে না। আর বুক ও রানে যে পশম হবে, তা হবে খুবই অল্প ও ছোট ছোট। আর চামড়ার সৌন্দর্য নষ্ট করে এমন ঘন হয়েও তা হবে না। মাথার চুলের কথা কোন হাদীসেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বোখারী বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের মাথায় চুল থাকবে।

মুখমণ্ডলে দাড়ি না হওয়ার আশাটি বেহেশতে পূরণ করা হবে। আমাদের এক বুযুর্গ আলেম ব্যক্তির কাছে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, বেহেশতে পুরুষের দাড়ি না হওয়ার মধ্যে কি ফায়দা নিহিত আছে? প্রত্যুত্তর তিনি বললেন, এর উত্তর তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত, যারা দাড়ি কামায়। মোট কথা বেহেশতের প্রতিটি বস্তুই হবে সুন্দর। দাড়ি না থাকলেও পুরুষের সৌন্দর্য সর্বদাই দ্বিগুণ আকারে বলবৎ থাকবে। দেহের অভ্যন্তর হতে এমন কোন পশম গজাবে না, যা কামানোর প্রয়োজন পরে এবং তাতে চামড়ার সৌন্দর্য ব্যাহত হয়।

বেহেশতীদের দৈহিক সুস্থতা ও যৌন ক্ষমতা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এ ঘোষণা করবেন, হে বেহেশতীগণ! তোমাদের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, তোমরা চির সুস্থ থাকবে। কখনই কোন রোগ-ব্যাধি হবে না। আর এ সিদ্ধান্তও হয়েছে যে, তোমরা চিরঞ্জীব থাকবে। কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। তোমরা সর্বদাই জওয়ান থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নেয়ামত ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। কখনো কোন জিনিসের জন্য অভাব বোধ করবে না এবং কারো মুখাপেক্ষীও হবে না।
—মুসলিম, মেশকাত।

বেহেশতীদের বয়স

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন এ পার্থিব জীবন থেকে চিরবিদায় নেন, সে ছোট হোক কিংবা বড়, যুবক কিংবা বৃদ্ধ, বেহেশতে প্রবেশের সময় সবাকেই ত্রিশ বছর বয়সের ভরা যৌবনের যুবকে পরিণত করা হবে।[১] এ বয়সের সীমা কখনোই বাড়বে না।
—মেশকাত, তিরমিযী।

ত্রিশ বছর বয়সটি হচ্ছে মধ্যম মানের বয়স। এ বয়সে যেমন শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা থাকে না, তেমনি যুবকসুলভ পাগলামীপনা ও বৃদ্ধপনার কোন ছাপও থাকে না। এ বয়সে পূর্ণ যৌবন এবং বুদ্ধির পরিপক্কতা দু'ই অর্জিত হয় পরিপূর্ণরূপে। সতর্কতা, চেতনা, অনুভূতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা থাকে পুরোপুরিভাবে বিরাজমান। এ কারণেই বেহেশতীদের জন্য এ বয়সকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। ছোট হোক কিংবা বড় প্রত্যেককেই ত্রিশ বছর বয়সী করে দেয়া হবে। অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত ত্রিশ বছর বয়সের যে বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও অবস্থা হয়, তা সবই বেহেশতীদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। তারা সর্বদাই বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু কখনো তারা বৃদ্ধ হবে না এবং তাদের যৌবনেও ভাটা পড়বে না। তাদের চেতনা অনুভূতিতেও কখনো জড়তা দেখা দেবে না। কখনো দাঁত পরবে না এবং দৃষ্টি শক্তিতেও কোন বৈপরিত্য দেখা দেবে না। কোন কোন হাদীসে বেহেশতীদের বয়স তেত্রিশ বছরও উল্লেখ করা হয়েছে।

বেহেশতের বাগবাগিচা ও বৃক্ষরাজি

কোরআন মজীদের সূরা নাবাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا لاحَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَّكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَّكَأْسًا دِهَاقًا *

"নিঃসন্দেহে মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে বিরাট সাফল্য। তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতে অনেক রকমারী বাগবাগিচা; আঙ্গুর ফল, ভরাযৌবনা সমবয়স্কা সোহাগিনী মহিলা এবং পবিত্র পানীয় পূর্ণ পানপাত্র।" —সূরা নাবা।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ বাগবাগিচা ও প্রবাহমান ঝরণার পরশে বসবাস করবে। তাদের প্রতিপালক তাদের যা কিছু দান করবেন, তা তারা গ্রহণ করবে। কেননা এ জীবনের পূর্বে (পার্থিব জীবনে) তারা সৎ কর্মশীল ছিল। —সূরা যারিয়াত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় সর্বোত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একশত বছর পর্যন্ত দৌড়াতে থাকলেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। —বোখারী, মুসলিম, আততারগীব অততারহীব।

অতঃপর তিনি (সঃ) সূরা ওয়াকিয়ার। এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَذَالِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُودُ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ *

(সে ছায়া হবে বিরাটকায় লম্বা।) পাঠ করে বললেন, সে ছায়া হবে এ বৃক্ষেরই ছায়া। —তিরমিযী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে এমন কোন বৃক্ষ থাকবে না, যার মূল কাণ্ডটি স্বর্ণের হবে না।

—তিরমিযী, আততারগীব, অততারহীব।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি সালমান (রা) এর কাছে গেলাম। তিনি কথা বলতে বলতে এমন একখানা ছোট কাঠ বের করলেন যা তার আঙ্গুলের মধ্যে দিয়ে ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। তা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, হে জারীর! তুমি যদি বেহেশতে এতটুকু পরিমাণ কাঠও তালাশ কর, তবে তা-ও পাবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ কোথায় থাকবে (যার বর্ণনা কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান) তিনি বললেন, সেখানে খেজুর ও অন্যান্য গাছ থাকবে ঠিকই কিন্তু কাঠ পাওয়া যাবে না। সে গাছগুলোর কাণ্ড হবে স্বর্ণ ও মোতি নির্মিত। তার উপরে খেজুর ফল ঝুলতে থাকবে। —বায়হাকী; আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

কোরআন মজীদের সূরা আররহমানের তৃতীয় রুকুর প্রথম অংশে দু'টি বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে বাগান হবে আল্লাহ তাআ'লার বিশিষ্ট নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেহেশতে দু'টি বাগান লাভ করবে। অতঃপর প্রথম রুকুর দ্বিতীয়াংশে অন্য দু'টি বাগানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা হবে সাধারণ মুমিন ব্যক্তিদের জন্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই দু' দু'টি বাগান লাভ করবে কিন্তু সে বাগান হবে নৈকট্যপ্রাপ্তগণের বাগানের তুলনায় নিম্নমানের। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করেছিল, তাদের জন্য থাকবে দু'টি বাগান। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে বাগান দু'টি হবে অনেক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এ বাগান দু'টিতে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে। সে বাগান দু'টিতে প্রত্যেক ফলফলারি রয়েছে দু'প্রকার। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেখানে বেহেশতীরা নিজেদের বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। আর সে বিছানার আস্তর হবে পুরু রেশমের। আর দু' উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেসব বেহেশতে রয়েছে অনেক আয়তনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে মহিলারা প্রবাল ও পদ্মরাগের মত। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?" —সূরা আর-রাহমান– ৩য় রুকু।

এই যে, বলা হয়েছে, বেহেশতী বাগানের প্রতিটি ফল দু' দু'প্রকারে হবে। এ সম্পর্কে তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীল গ্রন্থকার কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেমের অভিমত উল্লেখ করে লিখেছেন, এক প্রকার ফল হবে রসালো, আর এক প্রকার হবে শুকনো।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত বাগানের কথা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"এ দু'টি বাগান ছাড়া (নিম্নমানের) আরো দু'টি বাগান থাকবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? ঐ বাগান দু'টি হবে ঘন সবুজ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতেকে অস্বীকার করবে? এ দু'টি বাগানে থাকবে দু'টি খরস্রোতা ঝরণাধারা। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? এ দু'টি বাগানে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে বাগানে থাকবে খুব সুন্দরী ও পবিত্র চরিত্রের নারীগণ। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তাতে শিবিরে সুরক্ষিত হুরগণ থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেসব মহিলাদেরকে পূর্বে কখনো কোন মানুষ ও জিন স্পর্শ করেনি। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ ও বিস্ময়কর সুন্দর গালিচায়। সুতরাং তোমারা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।" —সূরা আর-রহমান।

বেহেশতের ফল-ফলারি ঃ

বেহেশতীদের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনের জন্য সেখানে নানা প্রকার ফলমূল ও আহার্য থাকবে। এ বিষয়ে কোরআন মজীদের বহু স্থানে আল্লাহ তাআ'লা আলোচনা করেছেন। সূরা ছোয়াদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ *

"বেহেশতী লোকেরা সেখানে হেলান দিয়ে থাকবে এবং তারা বহুবীধ ফলমূল ও পানীয় দ্রব্য পাবে।" —সূরা ছোয়াদ -৪র্থ রুকু।

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ *

"তাদের জন্য সেখানে রয়েছে ফলমূল আর তারা যা কিছু চাইবে তা সবই। —সূরা ইয়াসীন– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি। মজাদার এবং মনের বাসনা অনুযায়ী তারা যা কিছু চাইবে, তাদের জন্য তাই উপস্থিত করা হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় ফলফলারির কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَّلَا مَمْنُوعَةٍ *

"ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তগণ বিপুল ফলফলারির মধ্যে থাকবে। তা কখনো শেষ হবে না এবং বন্ধ করাও হবে না।" —সূরা ওয়াকিয়া- ১ম রুকু।

সূরা দাহারে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا *

"সেখানকার অবস্থা এমন হবে যে, তাদের উপর বৃক্ষের ছায়া অবনমিত থাকবে। আর বেহেশতের ফলফলারি তাদের ইখতিয়ারধীন করা হবে।"

—সূরা দাহার- ২ রুকু।

হযরত বারায়া ইবনে আযিব (রা) وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনায় বলেন, বেহেশতীগণ দাড়ান, বসা এবং শোয়া অবস্থায় বেহেশতের ফলফলারি আহার করবে। —বায়হাকী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন কোন ফল পেতে চাইবে তখন সে ফল তার কাছে চলে আসবে। গাছের শাখা নোয়ায়ে তার সম্মুখে ধরা হবে। মনে হবে যেন শ্রোতা খুবই আনুগত। তাঁরা দণ্ডায়মান হলে ফলটিও শাখাসহ উর্দ্ধে উঠে যাবে। আর সে যদি বসে বা শয়ন করে, তখন ফলটিও শাখা নোয়ায়ে তার হাতের নাগালের মধ্যেই থাকবে।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর- ৪র্থ খণ্ড।

তাফসীরে 'মুয়ালিমুত তানযীল' গ্রন্থকার وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, বেহেশতের ফলবান বৃক্ষগুলো নিজে নিজেই আল্লাহ্ তাআ'লার বন্ধুদের হাতের নাগালে চলে আসবে। ইচ্ছা করলেই তাঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফল পাড়তে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বসে বসেও হাতে নিতে পারবেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, ফল দূরে থাকা এবং গাছে কাঁটা থাকার কারণে বেহেশতীগণ কখনও তা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কেননা গাছগুলো নিজে নিজেই তাদের নিকটবর্তী হবে। আর তাতে কোন কাঁটাও থাকবে না।"

—তাফসীর ইবনে কাছীর।

কোরআন মজীদে বেহেশতী খেজুর, আঙ্গুর, আনার কুল ও বড়ই ফলের কথা নাম ধরেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সেখানে আরো অগণিত বিভিন্ন প্রকার ফলফলারির সমাহার থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে এমন কোন মিষ্টি বা টক ফল নেই, যা বেহেশতে পাওয়া যাবে না। এমনকি সেখানে অতিশয় তিক্ত মাকাল (হানযাল) ফলও পাওয়া যাবে, তা হবে মিষ্টি। —তাফসীরে বাগবী।

সূরা মুহাম্মদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ *

অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা।" —সূরা মুহাম্মদ- ২য় রুকু।

সূরা বাকারায় বলেছেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে, এবং নেক আমল করেছে, তাদেরকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। তারা যখন বেহেশতের কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখন প্রত্যেক বারই তারা বলবে, এ তো সেই ফল যা আমরা পূর্বেও খেয়েছি। তাদেরকে এরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ অনেক ফলফলারি দেয়া হবে। আর তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

—সূরা বাকারা- ৩ রুকু।

বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লিখেছেন, অধিক সৌন্দর্যের কারণে উভয় বারের ফলফলারির রূপ ও আকার একই ধরনের মনে হবে। যার কারণে তারা মনে করবে যে, এগুলো পূর্ববর্তী ফল। খেতে কিন্তু ভিন্ন স্বাদের। ফলে তারা আরো অধিক পরিতৃপ্তি ও প্রফুল্লাতা লাভ করবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা)সহ অন্যান্য হযরতদের এ মতামত বর্ণনা করেছেন যে, বেহেশতীগণ ফলের রূপাকৃতি দেখে বলবে, তো আমরা দুনিয়াতেও দেখেছি। কিন্তু যখন তা খাবে তখন বুঝতে পারবে যে, রূপ ও আকৃতিতে মিল থাকলেও এর স্বাদ আলাদা।

মেশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের সূর্য গ্রহণের নামাযের অধ্যায়ে বোখারী ও মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হলে নবী করীম (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়ালেন। সে নামায ছিল খুবই দির্ঘ। তিনি যখন নামাযের সালাম ফেরালেন, তখন সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে চন্দ্র বা সুর্যের গ্রহণ হয় না। সুতরাং তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহ তাআ'লার যিকিরে মশগুল হবে। সাহাবী (রা)গণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!" আমরা দেখলাম, আপনি নামাযরত অবস্থায় নিজ স্থান হতে কিছু নিতে চেয়েছেন, এরপর দেখলাম, আপনি পিছনে চলে এলেন (এটা কি জন্য)? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় বেহেশত দেখছিলাম। প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় বেহেশত দেখছিলাম। তখন বেহেশতের ফলের একটি ছড়া নেয়ার ইচ্ছে

করলাম। আর আমি যদি তার একটি ছড়াও নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্তও তোমরা সে ছড়া থেকে ফল খেতে পারতে (এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতের ফলের ছড়াগুলো কত বড় হবে)। —মেশকাত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার সম্মুখে বেহেশত তুলে ধরা হলে আমি তোমাদেরকে দেখাবার জন্য আঙ্গুরের একটি ছড়া তুলে আনার ইচ্ছে করলাম। কিন্তু এ সময় আমার ও আঙ্গুরের ছড়ার মধ্যে পর্দা সৃষ্টি হয়ে গেল, তাই আমি আর তা আনতে সক্ষম হলাম না। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! একটি আঙ্গুরে কি পরিমাণ রস হবে? তিনি বললেন, তোমার পিতা চামড়া কেটে সবচেয়ে বড় যে বালতি বানিয়েছে। (তা স্মরণ করে চিন্তা কর। অর্থাৎ তার এক দানার রসে বড় বড় বালতিও ভরে যাবে।) —আবু ইয়ালা, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু হোযায়েল (রা) বলেন, আমরা একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাথে সিরিয়ায় অথবা ওমানে অবস্থান করতে ছিলাম। এ সময় আমাদের পরস্পরের মাঝে বেহেশত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, বেহেশতের আঙ্গুরগুলোর মধ্যে এমন একটি বড় আঙ্গুর রয়েছে, যার আকার হবে এখান থেকে সানাআ শহর পর্যন্ত।
—ইবনে আবু দুনিয়া, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বেহেশতের খেজুর হবে লম্বায় বার হাত পরিমাণ। তাতে এর চেয়ে ছোট কোন খেজুর নেই।"
—ইবনে আবি দুনিয়া, আত্তারগীব অত্তারহীব।

এক বেদুঈন সাহাবী রাসূল (সঃ)-এর খেদমতে হাযীর হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে বৃক্ষটিও বেহেশতে থাকবে। নবী করীম (সঃ) বললেন, সে বৃক্ষটি কি? সে বলল, বড়ই বৃক্ষ। (যার সম্পর্কে সূরা ওয়াকিয়ায় আলোচনা বিদ্যমান।) কেননা বড়ই গাছে কাঁটা থাকে, এ কারণে সে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়, আর বড়ই পাড়তেও যখম হতে হয়। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা কি فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (কাঁটা মুক্ত বড়ই গাছ) বলেননি? অবশ্যই এ বড়ই গাছে এমন ফল হয়, যা পেকে ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তর প্রকার রংয়ের খাদ্য পাওয়া যায়। যার একটার সাথে অপটার কোন মিল নেই। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ৪র্থ খণ্ড।

আল্লামা ইবনে কাছীর সূরা রাআ'দের اُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতে সর্বদা ফলমূল এবং অন্যান্য খাদ্য ও পানীয়ের সমাহার থাকবে। তার কোন ঘাটতি হবে না এবং নিঃশেষ ও বিনষ্টও হবে না। অতঃপর তিনি তাবারানীর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন, বেহেশতীদের কেউ যখন বেহেশত থেকে কোন ফল গ্রহণ করবে, তখন আর একটি ফল এসে সে স্থান পুরণ করে ফেলবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর– ২য় খণ্ড।

বেহেশতে চাষাবাদ

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, গ্রামে বসবাসকারী এক সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে বসা ছিলেন। এ সময় তিনি এরশাদ করছিলেন যে, বেহেশতীদের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআ'লার কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেন, তুমি কি এমন অফুরন্ত নেয়ামতের মাঝে বিরাজ করছ না, যাতে তোমার যাবতীয় চাহিদাই মিটে যাচ্ছে? সে বলবে, হ্যাঁ সবই পাচ্ছি, কিন্তু তার পরও আমার মন চায় যে, আমি একটু চাষবাস করি। অনন্তর তাকে ক্ষেত-খামার করার অনুমতি দেয়া হলে সে মাটিতে বীজ ফেলবে। সাথে সাথে পলক ফেলার পূর্বেই চারা গজিয়ে তা বড় হবে, ফসল ফলে তা পেকে আপনা থেকে কাটা হয়ে যাবে। অতঃপর তা পাহাড়সম স্তুপ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে আদম সন্তান! এ নাও তোমার ফসল, তোমার লোভাতুর পেট কোন কিছুতেই ভরবে না। এ কথা শুনে গ্রাম্য সাহাবী (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! সে ব্যক্তি হয়ত কুরায়শী হবে, অথবা আনসারী। কেননা তাদেরই পেশা হচ্ছে কৃষিকাজ করা। আমরা তো কৃষিজীবি নই। সুতরাং সেখানে আমরা এমন প্রার্থনা করব না। একথা শুনে নবী করীম (সঃ) হেসে উঠলেন। —বোখারী, মেশকাত।

বেহেশতের নহর বা নদ-নদী

বেহেশতে নয়নাভিরাম নহর ও ঝরণাধারা কুলকুল রবে প্রবাহমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"মোত্তাকীদের কাছে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার প্রকৃতি এমন হবে যে, তাতে এমন সব নহর প্রবাহিত থাকবে, যার পানি কখনো পরিবর্তন হবে না। আর বহু নহর থাকবে দুধের, যার স্বাদ ও মজা কখনো সামান্য পরিমানেও পরিবর্তন হবে না। আর বহু নহর রয়েছে শরাবের; যা হবে পানকারীদের জন্য খুব স্বাদ ও তৃপ্তিদায়ক। আর বহু নহর হবে মধুর; যা হবে সম্পূর্ণ নির্মল-বিশুদ্ধ। সেখানে তাদের জন্য থাকবে সর্বপ্রকার ফলফলারি, আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের জন্য মাগফিরাত।"—সূরা মুহাম্মদ - ২য় রুকু।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একশ'টি দরজা রয়েছে। প্রত্যেক দু'দরজার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে– আকাশ ও পৃথিবরি মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। ফেরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম বেহেশত। এখান থেকে বেহেশতের চারটি নহর প্রবাহিত হবে। আর এর উপরেই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার আরশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার কাছে বেহেশতের প্রার্থনা করলে ফেরদাউসই প্রার্থনা করবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতুল ফেরদাউস হতে চারটি নহর প্রবাহিত হবে। আর সেসব নহরের প্রত্যেকটি হতে অনেক শাখা-প্রশাখাও প্রবাহিত হবে। যে বিষয়ে সূরা মুহাম্মদে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এক

হাদীসে এ চারটি নহরকে চারটি দরিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, নিঃসন্দেহে বেহেশতে পানির দরিয়া রয়েছে। মধুর, দুধের এবং শরাবের দারিয়াও বিদ্যমান। আর এসব দরিয়া হতে অনেক নহরও প্রবাহিত হবে। —তিরমিয়যী, মেশকাত।

কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বেহেশত ও বেহেশতীদের আলোচনায় تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَرُ বলা হয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বেহেশতে বহু নদী-নালা থাকবে, যা বেহেশতীদের বাগ-বাগিচা বালাখানার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের নহরসমূহ মেশক পর্বতের তলদেশ থেকে নির্গত এবং উৎসারিত। অর্থাৎ নহরের উৎসস্থল হচ্ছে মেশকের পাহাড়ের মূলদেশ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের শিষ্য সামাক (রা) বলেন, আমি মদীনায় হযরত ইবনে আব্বাসের, সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করলাম, বেহেশতের ভূমি কেমন হবে? তিনি বললেন, বেহেশতের ভূমি হবে রৌপ্যের, যা খুবই ধবধবে সাদা মনে হবে, যেন তা আয়না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার আলো কেমন হবে? তিনি বললেন, তুমি কি সূর্যোদয় অবলোকন করনি? ঠিক সূর্য উদয়কালীন আলোর মতই বেহেশতের আলো। কিন্তু সে আলোতে নেই কোন রৌদ্রতাপ, নেই কোন শীতলতা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার নহরগুলোর অবস্থা কেমন হবে? তা কি খাদ ও নালায় প্রবাহমান হবে? তিনি বললেন ঃ না, তা খাদ ও নালায় প্রবাহিত নয়, বরং সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। তা খাদ-নালা ও নিম্নভূমি ছাড়াই নিজ স্থান হতে এমনভাবে প্রবাহিত হবে যে, তা কখনো এদিক সেদিকে উছলিয়ে পড়ে না। আল্লাহ তাআ'লা এ নহরগুলোকে বলেছেন, তোমরা প্রবাহিত হও। অতঃপর তারা প্রবাহিত হয়। আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশতের কাপড়ের জোড়াগুলো কেমন হবে? তিনি বললেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে, যাতে আনারের ন্যায় ফল রয়েছে। যখন আল্লাহ তাআ'লার প্রিয় বান্দাগণ পোশাক পরিধানের ইচ্ছা করবেন, তখন সে বৃক্ষের শাখা তাদের কাছে এসে ফেটে যাবে এবং তা থেকে বিভিন্ন রংয়ের সত্তর জোড়া কাপড় বের হবে। অতঃপর সে শাখা তার পূর্ব অবস্থা এবং স্থানে ফিরে যাবে। —ইবনে আবী দুনিয়া, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হাউজে কাওছার

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মেরাজ রাতে আমি বেহেশত পরিভ্রমণ করছিলাম। এ সময় এমন একটি নহর আমার চোখে পড়ল, যার দু তীরে রয়েছে মোতির মিনার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এটা

কি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে হাউজে কাওছার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। এরপর ফেরেশতা হাউজে কাওছারের মাটিতে হাত চালিয়ে অতিশয় সুগন্ধিযুক্ত মেশক বের করে আনলেন। —বোখারী।

তিরমিযী বর্ণিত এ হাদীসে বাড়তি এ কথাগুলোও উল্লেখ রয়েছে যে, অন্তর আমার সম্মুখে সিদরাতুল মুনতাহা পেশ করা হল। আমি তার কাছে খুবই বিরাট এক নূর দেখতে পেলাম। —তিরমিযী।

হযরত আনাস (রা) থেকে এও বর্ণিত আছে যে,, নবী করীম (সঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল, কাওছার কি জিনিস? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, কাওছার হচ্ছে একটি নহর, মহান আল্লাহ পাক যা আমাকে দান করেছেন। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অতিশয় মিষ্ট। —তিরমিযী।

বেহেশতের ঝর্ণাধারা

বেহেশতের ঝর্ণার বর্ণনায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ (বেহেশতের) ছায়া ও ঝর্ণাধারায় এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ফলফলারির মধ্যে বসবাস করবে।" —সূরা মুরছিলাত– ২য় রুকু।

সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ বলেন– "সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। নিজেদের আমলের কারণে তারা উচ্চতর বেহেশতে খুব খুশী ও আনন্দময় জীবন যাপন করবে। সেখানে তারা কোন অশালীন কথা শুনবে না, আর সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা।"

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) عَيْنٌ جَارِيَةٌ (প্রবাহমান ঝর্নাধার)-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, সেখানে বহু প্রকার প্রস্রবণ প্রবাহমান থাকবে। عَيْنٌ শব্দটি যদিও একবচনে কিন্তু এর দ্বারা বহু ঝর্ণা বুঝান হয়েছে। এ শব্দটি কম-বেশী সবার প্রতিই প্রযোজ্য হয়। বেহেশতের ঝর্না, বাগান এবং পার্থিব পানীয় বস্তুর আলোচনায়ও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

সূরা গাশিয়ার আয়াতে বলা হয়েছে যে, "বেহেশতে কোন অর্থহীন কথা শোনা যাবে না। বিষয়টি অন্য আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা নাবায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا*

"সেখানে থাকবে না কোন অর্থহীন কথা, থাকবে না কোন মিথ্যা।"

সূরা ওয়াকেয়ায় বলেছেন ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيمًا*

"বেহেশতীগণ সেখানে কোন অতিরিক্ত কথা এবং বকবকানি শুনবেন না।"

মোটকথা বেহেশতীদের মন মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা এবং সমস্ত অঙ্গ

প্রতঙ্গ সব দিক দিয়েই সুস্থ থাকবে। অপছন্দনীয় কোন জিনিসই তাদের চোখে পড়বেনা এবং কানেও আসবেনা। আর সেখানে বকবক করার মতও কোন কাজ থাকবে না। লড়াই, ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা-অপবাদ ইত্যাদি কোন কর্মই সেখানে থাকবে না।

বেহেশতের পানীয় দ্রব্য

বেহেশতীদের পানীয় সামগ্রীর বর্ণনার আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নেক্‌কার লোকেরা এমন পেয়ালায় পবিত্র পানীয় পান করবে, যাতে থাকবে কর্পূরের সংমিশ্রণ। এমন ঝর্ণা হতে আল্লাহর খাস বান্দাগণ পান করবে, যে ঝর্ণাকে তারা যেকোন স্থানে প্রবাহিত করে নিতে সক্ষম হবে।" —সূরা দাহার– ১ম রুকু।

তাফসীরে দূররে মানছুরে ইবনে শাওযাব থেকে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের হাতে থাকবে সোনার ছড়ি। সে ছড়ি দ্বারা তাঁরা যেদিকে ইঙ্গিত করবে সেদিকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। —বয়ানুল কোরআন।

তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীলে يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বেহেশতীগণ নিজেদের অবস্থানস্থল ও মহল্লায় যেখানে ইচ্ছে তা নিয়ে যেতে পারবেন।

শরাবের পেয়ালায় কাফুর সংমিশ্রণ থাকবে এর মর্মার্থ হল, এর দ্বারা দুনিয়ার কর্পূর বুঝান হয়নি। বরং তা হবে এমন কর্পূর, যা দ্বারা বেহেশতীদের মন-প্রাণ খুব প্রফুল্ল ও শক্তিশালী করা এবং বিশেষ ধরনের স্বাদ আনয়নের জন্য তা সংমিশ্রণ করা হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "আর সেখানে তাদেরকে শরবতের এমন পেয়ালায় পান করান হবে, যাতে থাকবে সুঠের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ এমন ঝর্না হতে তাদেরকে পান করান হবে, যার নাম হচ্ছে সালসাবীল।"

—সূরা দাহার– রুকু ১।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতীদের পানীয়ে থাকবে সুঠের সংমিশ্রণ। কিন্তু এর দ্বারা পার্থিব সুঠ বুঝা উচিত নয়, বরং তা হবে ব্যতিক্রমধর্মী বেহেশতের সুঠ, যা পানীয়ের স্বাদকে খুব আকর্ষণীয় করে তুলবে। এ জাতীয় পানীয় পানে মনে সজীবতা ও প্রফুল্লতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

উপরোক্ত আয়াতে একটি ঝর্ণার নাম উল্লেখ করা হয়েছে "সালসাবীল"। কাতাদাহ (রা)-এর মতে এ ঝর্ণাকে সালসাবীল নামকরণের কারণ হচ্ছে– বেহেশতীগণ নিজেদের ইচ্ছেমত যেকোন স্থানে একে প্রবাহিত করে নিতে পারবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এ ঝর্ণাটি খুব দ্রুতবেগে প্রবাহিত হওয়ার কারণেই এর নাম হয়েছে সালসাবীল। যুজাজ (র)-এর মতে, এ কারণে সালসাবীল নাম করণ করা হয়েছে যে, এর পানীয় কোন বাধা বিপত্তি ছাড়া খুব সহজ ও নিরাপদে গলকরণ হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) লেখেছেন, যানযাবীল হচ্ছে বেহেশতের এমন একটি ঝর্ণা; যাকে সালসাবীল নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরা তাতফীফে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে পুণ্যবানগণ নেয়ামতরাজির মধ্যে থাকবে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করতে থাকবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মেশক দ্বারা মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে। এমন বস্তু পাওয়ার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগীতা করা প্রয়োজন। আর সে পানীয়ের মিশ্রণ হবে তাসনীমের। এটা এমন একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।" —সূরা মুতাফ্‌ফিফীন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিশুদ্ধ পানীয়ের সাথে থাকবে তাসনীমের সংমিশ্রণ। আর এটা হবে বেহেশতীদের জন্য সর্বোত্তম পানীয়। এ প্রস্রবণটি হবে প্রবাহমান। আর তা একমাত্র নৈকট্যপ্রাপ্তগণই পান করতে পারবেন। ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের পানীয়ে এ প্রস্রবণ হতে সংমিশ্রণ দেয়া হবে। —মুয়ালিমুত তানযীল।

বেহেশতের পাখ-পাখালী

বেহেশতীদের খাবার হিসেবে পাখীর গোশতও দেয়া হবে। যেমন সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ *

"তাদের বাসনা অনুযায়ী পাখীর গোশতও থাকবে।"

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে উটের ন্যায় বিরাট বিরাট লম্বা গর্দান বিশিষ্ট পাখী থাকবে, যারা বেহেশতের বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিচরণ করবে। হযরত আবু বকর (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পাখীগুলো তো খুব আনন্দঘন জীবন যাপন করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাদের তুলনায় যারা তাদের গোশত আহার করবে, তারা থাকবে অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে। নবী করীম (সঃ) একথা তিনবার বললেন। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে এ মর্মে সুসংবাদ দেয়া হল যে, আমি আশা করি, তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে, যারা এ পাখীগুলো আহার করবে।

—আহমদ, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, বেহেশতীদের কারো পাখীর গোশ্ত আহার করার বাসনা জাগলে, পাখীরা নিজে নিজেই তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। —আবি দুনিয়া, আত্তারগী অত্তারহীব।

আর এক হাদীসে আছে, পাখীগুলো নিজে নিজে বিনা আগুনে ভুনা হয়ে বেহেশতীদের দস্তরখানায় এসে উপস্থিত হবে। বেহেশতী ব্যক্তি তা থেকে পেট ভরে খাওয়ার পর পাখীগুলো উড়ে যাবে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

বেহেশতীগণ খুব সম্মানের সাথে পানাহার করবে এবং তাদের আহার্যদ্রব্য পায়খানা-প্রশ্রাবে পরিণত হবেনা

এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের সূরা সফ্‌ফাতে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন— "তাদের জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবিকা, ও ফলফলারি। তারা খুব সম্মানের সাথে নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে পরস্পর মুখোমুখী আসনে বসবে।" —সূরা সাফ্‌ফাত।

সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- "নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ বেহেশতের বাগ-বাগিচা ও অফুরন্ত নেয়ামতের পরিবেশে বসবাস করবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা কিছু দান করবেন, তাতে তারা খুশি হবে। আর তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। তাদেরকে বলা হবে, পার্থিব জীবনে তোমরা যে নেক আমল করতে, তার প্রতিদান স্বরূপ পরিতৃপ্তি সহকারে পানাহার কর। —সূরা তুর।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ অবশ্যই বেহেশতে পানাহার করবে। কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না এবং পেশাব পায়খানা করবে না। আর নাসিকা পরিষ্কার করারও প্রয়োজন হবে না। হযরতগণ জিজ্ঞেস করলেন, পানাহার করলে যদি পায়খানা পেশাব না হয় তবে বর্জ্য কিভাবে নির্গত হবে। নবী করীম (সঃ) বললেন, বেহেশতীদের ঢেকুর আসবে এবং মেশকের সুগন্ধের ন্যায় ঘাম হবে, ফলে পেট খালি হয়ে যাবে। (পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন হবে না।) তাদের মুখে সর্বদা আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ-তাহ্‌লীল এমনভাবে জারি থাকবে, যেমন তোমাদের বিনা ইচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে। —মুসলিম, মেশকাত।

কোন কোন হাদীসে তাসবীর সাথে তাকবীরের কথাও উল্লেখ রয়েছে। —জামউল ফাওয়ায়েদ।

অর্থাৎ দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে যেমন কোন কষ্ট করতে হয় না, শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা করতে হয় না এবং অন্য কাজে নিমগ্ন থাকার কারণে শ্বাস গ্রহণে বাধারও সৃষ্টি হয় না, তেমনিভাবে বেহেশতীগণ সর্বদা তাসবীহ তাহ্‌লীলের মধ্যে নিমগ্ন থাকবেন। নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমগ্নতায় তারা আল্লাহর গুনগান থেকে গাফেল হবেন না। বিনা ইচ্ছায় তাদের মুখে আল্লাহর গুণগান জারি থাকবে। আল্লাহর গুণগান ও তাসবীহ তাহ্‌লীল পাঠে তারা অবসাদ এবং কষ্টবোধও করবে না।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার লিখেছেন, বেহেশতীদের জীবন ধারণের জন্য আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ তাহ্‌লীলকে একটি মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে। দুনিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা মানুষ যেমন জীবিত থাকে, অনুরূপ বেহেশতীগণও সেখানে তাসবীহ তাহ্‌লীল পাঠেই জীবিত থাকবেন। তাসবীহ-তাহ্‌লীলের আরও কারণ হল, বেহেশতীদের অন্তকরণ আল্লাহর মারেফতের নূরে আলোকিত হবে এবং তাঁর মহব্বতে পরিপূর্ণ থাকবে। এ মহব্বত মাহবুবের স্মরণে এমন নেশায় পরিণত হবে যে, বিনা ইচ্ছাতেই তারা আল্লাহর গুণগানে মশগুল থাকবেন। যে

যা বেশী ভালবাসে, সে তাই বেশি বেশি স্মরণ করে। সহীহ বোখারীর এক হাদীসে আছে, বেহেশতীগণ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআ'লার তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকবেন। আর এখানে বলা হয়েছে যে, শ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় তাদের মুখে সর্বদা তাসবীহ জারি থাকবে। এ উভয় কথার মধ্যে বৈপরিত্য পরিদৃষ্ট হয়।

এ প্রসঙ্গে কোন কোন হাদীসবিশারদ উল্লেখ করেছেন যে, সকাল সন্ধ্যায় যিকির দ্বারা সারাক্ষণ যিকিরের কথা বুঝান হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মর্মার্থ একই। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতীগণ নিজেদের ইচ্ছাতেই সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে মশগুল হবেন। আর বিনা ইচ্ছায় মশগুল থাকবে সারাক্ষণ। এ ব্যাখ্যার সত্যায়নে বলা যায় যে, যেখানে সকাল সন্ধ্যা তাসবীতে মাশগুল থাকার কথা বলা হয়েছে, সেখানে يُسَبِّحُوْنَ ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। আর সে ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে বেহেশতীগণ। আর যেখানে বিনা ইচ্ছায় শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাসবীহ পাঠের কথা বলা হয়েছে সেখানে يلهمون ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

মনে করুন, বিনা ইচ্ছাতেই সারাক্ষণ তাসবীহ পাঠ হতে থাকবে। কিন্তু নিজেদের ইচ্ছায় তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে মশগুল হবেন, যাতে তারা ইচ্ছাপূর্বক তাসবীহ পাঠের স্বাদ হতে বঞ্চিত না হন। যদিও বেহেশতীগণ ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য দায়িত্বশীল নয়, তবুও তাদের স্বভাবগত মর্যাদা এবং চির সৌভাগ্য এটা কোনক্রমেই পছন্দ করতে পারে না যে, নিজেদের আসল মাহবুবের স্মরণের জন্য নিয়মিতভাবে স্বইচ্ছায় সময় নির্ধারণ করে নেবেন না।

বেহেশতীদের আহার্য পাত্র ঃ

এ প্রসঙ্গে সূরা যুখরফে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তাদের সমক্ষে স্বর্ণের পেয়ালা ও গ্লাস নিয়ে যাওয়া হবে। যার মধ্যে পানাহারের দ্রব্য থাকবে। সেখানে তারা সেসব বস্তু লাভ করবে, যা তাদের মনে চায় এবং যা দ্বারা তাদের নয়ন জুড়িয়ে যায়। আর তাঁদের বলা হবে– তোমরা এখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। —সূরা যুখরাফ– ৭ম রুকু।

সূরা দাহরে আল্লাহ বলেন– "তাদের কাছে (পানাহারের বস্তু পৌঁছাবার জন্য) রৌপ্যের বরতন নিয়ে যাওয়া হবে। আর সিসার অনেক গ্লাসও নেয়া হবে। সে সিসা হবে রৌপ্যের। পরিপূর্ণকারীগণ সেগুলো যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করবে।

—সূরা দাহার– ১ম রুকু।

অর্থাৎ ঐ সব গ্লাসে এ পরিমাণে পানীয় ভরে তাদের কাছে পেশ করা হবে, যা হবে সে সময়কার তাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী। তার চেয়ে কিছু কম বেশি হবে না। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতীদের আহার্য পাত্র হবে সোনা ও রূপার।

সূরা যুখরাফের আয়াত থেকে জানা যায় যে, বেহেশতে যা কিছু থাকবে, তা হবে, ভেতর-বাইরে সমান পরিষ্কার ও সুন্দর। যা হবে মনমুগ্ধকর ও নয়ন জুড়ানো। এমন কোন রূপাকৃতি সেখানে থাকবে না, যা দেখতে ভাল লাগবে না।

বেহেশতী পানীয়ে নেশা এবং মাথা ব্যথ্যা হবে না ঃ

বেহেশতীগণ পিপাসা নিবারণ ও স্বাদ উপভোগের জন্য শরাব পান করবেন, কিন্তু সে শরাব হবে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। তা পান করায় জ্ঞান-বুদ্ধির বিলোপ ঘটবে না এবং মাদকতাও আসবেনা। আর তাতে পেটে কোন ব্যাথ্যা বেদনাও সৃষ্টি হবে না। তা পানে তারা অসংলগ্ন কোন কথাও বলবেন না।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "তাদের কাছে পেয়ালাপূর্ণ শরাব নিয়ে (বালকেরা) ঘোরাফেরা করবে। তা হবে সাদা এবং পানকারীদের জন্য মজাদার। তা পানে মাথা ধরবেনা এবং জ্ঞান-বুদ্ধিও হ্রাস পাবেনা। —সূরা সাফ্‌ফাত– ২য় রুকু।

সূরা তুরে বলেন, لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ "এ শরাব পান করার কারণে তারা অশংলগ্ন কোন প্রলাপ বকবে না এবং কোন গুনাহের কাজেও লিপ্ত হবে না।

সূরা দাহারে বলেন– وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا "তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পূতঃপবিত্র শরাব পান করাবেন।"

তাফসীরে মুয়ালামুত তানযীলের লেখক طَهُوْرًا 'তাহুরানা' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উক্ত শরাব হবে সব ধরণের অপবিত্রতা মুক্ত। দুনিয়ার পানীয়ে হাত লাগলেই যেমন তা ময়লা হয়ে যায়, বেহেশতের শরাব হবে তেমন ময়লা হতে সূরক্ষিত।

অতঃপর তিনি আবু কেলাবা ও ইবরাহীমের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন যে, বেহেশতের শরাবকে "তাহুরা" এজন্য বলা হয়েছে যে, তা পানে পেশাব হবে না। বরং তা মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘামে পরিণত হবে। আর তা এভাবে হবে যে, বেহেশতীগণ আহার করার পর তাদের কাছে শরাবান তাহুরা উপস্থিত করা হবে। এ শরবত পানে তাদের পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন তাদের খাদ্যের বর্জ্য ঘাম হয়ে দেহের চামড়ার মাধ্যমে বেরিয়ে যাবে। যা হবে মেশকের চেয়েও বেশি সুঘ্রাণ যুক্ত। এতে তাদের পেট খালি হয়ে যাবে এবং পুনরায় তাদের খাবার স্পৃহা জাগবে।

মাকাতিল (রা) বলেন, শরাবান তাহুরা হচ্ছে বেহেশতের দরজার বাইরের একটি পানির প্রস্রবণ। এ প্রস্রবণ থেকে যে ব্যক্তি পান করবে, আল্লাহ্ তাআ'লা তার অন্তকরণকে ঘৃণা-বিদ্বেষ, হিংসা ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে দেবেন।

বেহেশতীদের যানবাহন

হযরত বুরায়দাহ (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে কি ঘোড়া থাকবে? প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাআ'লা যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান এবং তুমি যদি কালো ইয়াকুত রংয়ের ঘোড়ায় চড়তে চাও, তাহলে তোমাকে তাও দান করা হবে। আর সে ঘোড়া তোমাকে নিয়ে বেহেশতে উড়ে বেড়াবে। তুমি যেখানেই যেতে চাইবে, সেখানেই নিয়ে যাবে।

অতঃপর আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বেহেশতে কি উট থাকবে? নবী করীম (সঃ) তাকেও অনুরূপ জওয়াবই দিলেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে আরও বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করালে তোমার মনে যা চাইবে তাই তোমাকে দান করা হবে। যা দেখে তোমার নয়ন জুড়িয়ে যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এক বেদুঈন সাহাবী এসে নবী করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ঘোড়া আমার খুব পছন্দনীয় প্রাণী। বেহেশতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করান হয়, তাহলে তোমাকে ইয়াকুত রংয়ের ঘোড়া দেয়া হবে। সে ঘোড়ার দু'খানা ডানা থাকবে। অতঃপর তোমাকে তাতে চড়ান হবে এবং তুমি যেখানে যেতে চাইবে, তোমাকে নিয়ে তা সেখানে উড়ে যাবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতীদের পারস্পরিক ভালবাসা

কোরআন মজীদের সূরা হুজরাতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি বেহেশতীদের অন্তর হতে (পার্থিব জীবনের) হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবে। তখন তারা ভাই ভাই হয়ে থাকবে এবং সুসজ্জিত আসনে সামনা-সামনি আসন গ্রহণ করবে। —সূরা হিজর- ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ দুনিয়ার জীবনে যদি কারো প্রতি কারোর ঘৃণা বিদ্বেষ থেকে থাকে, তাহলে বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই আমি তা তাঁর অন্তর থেকে পৃথক করে ফেলব। ফলে সমস্ত বেহেশতীরা সেখানে পরস্পর ভাই ভাইয়ের মত বসবাস করবে। কারো মনে তখন আর কোন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও দোষ থাকবে না।

সহীহ বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে,

قُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اِخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ *

বেহেশতীদের অন্তরসমূহ একই ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় রূপ পরিগ্রহণ করবে। তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকবে না এবং থাকবে না কোন ঘৃণা বিদ্বেষ।" ক্বলব বিভিন্ন থাকলেও মন মানসিকতা হবে অভিন্ন। সবাই পারস্পরিক ভালবাসা ও মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন।

হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আল্লাহ তাআ'লা অন্তরে ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর না করা পর্যন্ত কোন মুমিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আক্রমণকারী জন্তু-জানোয়ারকে যেভাবে প্রতিহত করে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদের অন্তর হতে ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন।

—তাফসীরে ইবনে কাছীর- ২য় খণ্ড।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন বান্দারা যখন পুলসেরাত পার হয়ে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন, তখন

বেহেশত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। আর পার্থিব জীবনে একে অপরের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করেছিল, তার বিচার করে মজলুমের হক প্রদান করা হবে। তাঁরা যখন জুলুম-অত্যাচার হতে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে, তখনই তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। অতএব যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তার শপথ! তাদের প্রত্যেকেই তখন বেহেশতের আপন আপন স্থানের প্রতি এমন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে থাকবে, যেমন পার্থিব রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে তারা পরিজ্ঞাত ছিল। —বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বেই যখন পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের ফয়সালা হয়ে যাবে এবং মনের ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করা হবে, তখন আর ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণের কোন কারণ থাকবে না। আর একজন ক্ষুদ্র ও সাধারণ বেহেশতীও যখন মনে করবে যে, আমি যা লাভ করেছি, তা আর কেউ লাভ করেনি। তখন বিনা কারণে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হওয়ার কোন কারণই থাকবে না। —মুসলিম।

বেহেশতীদের আমোদ-প্রমোদ

বেহেশতীগণ পরস্পর পানীয় ছিটিয়ে আমোদ ফুর্তি করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "সেখানে তারা শরাবের পেয়ালা নিয়ে পরস্পরে টানাটানি ও ছিটাছিটি করবে। আর সে শরাব পানে তাদের কোন নেশা হবে না। তাই তারা প্রলাপও বকবে না। আর নির্বোধের ন্যায় কোন অসংলগণ কথাও বলবেনা।

—সূরা তুর- ১ রুকু।

তাদের এ টানা-টানি হবে আন্দ ও ফুর্তির বহিঃপ্রকাশ। কারণ সেখানে কোন কিছুরই কমতি থাকবেনা, যার দরুন তা লাভ করার জন্য কাড়া-কাড়ি করতে হবে। বরং বন্ধু বান্ধবদের পরস্পরের কাড়া-কাড়ি করে খাওয়ার স্বাদ ও সৌন্দর্য্যই আলাদা।

বেহেশতীদের পোশাক ও অলংকার

বেহেশতীদের পোশাক হবে সবুজ রংয়ের রেশমের এবং তাদের অলংকার হবে স্বর্ণ ও মনিমুক্তা দ্বারা তৈরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করে, আমি তাদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করব না। যারা উত্তম পথে চলে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী বেহেশত। যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন পরিধান করান হবে। তারা সবুজ রংয়ের পোশাক পরিধান করবে, যা হবে শুকনো ও পুরু রেশম দ্বারা তৈরি। আর সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। কত সুন্দর প্রতিদান এবং কত সুন্দর আরামের স্থান বেহেশত।"

—সূরা কাহাফ- ৪র্থ রুকু।

উপরোক্ত আয়াতে প্রথমতঃ বেহেশতীদের স্বর্ণের কাঁকন (অলংকারের) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা দাহারে বলা হয়েছে وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ "আর তাদেরকে রূপার কাকন পড়ান হবে।" উভয় আয়াত একত্র করলে এ অর্থই দাড়ায় যে, বেহেশতীদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় প্রকার ধাতুর অলংকার পরিধান করান হবে। অতঃপর বেহেশতীদের পোশাকের কথা বলা হয়েছে যে, তারা মিহিন ও পুরু রেশমের তৈরি সবুজ রংয়ের পোশাক পরিধান করবে। অর্থাৎ উভয় কাপড়ই হবে রেশম বস্ত্র। যার ইচ্ছে হয় সে পাতলা কাপড় পরিধান করবে, আর যার ইচ্ছে হয় সে পুরু কাপড় পরিধান করবে।

তাফসীরে বায়যাবীর লেখক লিখেছেন– দু'প্রকার কাপড়ের কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, সেখানে মনের চাহিদা এবং দৃষ্টি নন্দন সবকিছুই পাওয়া যাবে।

বেহেশতীদের জন্য সবুজ রং এজন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, সমস্ত রংয়ের মধ্যে এ রংটিই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর অন্যান্য রংয়ের তুলনায় এটি সর্বাপেক্ষা সজীবতার ধারক ও বাহক।

এখানে লক্ষণীয় যে, একটি রংয়ের কথা উল্লেখ করে অন্যান্য রং সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রংয়ের পোশাক দেয়া হবে না, এমন কথা বলা হয়নি। বেহেশতীদের মনে চাইলে আল্লাহ পাক অন্যান্য রংয়ের কাপড়ও তাদেরকে দান করবেন। আল্লাহ তাআ'লা সূরা হজ্বে ঘোষণা করেন ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা সেসব লোকদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে। সে বেহেশতের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাদেরকে সেথায় স্বর্ণের কাংকন ও মোতি পরিধান করান হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী পোশাক।" —সূরা হজ্ব- ৩য় রুকু।

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতীগণ সোনার কাংকনসহ মোতির অলংকারও পরিধান করবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ওযুর পানি যেসব স্থানে ব্যবহার হয়, বেহেশতে মুমিনগণ সেসব স্থানে অলংকার ব্যবহার করবে।" —মুসলিম।

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে যদি এতটুকু পরিমাণ জিনিসও এ জগতে প্রকাশ পেয়ে যায়, যা একটি নখ দ্বারা উঠান সম্ভব– তাঁহলে আসমান ও জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আলোকিত হয়ে উঠবে। বেহেশতীদের মধ্যে থেকে একজন পুরুষও যদি দুনিয়ায় উঁকি মারে, যার ফলে তার হাতের কংকন প্রকাশ পায়, তাহলে তা সূর্যের কিরণকে এমনভাবে আলোহীন করে ফেলবে, যেমন সূর্য তারকারাজির আলোকে ম্লান করে দেয়। —তিরমিযী, মেশকাত।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কাকন তো মহিলাদের হাতে শোভা পায়, পুরুষগণ তা পরিধান করলে কেমন লাগবে?

এর উত্তর হচ্ছে, কোন পোশাক বা অলংকারাদি শোভাময় রুচিশীল হওয়াটা প্রত্যেক দেশ ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চাহিদা ও প্রথার উপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় যদিও পুরুষগণ কংকন পরিধান করে না, কিন্তু বেহেশতে তারা আগ্রহ সহকারে তা পরিধান করবে। আর সকলের কাছে দেখতে তা ভাল লাগবে। মনে করুন ঘড়ির চেইন। এটা নানা প্রকারে হয় এবং সবাই নিজ নিজ রুচি মাফিক তা ব্যবহার করে। মানুষ বিভিন্ন প্রকার অলংকার পরিধান করে। আর সে অলংকার পুরুষের হাতে ভালই মানায়। কোন কোন সম্প্দ্রায় বিবাহ অনুষ্ঠানে দুলাকে কংকন পরিধান করায় এবং সমবয়সী সকল লোকে তা অবলোকন করে খুশী হয়। যেহেতু সেখানকার প্রথা হচ্ছে এই, তাই সকলের দৃষ্টিতেই তা হবে দৃষ্টি নন্দন। তারা এ প্রথা পালনে এতটা দৃঢ় হয় যে, শরীয়তের বাধা নিষেধও তারা মানে না।

আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হাতের পাঞ্জা হতে কনুই পর্যন্ত অলংকার আচ্ছাদিত হওয়া তো ভাল মানায় না এবং দেখতেও দৃষ্টিকটু মনে হয়। তবে তা কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, এটাও দুনিয়ার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খারাপ মনে হয়, কিন্তু বেহেশতে সকলের কাছেই তা পছন্দনীয় মনে হবে এবং আগ্রহ সহকারে পরিধান করবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রচলনও আছে যে, তাদের মহিলারা কনুই পর্যন্ত অলংকার পরিধান করে। আর সেটা সকলের কাছেই পছন্দনীয় ও শোভাময় মনে হয়।

ফায়দা ঃ কোরআন মজীদে নেককারদের অলংকারের আলোচনায় বলা হয়েছে, তাদেরকে অলংকার পরিধান করান হবে। আর পোশাক সম্পর্কে বর্তমানকালের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পোশাক তারা নিজেরাই পরিধান করবে। এটা একথা বুঝাবার জন্য বলা হয়েছে যে, অলংকার তো বেহেশতের সেবক-সেবিকাগণ তাদেরকে পরিধান করাবে। যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাদেরকে তাদের সেবকগণ মুকুট পরিধান করিয়ে থাকে। কিন্তু পোশক বেহেশতীগণ নিজেরাই পরিধান করবে। কেননা নিজ হাতে পোশাক পরিধান করাই হচ্ছে যথার্থ। বিশেষ করে যে পোশাক লজ্জা নিবারণের জন্য পরা হয়, তা নিজ হাতে পরাই উত্তম। —তাফসীরে রুহুল মায়ানী।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে যারাই প্রবেশ করবে, তারা সর্বদা আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে। কখনো পরমুখাপেক্ষী হবে না, কোন কিছুর অভাব থাকবে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ কখনো পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও লোপ পাবে না। —মুসলিম, মেশকাত।

বেহেশতীদের পোশাক কখনো ময়লা এবং পুরানা হবে না। হ্যাঁ তারাপোশাক পরিবর্তন করতে চাইলে পরিবর্তন করে নেবে। কিন্তু পোশাক ময়লা কিংবা ছিঁড়াফাটা হওয়ার কারণে তারা তা পরিবর্তন করবে না।

বেহেশতীদের মাথার তাজ ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীদের মাথায় তাজ পরান হবে। সে তাজের ক্ষুদ্রতম মোতিটির উজ্জ্বলতা এত হবে যে, তার উজ্জ্বলতায় পূর্ব পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান আলোকিত করে ফেলবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

অর্থাৎ সে তাজের ক্ষুদ্রতম মোতিটিও যদি দুনিয়ায় এসে পরে, তা হলে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত এর মধ্যেবর্তী সমস্ত স্থানকে আলোকিত করে তুলবে।

বেহেশতীদের বিছানা ঃ

সূরা আররহমানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা এমন শয্যায় হেলান দিয়ে বসবে, যার খোল বা আস্তর পুরু রেশম দ্বারা তৈরি। আর উভয় বেহেশতের ফলফলারি তাদের নিকটবর্তী হবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে।" —সূরা আর-রাহমান– ৩য় রুকু।

আরবী ভাষায় মোটা রেশমকে ইস্তেবরাক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুললাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এখানে তো তোমাদেরকে শয্যার নীচের কাপড় সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর সেটা হবে ইস্তেবরাক বা মোটা রেশম দ্বারা তৈরি। সুতরাং এর দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, গায় দেয়ার বা উপরের কাপড়টি কত সুন্দর ও উন্নতমানের হবে।

এ সূরারই শেষ দিকে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "তারা সবুজ রংয়ের চাদরের উপর উপবিষ্ট থাকবে। আর আশ্চর্য রকমের সুন্দর বিছানায় হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? তোমার প্রতিপালকের নাম তো বরকতময়, যিনি প্রতিপত্তি ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী।" —সূরা আর-রাহমান– শেষ রুকু।

প্রথম আয়াতে উচু শ্রেণীর বেহেশতীদের বিছানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে যে, শয্যার আস্তরণ অর্থাৎ নীচের কাপড়টি হবে পুরু রেশমের। কিন্তু শয্যার উপরের আবরণ বা গারচাদরের কথা আলোচনা করা হয়নি। কারণ, আস্তরের উপর কিয়াস করেই উপরের চাদরের কথা বুঝা যাবে। কিন্তু এ আয়াতে তুলনামূক নিম্ন স্তরের বেহেশতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাতে শয্যার আস্তরের কথা উল্লেখ নেই। শুধু উপরের চাঁদরের কথা বলা হয়েছে। —ইবনে কাছীর।

সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "সেখানে রয়েছে উন্নততর শয্যা। আর প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, সারি সারি বালিশ এবং বিছানা ও গালিচা।" —সূরা গাশিয়াহ

সূরা ওয়াকিয়ায় ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তদের নেয়ামতের আলোচনায় বলা হয়েছে, وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ "বেহেশতে তারা উঁচু উঁচু বিছানায় অবস্থান করবে।"

এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এ বিছানাগুলো এতটা পুরু হবে, যেমন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানের দূরত্ব। যার ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতীদের আসন ঃ

বেহেশতীদের আসনের আলোচনায় সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী হবে। তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত, নেয়ামতপূর্ণ বাগ-বাগিচায় তাদের বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে। আর অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য। তারা স্বর্ণ খচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে বসবে।" —সূরা ওয়াকিয়া –আয়াত ১০-১৬।

সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ مُتَّكِـئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْـفُوْفَـةٍ অর্থাৎ তারা পাশাপাশি সাজানো আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আর সে আসনগুলো মুখোমুখি করে সাজান থাকবে। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় সুরুরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসন। আর মাউদুনাতুন শব্দের অর্থ হচ্ছে তৈরি আসন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আসনগুলো সোনার তার দ্বারা সুসজ্জিত করে নির্মাণ করা হবে। (দুনিয়ায় যেমন বাশ ও বেত দ্বারা চেয়ার ও বিভিন্ন আসন সুক্ষ্মভাবে বুনানো হয়ে থাকে।) মোফাসসীর আল্লামা সুদ্দি (র) বলেন, সে আসনগুলো হবে স্বর্ণ ও মোতি খঁচিত। —ইবনে কাছীর।

সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "নিশ্চয় বেহেশতীগণ সেদিন নিজেদের (নেয়ামতে) নিমগ্নতায় সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁরা এবং তাদের স্ত্রীগণ পর্দা বিছানো সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।" —সূরা ইয়াসীন– ৪র্থ রুকু।

তাফসীরে মাযহারীর লেখক اَرَائِكُ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, নব দুলাকে বসাবার জন্য যে, পর্দা ঝুলিয়ে বিশেষ কামরা সুসজ্জিত করা হয় এবং সেখানে যে সুসজ্জিত আসন পাতা হয়, তাকেই اَرِيْكَه বলা হয়। উপরোল্লেখিত উভয় আয়াতের সারাংশ থেকে জানা যায় যে, বেহেশতীদের বসার জন্য সাধারণ আসন এবং বিশেষ আসনও থাকবে।

এখানে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদের সূরা আ'রাফ ও সাফ্ফাতে سُرُرٌ مُّتَقَابِلِيْنَ (মুখোমুখী আসনও) বলা হয়েছে। যাতে আরো বলা হয়েছে عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَه। সাধারণ আসনের কথা। এখানে سُرُرٌ এর বিশেষণ বা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে مَوْضُوْنَه দ্বারা। হতে পারে سُرُرٌ مَّوْضُوْنَةٌ হচ্ছে, খাছ খাছ ও বিশিষ্ট লোকদের আসন। এ ছাড়া অন্যান্য আসন হবে সাধারণ বেহেশতীদের জন্য। আর সকলের জন্যই سُرُر مَوْضُوْنَه হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান।

মোটকথা, বেহেশতে যেসব আসন থাকবে, তা হবে অদ্ভুত বিস্ময়কর শোভাময় ও পছন্দনীয় আসন। তার রূপমাধুরী সৌন্দর্য ও মনোরম অবস্থা এ দুনিয়ায় বসে অনুমান করা সম্ভব নয়। عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ (মুখোমুখী আসনে বসবে) প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, মুজাহিদ (র) বলেন, বেহেশতীগণ একেঅপরকে পিছনের দিক দিয়ে দেখবে না। অর্থাৎ উঠা-বসা ও বৈঠকে কেউ কারো পিছনে বসার সুযোগ নেই। সেখানকার অবস্থা এমন হবে যে, কারো পৃষ্ঠদেশ দেখা যাবে না। তাদের পরস্পরের মাঝে যখন দেখা সাক্ষাত হবে, তখন পরস্পরের মুখমণ্ডলেই দৃষ্টি পড়বে। মজলিসে বসলে দুনিয়ার মানুষের ন্যায় আগে পিছনে বসবে না। দুনিয়ায় স্থানের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু সেখানে স্থানের কোন ঘাটতি বা কমতি নেই। আর দূরে ও কাছে এ কথা সেখানকার জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেকেই যে কোন স্থান থেকে অপরের বক্তব্য শুনতে পাবে।

তাফসীরে মাজহারীর লেখক مُتَقٰبِلِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের সুন্দরতম জীবন, আন্তরিকতা-মহব্বত, শিষ্টাচারিতা এবং উন্নত চরিত্রের আলোচনায় বলেছেন যে, তাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও মেলামেশার আন্তরিকতার দরুন একজন অপরজনের পিছনে বসাকে গ্রহণ করবে না।

বেহেশতের গিলমান বা কিশোর বালক

বেহেশতীগণের সেবার জন্য আল্লাহ তাআ'লা চিরকিশোর বালক সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা সর্বদা বেহেশতীগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের সূরা তূরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ *

"তাদের সেবার জন্য এমন সব চিরকিশোর বালক তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে, যাদেরকে মনে হবে যেন সুরক্ষিত মোতি বিশেষ। —সূরা তুর- ১ম রুকু।

সূরা দাহারে আল্লাহ তাআ'লা বলেন- " তাদের সেবার জন্য তাদের কাছে এমন সব বালক ঘোরাফেরা করবে, যারা হবে চির কিশোর। যখন আপনি তাদেরকে দেখবেন, তখন আপনার মনে হবে যেন তারা বিচ্ছুরিত মোতি।"

—সূরা দাহার- ১ম রুকু।

আরবী ভাষায় وِلْدَانٌ হচ্ছে, وَلَدٌ -এর বহুবচন। আর غِلْمَانٌ হচ্ছে, غُلَامٌ-এর বহুবচন। উভয়ের অর্থই প্রায় এক। অর্থাৎ, বেহেশতীদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা স্ত্রীরূপে বহু হুর সৃষ্টি করে রেখেছেন। তারা মহিলা হলেও মানুষের ন্যায় তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে নিজ কুদরতে সৃষ্টি

করেছেন। এমনিভাবে বেহেশতীদের সেবার জন্য আল্লাহ্ গিলমান ও বিলদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, যারা সর্বদাই চির কিশোর থাকবে। এরাও সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, যাদের জন্ম মানুষের সৃষ্টির ন্যায় হয়নি বরং তাদেরকেও আল্লাহ্ তাআ'লা নিজ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। কোরআন মজীদে مُخَلَّدُونَ বা চির কিশোর বলে এসব বালকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীর লেখক এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন, এসব বালকের কখনো মৃত্যু হবে না এবং বয়বৃদ্ধও হবে না। তাদের কৈশোরেও ঘটবে না কোন পরিবর্তন, তারা সর্বদা বালক রূপেই থাকবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লেখেছেন, তাদের বয়স কখনো বাল্যকালের বয়স হতে বর্ধিত হবে না।

সূরা দাহারের ব্যাখ্যায় وِلْدَانٌ শব্দের আলোচনায় তাফসীরে মাযহারীর লেখক লিখেছেন, এসব বালককে আল্লাহ্ তাআ'লা মুমিনদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। অথবা এরা হচ্ছে কাফেরদের নাবালক সন্তান, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআ'লা বেহেশতীদের সেবায় নিযুক্ত করবেন।

এর দ্বারা জানা যায় যে, বিলদান প্রসঙ্গে দু'টি ব্যাখ্যা বিদ্যমান। একটি হচ্ছে এরা আল্লাহ্ তাআ'লার নতুন সৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কাফেরদের সেসব নাবালক সন্তান, যাদেরকে বেহেশতীদের সেবায় নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণ করেননি। বয়ানুল কুরআনের গ্রন্থকার লিখেছেন, বিলদান সম্পর্কে সেটাই গ্রহণযোগ্য মত যা তাফসীরে খাযেনের লেখক উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, বিলদান হচ্ছে হুরের অনুরূপ আল্লাহ্ তাআ'লার স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এদেরকে সেবক বানাবার মূলে রয়েছে তাদের দ্বারা বেহেশতীদের যৌনস্পৃহা ছাড়া অন্যান আনন্দ দান করা।

সূরা তূরে গিলমানদের সুরক্ষিত মোতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সব বালক সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতায়, রূপে, রংয়ে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় এমন মোতির ন্যায় হবে যা ঝিনুকের মাঝে সুরক্ষিত থাকে, ধুলো ময়লা তাকে স্পর্শ করো না।

আর এসব বালককে সূরা দাহারে বিচ্ছুরিত মোতির সাথে সাদৃশ্যতা দেখান হয়েছে। অর্থাৎ এরা হবে ছড়ান-ছিটান মোতির ন্যায়। কেননা তারা সেবার এ কাজে সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে থাকবে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র) থেকে বর্ণিত, কোন এক সাহাবী (রা) হযরত নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আরয করলেন, সেবকগণের রূপ-সৌন্দর্য যখন এত, তখন মাখদুম বা যাদের সেবা করা হবে, তাদের অবস্থা কেমন হবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, যাদের সেবা করা হবে, তারা সেবকদের তুলনায় এতটা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে যেমন তারকামণ্ডলীর উপর চতুর্দশীর (পূর্ণিমার) চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। —তাফসীর মাযহারী।

বেহেশতের পবিত্র স্ত্রীগণ

কোরআন মজীদের সূরা আল এমরানে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ "যারা আল্লাহ তাআ'লাকে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে এমন বেহেশত, যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্রতম স্ত্রীগণ, ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআ'লা আপন বান্দাগণকে দেখছেন।"—সূরা আলে ইমরান- ২য় রুকু।

"পবিত্র স্ত্রী" তারা হবে বাহ্যিক ময়লা-নোংরা হতে মুক্ত। অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও তারা চরিত্রহীনা, যৌন কেলেংকারী এবং দুঃখ-কষ্টদায়ক আচরণ ও কথা মুক্ত। আর প্রকৃতিগতভাবে মহিলাদের যে হায়েজ-নেফাস হয়, তা হতেও তারা থাকবে পবিত্র। অর্থাৎ তাদের হায়েজ-নেফাস হবে না।—তাফসীরে ইবনে কাছীর।

বিশিষ্ট তাবেঈ মুজাহিদ (র) "পবিত্রতম স্ত্রীর" ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তারা হায়েজ-নেফাস, পায়খানা-পেশাব, সর্দি-কাশি, থুথু ও মনি নির্গত হওয়া এবং সন্তান জন্ম দেয়া হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। কাতাদাহ (র) বলেন, বেহেশতের পবিত্রতম স্ত্রীগণ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বিষয় এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়া হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। —তাফসীরে ইবনে কাছীর- ১ম খণ্ড।

সারকথা হচ্ছে বেহেশতের স্ত্রীগণ জাহেরী ও বাতেনী সর্বপ্রকার দোষ হতে মুক্ত ও পবিত্র থাকবে। তাদের থুথু আসবে না। তাদের পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন দেখা দেবে না। তাদের মনি, হায়েজ, ও নেফাছও নির্গত হবে না। তাদের দেহ ও কাপড় কখনো ময়লা হবে না। বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি তাদের অভ্যাস, চরিত্র ও আচার-আচরণও হবে অত্যন্ত শালীন-মার্যিত। তারা মনে-প্রাণে স্বামীদের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে। তাদের মধ্যে লেশমাত্র অবাধ্যতাও থাকবে না। তাদের মধ্যে কটুবাক্য নিক্ষেপ, ধোঁকা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতার লেশমাত্র থাকবে না। দুনিয়ার যেসব মহিলা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে, তারা হবে বেহেশতের মুমিন পুরুষদের স্ত্রী। তাদের ছাড়াও পুরুষগণকে পরমা সুন্দরী হুরগণকে দেয়া হবে। উভয় শ্রেণীর স্ত্রীগণই সৌন্দর্য, রূপমাধুরী, মনভুলানো ও জাহিরী-বাতেনী সর্বপ্রকার গুণে হবে গুণান্বিত। প্রেম-ভালবাসার তরঙ্গমালা থাকবে তাদের মধ্যে উত্থিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় এবং পুরুষের মন ভুলাতে তারা হবে অদ্বিতীয়।

বেহেশতী স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী ঃ

কোরআন মজীদের সূরা ওয়াকেয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ *

"ঐসব মহিলাকে আমি বিশেষ নিয়মে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে সৃষ্টি করেছি চিরকুমারী সোহাগিনী করে, আমলনামা ডান হাতে প্রাপ্ত লোকদের জন্য।"
—সূরা ওয়াকিয়া- ১ম রুকু।

দুনিয়ার মুমিন নারীগণ যে অবস্থায় ও যে বয়সেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, বেহেশতে তাদেরকে নয়নাভিরাম যুবতী ও কুমারী নারীতে পরিণত করা হবে। আর বেহেশতের সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী দ্বারা তাদেরকে করা হবে সুশোভিত।

হাদীসে আছে, জনৈক বৃদ্ধা মহিলা এসে নবী করীম (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে আল্লাহ তাআ'লা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, হে অমুকের মাতা! বেহেশতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে মহিলাটি কাঁদতে লাগলেন। তখন নবী করীম (সঃ) উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ঐ মহিলাকে বলে দাও যে, বেহেশতে প্রবেশ করার সময় কেউ বৃদ্ধ থাকবে না। কেননা তখন সকলকেই যৌবন দান করা হবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "আমি তাদেরকে বিশেষ নিয়মে সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে করেছি কুমারী"। —শামায়েলে তিরমিযী।

নবী করীম (সঃ) এ কথাটি কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন। কিন্তু মহিলাটি অন্য অর্থ ভেবেছিল। মাঝে মাঝে নবী করীম (সঃ) কৌতুকও করতেন। এ ঘটনাটি সে শ্রেণীরই ঘটনা। তবে কৌতুকে কখনো তিনি মিথ্যা বলতেন না। যা কিছু বলতেন তা সঠিক ও সত্য কথা বলতেন।

اَبْكَار শব্দটি بِكْرٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ হচ্ছে কুমারী; তাদের স্বামীগণ যখনই তাদের সাহচর্যে আসবে ও মধুমিলনে প্রবৃত্ত হবে, তখনই তাদেরকে তারা নবযৌবনা কুমারীরূপে পাবে। —মিরকাত শরহে মেশকাত।

বয়ানুল কোরআন গ্রন্থকার লেখেছেন, যৌন মিলনের পর তারা পুনরায় কুমারীতে পরিণত হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে মারফু সনদ সূত্রে এ মর্মে একটি হাদীস দূররে মানছুরে উল্লেখ রয়েছে।

عُرُبًا শব্দটি বহুবচন, এর এক বচন হচ্ছে, عَرُوْبٌ অর্থ- স্বামীসোহাগিনী ও প্রেমময়। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) লিখেছেন, এসব মহিলাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা স্বামীর প্রতি হবে ভালবাসায় নিবেদিত প্রাণ। মিষ্ট-ভাষিণী, আমোদী ও কমিনী।

উপরোক্ত আয়াতে اَتْرَابًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ- সমবয়সী ও তরঙ্গময় যৌবনের অধিকারী মহিলা। বেহেশতে সমস্ত পুরুষের বয়স হবে। ত্রিশ কি বত্রিশ বছর। অনুরূপভাবে তাদের স্ত্রীগণও হবে তাদের সমবয়সী। গঠন প্রকৃতি ও বয়সে হবে তারা পুরুষের সমতুল্য। উভয়ের মন থাকবে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট। দুনিয়ায় পুরুষরা নিজেদের বয়সের চেয়ে কম বয়সী মহিলাদেরকে পছন্দ করে। কেননা কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেম-প্রীতির আকর্ষণ থাকে বেশি। বেহেশতের মহিলাগণ দুনিয়ার মুমিন মহিলাহোক বা বেহেশতের

হুর হোক, তাদের মধ্যে থাকবে রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেম-প্রীতির মাধুরিমা ষোল কলায় পরিপূর্ণ। এ কারণে সমবয়স হওয়া প্রেম-প্রীতি নিবেদনের পথে বাধা নয় বরং সমবয়সী হওয়াটা অধিক ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হওয়ার কারণ। স্বামী স্ত্রী উভয়ে থাকবে সন্তানশূন্য, আর বৃদ্ধাপনা হতেও তারা থাকবে নিরাপদ। সর্বদাই তারা মধ্য বয়সী থাকবেন।

মুফাস্‌সীর সুদ্দী (রঃ) اَتْرَابًا শব্দের ব্যাখ্যায় লেখেন ঃ তারা উভয়ে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও চরিত্রের দিক দিয়ে সমমানের হবে। ভাই-ভগ্নির মত মিল-মহব্বতে থাকবে। তাদের মধ্যে থাকবে না হিংসা-বিদ্বেষের লেশমাত্র। পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা বলতেও কোন কিছু তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না। —ইবনে কাছীর।

কোরআন মজীদে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেন–

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ *

"আর তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।"

—সূরা সোয়াদ– ৪র্থ রুকু।

অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি থাকবে একমাত্র স্বামীর প্রতি, মনও থাকবে স্বামীর প্রতি নিবিষ্ট। তারা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি উত্তোলন করে তাকাবে না।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, সমস্ত দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম। বেহেশতের মহিলাদের মধ্য থেকে কোন মহিলা যদি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে, তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থানে যা কিছু আছে সবকিছুকে ঔজ্জ্বল করে তুলবে এবং সুঘ্রাণে ভরে যাবে। তাদের মাথার ওড়নাখানা এত মূল্যবান যে, দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। —বোখারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বেহেশতী মহিলাদের পায়ের নলার ঔজ্জ্বল্য সত্তর পাল্লা পর্দার ভেতর থেকেও পরিদৃষ্ট হবে। এমনকি নলার ভেতরের মাংসপিণ্ডও দেখা যাবে। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লা কোরআন মজীদে বলেছেন ঃ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ অর্থাৎ বেহেশতী মহিলাগণ এতটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হবে, মনে হবে যেন, তারা ইয়াকুত ও মারজান পাথর। অতঃপর তিনি বলেন, ইয়াকুত এমন এক পাথর তুমি যদি তার ভেতরে একটি মোতি প্রবেশ করাও তাহলে পাথরের বাইর থেকেই তা দেখতে পাবে। —তিরমিযী।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতী এক পুরুষের কাছে এক মহিলা এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখবে। পুরুষ ব্যক্তি তখন তার মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাবে। সে তার গণ্ডদেশ আয়নার চেয়েও পরিষ্কার দেখবে। আর বেহেশতী মহিলাদের গলায় যে মোতির কণ্ঠহার থাকবে, তার ক্ষুদ্রতম মোতিটিও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানকে ঔজ্জ্বল করে তুলতে পারে। তাদের দেহে সত্তর পাল্লা পর্দা হবে, তা সত্ত্বেও তার ভেতর থেকে দেহের ঔজ্জ্বল্য পরিদৃষ্ট হবে। আর বেহেশতী পুরুষেরা কাপড়ের বাইর থেকে তার পায়ের নলা দেখে নেবে। —আহমদ, ইবনে হেব্বান, আত্তারগীব অত্তারহীব।

ঢুলু ঢুল নয়ন বিশিষ্ট হুর

'হুর' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে حَوْرَاءُ অর্থাৎ হুর বলা হয় সে সব বেহেশতী নারীকে, যাদের নয়নের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতা খুব গভীর। আর عَيْنٌ শব্দটি عَيْنَاءُ এর বহুবচন। অর্থাৎ সেসব মহিলা যাদের আঁখিযুগল বড় বড়। কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় সেসব মহিলাকে হুর বলা হয়, যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতী পুরুষদের সাথী করার জন্য স্বীয় কুদরতী ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। এরা হবে দুনিয়ার মুমিন স্ত্রীদের অতিরিক্ত। সূরা দুখানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ আমি ঢুলু ঢুলু নয়নবিশিষ্ট হুরদেরকে তাদের সাথী করব। সূরা আররহমানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

"বেহেশতের মহলসমূহে থাকবে সুচারিণী পরমা সুন্দরী মহিলা। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সেখানে আছে তাঁবুতে সুরক্ষিত হুর। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? সে হুরদেরকে পূর্বে কোন মানুষ স্পর্শ করেনি– করেনি কোন জিন স্পর্শ। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?" —সূরা রাহমান– ৩য় রুকু।

সূরা ওয়াকিয়ায় আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُوءِ الْمَكْنُوْنِ *

"তাদের জন্য রয়েছে ঢুলুঢুলু আঁখিবিশিষ্ট হুর, তারা যেন ঝিনুকে সুরক্ষিত মোতির ন্যায়।" —সূরা ওয়াকিয়া–১ম রুকু।

হুরদের সৌন্দর্য বর্ণনায় অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ *

"তাদের সঙ্গে থাকবে আনতনয়না আয়তলোচনা হুরীগণ, তারা যেন সুরক্ষিত ডিম।" —সূরা সাফ্ফাত– ২য় রুকু।

সূরা ওয়াকিয়ার উপরোক্ত আয়াতে হুরদের সুরক্ষিত মোতির ন্যায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব মহিলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তরতাজা মোতির ন্যায় চকচক করবে। আর সূরা সাফ্‌ফাতের আয়াতে তাদেরকে সুরক্ষিত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সর্বপ্রকার ময়লা ও দাগ হতে পবিত্র এবং মুক্ত।

মুফাস্‌সীর ইবনে কাছীর (র) হযরত হাসান (র) থেকে بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর মর্ম হল– এমন ডিম, যা হাতে স্পর্শ করার পূর্বে সুরক্ষিত থাকবে। আল্লামা বায়জাবী (র) লিখেছেন, হুরদেরকে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এ তুলনা হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে এবং সাদার সাথে হলুদ মিশ্রিত করলে যে রং ধারণ করে সেদিকের সাথে। এ রংকে দেহের সর্বোত্তম রংরূপে স্বীকার করা হয়।

হুরদের বিশেষ দোয়া ও স্বামীদের প্রতি আন্তরিকতা ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের সম্মানের জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেহেশতকে সুসজ্জিত করা হয়। সুতরাং রমযানের প্রথম দিন আরশের নীচে আয়তলোচনা হুরদের দেহে বেহেশতের পত্রপল্লবের বাতাস প্রবাহিত হয়। আর এ বাতাসের শিহরণে হুরগণ আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা করে, "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্যে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্ধারণ কর; যাদের দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং আমাদের দেখে তাদের প্রাণ শীতল হয়।
—বায়হাকী, মেশকাত।

হযরত মুয়ায (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ায় কোন স্ত্রী তার দ্বীনদার স্বামীকে অন্যায়ভাবে দুঃখ-কষ্ট দিলে তখন আয়তলোচনা হুরগণ দুনিয়ার ঐ স্ত্রীকে বলে, তোমার অনিষ্ট হোক, তুমি তাকে কষ্ট দিও না। কেননা সে তো কয়েক দিনের জন্য তোমাদের কাছে মেহমানস্বরূপ। অতি সত্বরই সে তোমাদের থেকে বিদায় হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশত ও তার অন্যান্য নেয়ামতসমূহ যেমন বর্তমান, তেমনি হুরগণও বর্তমান। হাফেজ মুনযারী (র) আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব গ্রন্থে উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে এক দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে যে, সালমা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতে মুমিন নারীগণ শ্রেষ্ঠ হবে, না আয়তলোচন হুরগণ? নবী করীম (সঃ) বললেন, বেহেশতে মুমিন নারীগণ হুরদের অপেক্ষা এতটা শ্রেষ্ঠ হবে, যেমন নীচের কাপড়ের তুলনায় উপরের কাপড়টি শ্রেষ্ঠ হয়। উম্মে সালমা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কারণে হবে ? নবী করীম (সঃ) বললেন, এর কারণ হল দুনিয়ার মুমিন মহিলারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহর ইবাদত করে।

উম্মে সালমা (রা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন কোন সময় একজন মহিলাকে পরপর দু'তিন ও চারজন পর্যন্ত স্বামীগ্রহণ করতে দেখা যায়। তারপর তার মৃত্যু হলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে আর তার স্বামীগণও মৃত্যুর পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। এমতাবস্থায় বেহেশতে কোন্ স্বামী তার সাথী হবেন? নবী করীম (সঃ) বললেন, তখন ঐ মহিলাকে তার স্বামীদের মধ্যে যেকোন একজনকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হবে। সুতরাং তখন সে ঐ স্বামীকে গ্রহণ করবে. যে চরিত্রের দিক দিয়ে ছিল সর্বোত্তম। আর সে বলবে, হে আল্লাহ! অমুকে দুনিয়ায় আমার কাছে সর্বোত্তম চরিত্রবান ছিলেন, তাকেই আমার স্বামী মনোনীত করুন। এ কথা বলে নবী (সঃ) বললেন, হে উম্মে সালমা, স্বচ্চরিত্র দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ডেকে আনে। —আত্তারগীব অত্তারহীব।

এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। কোন কোন হাদিসে পাওয়া যায় যে, দুনিয়ায় যে মহিলা প্রথম স্বামীর পর পুনরায় অন্য স্বামী গ্রহণ করে, সে বেহেশতে সর্বশেষ স্বামীকে লাভ করবে। অবস্থা যা-ই হোক না কেন, বেহেশতে নারী-পুরুষদের এমন অবস্থা হবে না যে, তারা সাথীহীন অবস্থায় থাকবে। কারো কারো জিজ্ঞাসা, দু' স্বামী বিশিষ্ট মহিলার অবস্থা কি হবে ? এ ব্যাপারটি এমন নয় যে, শরীয়তের কোন বিধান এর উপর নির্ভরশীল, বরং বেহেশতে আল্লাহ তাআ'লা যা কিছু স্থির করেন, সকলকে তাই উত্তম বলে মনে করতে হবে।

বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের গান ঃ

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে আয়তলোচনা হুরদের সমবেত হওয়ার একটি স্থান রয়েছে। সেখানে তারা সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলে, আমরা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী, কখনো আমরা ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদাই সুখ-শান্তিতে থাকব। কখনো অভাবী ও মুখাপেক্ষী হব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি সর্বদা খুশী থাকব। তাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। যারা আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের জন্য, তাদের ব্যাপারে আমাদের বলার কিছু থাকতে পারে না। (তারা এ গানটি এমন চিত্তাকর্ষক সুরলহড়ীতে গায় যে) এমন সুর সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেউ কখনো শুনেনি। —তিরমিযী, মেশকাত।

বেহেশতী পুরুষদের জন্য একাধিক স্ত্রী

বেহেশতে একজন পুরুষ কতজন স্ত্রী লাভ করবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীস বিদ্যমান। সহীহুল বোখারীতে উল্লিখিত এক হাদীসে আছে, বেহেশতের প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীরূপে দু'জন করে আয়তলোচনা হুর লাভ করবেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (র) ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তিনি অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থ থেকে এক হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, একজন সাধারণ বেহেশতী ব্যক্তি দুনিয়ার স্ত্রী ছাড়াও বাহাত্তর জন স্ত্রী লাভ করবেন (তারা হবে আয়তলোচনা হুর)।

আবু ইয়ালা সংকলিত এক হাদীসে আছে, একজন বেহেশতী ব্যক্তি মানুষের মধ্য থেকে দু'জন স্ত্রী লাভ করবেন। আর বাহাত্তর জন স্ত্রী লাভ করবে (বনী আদমের বাইরে থেকে) যাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পরজগতে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

সুনানে ইবনে মাজা গ্রন্থে এক হাদীসে উল্লেখ আছে, প্রত্যেক বেহেশতী পুরুষ স্ত্রীরূপে আয়তলোচনা হুরদের থেকে বাহাত্তর জন এবং বাহাত্তর জন পার্থিব মহিলাদেরকে লাভ করবে।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার এ ছাড়াও অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীসই সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী ও দুর্বল রয়েছে। সামগ্রিকভাবে এটাই জানা যায় যে, বেহেশতীদের অন্যান্য নেয়ামতের পাশাপাশি অনেক স্ত্রী লাভেরও সৌভাগ্য হবে। কেউ দু' স্ত্রীর কম পেয়েছেন এমন হবে না।

তবে সংখ্যার যে বিভিন্নতা পাওয়া যায়, তা আমলের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ নিজ নিজ নেক আমলের ভিত্তিতে যে শ্রেণীপার্থক্য হবে সে শ্রেণীপার্থক্যের কারণে স্ত্রীদের সংখ্যায়ও বিভিন্নতা দেখা দেবে।

কেউ কেউ এ প্রশ্নও উত্থাপন করেন যে, বেহেশতে পুরুষগণ অনেক অনেক স্ত্রী লাভ করবে কিন্তু একজন নারী কতজন পুরুষ লাভ করবে ? এ জিজ্ঞাসা অর্থহীন জিজ্ঞাসা। কেননা একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী লাভ হওয়া এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু একজন মহিলার জন্য একাধিক স্বামী হওয়া ভদ্র, লজ্জাশীল ও সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছে খুবই দোষণীয় বিবেচিত হয়। এহেন নির্লজ্জজনক কাজ যখন দুনিয়াতেই পছন্দ করা হয় না। তখন তা বেহেশতে কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? বেহেশতী মহিলাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, অর্থাৎ তারা হবে আনতনয়না, তাদের দৃষ্টি থাকবে নিম্নগামী, নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কারো প্রতি তাকাবে না। বলা যায় তারা একজন স্বামীতেই থাকবে সন্তুষ্ট। স্বামীর জন্য থাকবে তাদের মন-প্রাণ উৎসর্গিত। দুনিয়ার মানুষ অনর্থক তাদের বেশি স্বামী লাভের জন্য বিনা বেতনে ওকালতি করে। একজন স্বামী দ্বারাই যখন প্রাণ ভরে ও প্রয়োজন মেটে, তখন একাধিক স্বামীর প্রয়োজন কোথায়? দুঃখ হয় সেসব লোকের জন্য, যারা বেহেশতী মহিলাদেরকে অশালীন, দুষ্ট ও পাশ্চাত্যের অসভ্য মহিলাদের উপর কিয়াস করে। তাদের উচিত ছিল জাহান্নামী মহিলাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে দুনিয়ার মহিলাদেরকে মাকসুরাতুম ফিল খিয়াম অর্থাৎ পর্দার অন্তরালে রাখা। কিন্তু নির্বোধেরা হুরদের পর্দার ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে বেহেশতী মহিলাদের জন্য অশালীন ও নির্লজ্জতার পক্ষে ওকালতি করছে।

বেহেশতীদের যৌনক্ষমতা

বেহেশতীদের যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক অনেক স্ত্রী হবে, সেহেতু তাদের যৌনক্ষমতা ও রতিক্রিয়ার শক্তিও বাড়িয়ে দেয়া হবে অনেক অনেক গুণ।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইহুদী রাসূলে করীম (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল কাসেম! বেহেশতীগণ কি পানাহার করবে? নবী করীম (সঃ) বললেন, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তার কসম! একজন বেহেশতী লোককে পানাহার এবং স্ত্রীদের সাথে রতিক্রিয়া করণের জন্য একশজনের যৌনক্ষমতা প্রদান করা হবে। একথা শুনে ইহুদী লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, যারা পানাহার করে তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হয়। অথচ বেহেশত হচ্ছে এমন স্থান যেখানে কষ্টদায়ক কোন কাজ থাকবে না। সুতরাং সেখানে পেশাব-পায়খানার মত কষ্টদায়ক বস্তু কেন হবে ? প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বললেন, পানাহার করার পরও তাদের পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না, বরং ভরা পেট ঘাম নির্গত হয়ে খালি হবে। তাদের দেহ হতে মেশকের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ঘাম নির্গত হবে। ফলে তাদের পেট খালি হয়ে যাবে। —আহমদ, নাসাঈ, আত্‌তারগীব অত্‌তারহীব।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের একজন পুরুষকে একশ' পুরুষের যৌনক্ষমতা দেয়া হবে। সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটি হাদীস রয়েছে। সে হাদীসকে ইমাম তিরমিযী (রঃ) সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর সাথে সাথে হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের হাদীসের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। বেহেশত হচ্ছে একটি পবিত্রময় স্থান। সেখানকার নারী-পুরুষগণও পবিত্র। এ কারণে সর্বপ্রকার খারাপ ও অপবিত্র বস্তু হতে সেস্থান ও সেখানকার বাসিন্দারা পবিত্র ও মুক্ত থাকবে। সেখান পেশাব-পায়খানার যেরূপ প্রয়োজন দেখা দিবে না; অনুরূপ সেখানে বীর্যপাতও ঘটবে না। জামউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে মুহাদ্দিস তাবারানী লিখিত 'আল মুয়াজামুল কাবীর, গ্রন্থ হতে উল্লেখ করেছেন যে, বেহেশতের লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হবে বটে কিন্তু বিশেষ স্থান দুর্বল হবে না, যৌন খাহেশও বিনষ্ট হবে না এবং নারী ও পুরুষ কারোই বীর্যপাত ঘটবে না। —জমউল ফাওয়ায়েদ।

এ দুনিয়ার স্বাদময় জিনিসে ময়লা জড়িত থাকে। কিন্তু বেহেশতের স্বাদময় বস্তুতে কোন প্রকার ময়লা থাকবে না। এ কারণে বিছানা ও দেহ ময়লা ও অপবিত্র হয় এমন কোন বস্তু নির্গত হবে না। দুনিয়ার জীবনে বীর্যপাতকালে যে পুলকতা-শিহরণ ও আমোদ অনুভূত হয়, বেহেশতে বীর্যপাত ব্যতিরেকেই শতগুণ বেশি পুলক, শিহরণ ও আমোদ অনুভূত হবে। বেহেশতের প্রতিটি বস্তু হবে সেখানকার লোকদের চাহিদা অনুযায়ী। এ কারণে যত সময় ইচ্ছে তত সময় পর্যন্ত রতিক্রিয়ায় লিপ্ত থাকতে পারবে। আর যখন ইচ্ছে হয় তখন তা থেকে বিরত থাকতে পারবে।

ফায়দা ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিন লোকেরা বেহেশতে সন্তান লাভের ইচ্ছা করলে তখন স্ত্রীর গর্ভধারণ, গর্ভ খালাস এবং সে সন্তানের বয়স ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর হওয়া সব কিছু তাদের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী এক ঘন্টার মধ্যে সুসম্পন্ন হবে। —তিরমিযী, মেশকাত।

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের মতে বেহেশতে স্ত্রীর সাথে রতিক্রিয়া হবে বটে, কিন্তু কোন সন্তান জন্ম হবে না। চিন্তাবিদ তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে এরূপ অভিমতই বিদ্যমান। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন যে, বেহেশতী লোকেরা সন্তান লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে না। —তিরমিযী।

সার কথা হচ্ছে বেহেশত হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা-বাসনা ও আকাঙ্খা পূরণের স্থান। বেহেশতবাসীদের কারো মনে যদি সন্তান লাভের বাসনা জাগে তাহলে সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী ইচ্ছা ও বাসনা পূরণ হওয়া অনিবার্য। যেহেতু বেহেশতে সন্তান জন্মদান এবং বংশ বিস্তার করা যুক্তিযুক্ত নয়, এ কারণে বেহেশতীদের মনে আল্লাহ তাআ'লা সন্তান লাভের ইচ্ছা জাগরিত করবেন না। তবে বেহেশতে সন্তান জন্মদান কেন শোভনীয় নয় তা সেখানেই অবহিত হওয়া যাবে।

বেহেশতের বাজার

যেখানে আল্লাহর দীদার লাভ এবং রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

বেহেশতের মধ্যে একটি বাজার থাকবে। সেখানে সমস্ত বেহেশতীগণ জমায়েত হবে এবং আল্লাহ তাআ'লার দীদার লাভ করবে। আর তাদের রূপ সৌন্দর্যও বহুগুণে বেড়ে যাবে।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব (র) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআ'লার কাছে এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বেহেশতে কি কোন বাজার আছে? আবু হোরায়রা (রা) বললেন, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশ করার পর নিজ নিজ আমল অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন স্থানে যাবে। তারপর দুনিয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমআ'র দিনের সময় তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হবে। তখন তারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে যিয়ারত করবে। আল্লাহ তাআ'লা তখন তাঁর আরশকে প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে দীদার হওয়ার জন্য বেহেশতের বিরাট একটি বাগানে প্রকাশ হবেন। যারা আল্লাহর দীদার পাওয়ার জন্য জমায়েত হবে, তাদের জন্য নূরের তৈরি মোতির তৈরি ইয়াকুত পাথরের তৈরি যবরজদ পাথর, সোনা ও রৌপ্যের তৈরি মিম্বর পাতা হবে। বেহেশতীগণ নিজেদের শ্রেণী ও পদমর্যাদা অনুযায়ী তাতে উপবিষ্ট হবে। কিন্তু মান ও মর্যাদায় যারা সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর হবে, তারা বসবে মেশক ও জাফরানের টিলার উপর। কিন্তু টিলার উপর উপবিষ্টকারী লোকেরা মিম্বরের উপর

বসা লোকদেরকে নিজেদের তুলনায় খুব মর্যাদাবান ও উত্তম মনে করবে না। কেননা এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হলে তারা মনে মনে দুঃখ পাবে। (কিন্তু বেহেশতে দুঃখের কোন নাম গন্ধও নেই।)

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তখন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? নবী করীম (সঃ) বললেন, হ্যাঁ পাবে। তোমাদের কি সূর্য এবং পূর্ণিমার চন্দ্র দেখার ব্যাপারে কোন সন্দেহ হয়? আমি বললাম, না কোনই সন্দেহ নেই। তিনি বললেন, এভাবেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখার ব্যাপারে কোন সন্দেহ করবে না। আর সে মজলিসে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যার সাথে সামনাসামনি আল্লাহ তাআ'লার কথাবার্তা না হবে। এমনকি উপস্থিত লোকদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ তাআ'লা সম্বোধন করে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এই এই কাজ করেছিলে। এমনিভাবে আল্লাহ তাআ'লা তার কোন কোন চুক্তি ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, যা সে দুনিয়ার জীবনে করেছিল। তখন সে ব্যক্তি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেননি ? উত্তরে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি এবং আমার ক্ষমার কারণেই আজ তুমি এ পদমর্যাদায় উপনীত হতে পেরেছ। তখন সমস্ত লোক এ অবস্থায় থাকবে যে, এক খণ্ড মেঘ এসে তাদের উপর ছায়া হয়ে দাঁড়াবে। আর সে মেঘ এমন অভিনব সুগন্ধি বর্ষণ করবে, যা কেউ কখনো পায়নি। তখন আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হবে, তোমরা উঠ এবং সেই বস্তুর পানে চল, যা তোমাদের সম্মানের জন্য আমি তৈরি করে রেখেছি। আর তা থেকে তোমাদের যা পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা একটি বাজারে সমবেত হব, যে বাজার ফেরেশতাগণ আবেষ্টন করে রেখেছে। সে বাজারে ঐ জিনিসটিই পাওয়া যাবে, যা কখনো কোন নয়ন দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কারো অন্তকরণে তার চিন্তাও জাগেনি। সুতরাং যে জিনিসটি আমাদের মনে চাইবে সে জিনিসটি আমাদের জন্য উঠিয়ে নেয়া হবে। সেখানে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন থাকবে না।

নবী করীম (সঃ) কথা বলতে বলতে আরো বললেন, এ বাজারে বেহেশতীগণ একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে। উচ্চ মর্যাদাবান এক বেহেশতী নিম্ন মর্যাদাবান এক বেহেশতীর সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু নিজেদের অনুভূতিতে তারা কেউ ছোট হবে না। উচ্চ মর্যাদাবান লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ নিম্ন মর্যাদাবান লোকটির কাছে খুব পছন্দনীয় হবে। ইত্যাবসরে সেই উচ্চ মর্যাদাবান লোকটির পোশাকের তুলনায় তার নিজের পোশাক খুব ভাল মনে হবে। এটা এ কারণে হবে যে, বেহেশতে কোন লোক বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবারও অবকাশ পাবে না। এরপর আমরা (বেহেশতীরা) সবাই নিজ নিজ স্থানে রওয়ানা হব। সেখানে পৌঁছলেই আমাদের স্ত্রীগণ খোশআমদেদ জানাবার জন্য উপস্থিত

হবে। আর মারহাবা! আহলান সাহলান! বলার পর তারা বলবে, তোমরা এমন সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী নিয়ে এসেছ, যা আমাদের নিকট থেকে যাওয়ার সময় তোমাদের ছিল না। প্রত্যুত্তরে তারা বলবে, আজ আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কিছুক্ষণ অবস্থানের মহা সম্মান লাভ করেছি। তাই আমরা সে মহাসম্মানের সাথে আসারই উপযুক্ত। —তিরমিযী, মেশকাত।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার রয়েছে। যেখানে বেহেশতীগণ প্রতি জুমাআর দিন সমবেত হবে। সেখানে দক্ষিণা মলয় প্রবাহিত হবে। যা বেহেশতীদের চেহারা ও পোশাককে সুঘ্রাণে ভরপুর করে তুলবে এবং তাদের রূপ-সৌন্দর্যকেও অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। তেমনি তারা যখন অতিশয় সৌন্দর্য ও রূপমাধুরী নিয়ে পরিবারের লোকজনের কাছে ফিরে আসবে, তখন পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর নামের কসম করে বলছি; তোমরা আমাদের থেকে যাবার পর তোমাদের রূপ সৌন্দর্য অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। তখন তারাও বলবে, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমাদের যাওয়ার পর তোমাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়েছে অনেকগুণ।

—মুসলিম, আত্তারগীব, অত্তারহীব।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "বেহেশতে এমন একটি বাজার রয়েছে যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয় না। সেখানে নারী ও পুরুষের অনেক ছবি রয়েছে। সে ছবিগুলো দেখে কোন বেহেশতী যখন মনে করবে যে, এ ছবিটির মত যদি আমার রূপাকৃতি হত; ওমনি তার রূপাকৃতি ছবির অনুরূপ হয়ে যাবে। —তিরমিযী।

বেহেশতের বড় নেয়ামত আল্লাহর দীদার লাভ

হযরত সোহায়েব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন বেহেশতী যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তাআ'লা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা কি আরো কিছু চাও যে, আমি তোমাদেরকে তা দান করি? তখন তারা বলবে, আমাদের চাওয়ার আর কি আছে (আপনি যা কিছু দিয়েছেন, তাতো অনেক)। আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেননি? আপনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাননি? আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেননি? নবী করীম (সঃ) বলেন, তাদের এ জবাবের পর পর্দা উঠান হবে। তখন তারা আল্লাহ তাআ'লার দীদার লাভ করবে। তাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার চেয়ে তাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকানই হবে অধিকতর প্রিয়। এরপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ *

"যারা নেক আমল করেছে তাদের জন্য এ সৌন্দর্য হচ্ছে আরো বেশি।"

—মুসলিম মেশকাত।

হযরত আবু রাযীন ওকায়লী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেকেই কি আপন প্রতিপালককে এমনভাবে দেখতে পাবে যে, কারো দেখায় কোন পার্থক্য হবে না? নবী করীম (সঃ) বললেন, হা, প্রত্যেক ব্যক্তিই ভালভাবে দেখতে পাবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, পার্থিব কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কি তাঁর কোন উদাহরণ আছে? তখন তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! পূর্ণিমার চন্দ্রকে তোমাদের সবাই কি ভালভাবে দেখতে পায় না? আমি বললাম হ্যাঁ, দেখতে পায়। তিনি বললেন, চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লার সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটি। (যাকে এক সঙ্গে সবাই দেখতে পায়) আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট ও মহান সত্ত্বা। তাকে একই সময় সবাই কেন দেখতে পাবে না?) —আবু দাউদ, মেশকাত।

হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ যখন অফুরন্ত নিয়ামতের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে এমনি সময় হঠাৎ উপরে একটি নূর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন সকলে মাথা উত্তোলন করে দেখবে। তারা দেখবে, তাদের উপর রয়েছে সৃষ্টিকুলের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লা। তাদের দর্শণকালে আল্লাহ তাআ'লা বলবেন;

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْجَنَّةِ *

"হে বেহেশতবাসী! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বলা হবে তোমাদের জন্য শান্তি) এ আয়াতেই সে কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, সালামের পর আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতবাসীর প্রতি তাকিয়ে থাকবেন এবং বেহেশতবাসীরাও তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা পর্দার অন্তরালে চলে যাবেন। কিন্ত তাঁর নূর থেকে যাবে। নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, বেহেশতীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার প্রতি তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতের কোন নেয়ামতের প্রতি তাদের লক্ষ্য থাকবে না।—ইবনে মাজা, আত্‌তারগী অত্‌তারহীব।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি হবে সে লোক, যে ব্যক্তি তার বাগবাগিচা, আসন, স্ত্রী সেবকগণসহ অন্যান্য নেয়ামতসমূহকে এক হাজার বছরের পথ চলা পরিমাণ স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত দেখতে পাবে। (অর্থাৎ এ জিনিসগুলো এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে যে, এসব জিনিস দেখার জন্য দুনিয়ার কোন ব্যক্তি যদি বের হয়। তাহলে তার হাজার বছর চলতে হবে।) আর আল্লাহ

তাআ'লার কাছে সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান বেহেশতী হবে সেই ব্যক্তি যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর দীদার লাভ করে ধন্য হবেন। অতঃপর নবী করীম (সঃ) কোরআন মজীদের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *

"সেদিন স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনেক মুখমণ্ডল খুশীতে বাগবাগ হবে।"—তিরমিযী, আবু ইয়ালা, তাবারানী, আত্তারগীব অত্তারহীব।

হাদীসে বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যবর্তীদের মর্যাদার কি হবে এবং তারা কি কি নেয়ামত ভোগ করবে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন। আল্লাহর দীদার সব বেহেশতীরাই লাভ করবে বটে, কিন্তু যারা সবচেয়ে উচ্চমর্যাদা লাভ করবে, তারাই হবে সকাল সন্ধ্যায় দীদার লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী।

ফায়দা ঃ (১) দুনিয়ায় আল্লাহ তাআ'লাকে দেখা যাবে না। কিন্তু মু'মিন লোকেরা বেহেশতে তাকে দেখতে পাবেন। কিন্তু কাফের মুনাফেকরা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। এ নেয়ামত হচ্ছে বেহেশতের সব নেয়ামতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআ'লা দেহ অবয়ব, আকৃতি ও দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ তাআ'লাকে বেহেশতী লোকেরা দেখবে এটা অবিসংবাদিত সত্য বিষয়। এ বিষয়ে ঈমান রাখা ফরয। কিন্তু দেখার ধরন সম্পর্কে আমরা কিছুই অবগত নই।

পাপী মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে প্রবেশ

কবিরা গুনাহগার লোকদের বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষমা না পেয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে কবিরা গুনাহগার লোক প্রত্যেকেই যে জাহান্নামে যাতে তা নয়। কেননা অনেক কবিরা গুনাহগারকেও আল্লাহ ক্ষমা করবেন এবং জাহান্নাম হতে রক্ষা করবেন। আর সকলকেই যে ক্ষমা করা হবে তা-ও নয়। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অনেক গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে যাবে।

শাস্তি ভোগ শেষে তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু বেহেশত থেকে কেউ কখনো বের হবে না এবং তাদেরকে বের করাও হবে না। অবশেষে জাহান্নামে কেবল মাত্র কাফের মুশরেক ও মুনাফেকরাই চিরন্তনভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

"যারা কুফরী করে ও আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হবে আগুনের অধিবাসী। যাতে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে।"

সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামের পৃষ্ঠদেশে পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। নবী-রাসূলদের মধ্যে নিজ নিজ উম্মতসহ সর্বাগ্রে আমিই পুলসেরাত পার হব। সেদিন নবী-রাসূল ছাড়া কারো মুখে কথা ফুটবে না। সেদিন নবী-রাসূলদের মুখে থাকবে শুধু এ কথা اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখুন! নিরাপদে রাখুন! জাহান্নামে সুউদান কাঁটার ন্যায় বড় বড় সাড়াশী থাকবে। এগুলো যে কত বড় তা আল্লাহই জানেন। সে সাড়াশীগুলো আগুন ধরার চিমটায় মোড়ানো থাকবে। সেগুলো জাহান্নাম হতে বের হয়ে মানুষকে তাদের বদ আমলের কারণে আঁকড়িয়ে ধরবে। তার ধরার কারণে তারা গড়িয়ে জাহান্নামে পড়ে ধ্বংস হবে, কেউ কেউ কেটে জাহান্নামে পড়বে। এদের মধ্যে গুনাহগার মুসলমানদের শাস্তি ভোগ শেষে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়া হবে। আল্লাহ তাআ'লা মানুষের বিচার-ফয়সালা করার পর যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমার প্রতি ঈমান পোষণকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেবেন– যারা একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করত তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের কর। সুতরাং ফেরেশতারা এ ধরনের লোকদেরকে জাহান্নাম হতে বের করবেন। তারা তাদেরকে কাপালের সেজদা করার নিদর্শন দ্বারা চিনতে পারবেন। কেননা আল্লাহ তাআ'লা জাহান্নামের আগুনের জন্য সেজদার নিদর্শনের স্থান জ্বালান নিষিদ্ধ করেছেন।

সুতরাং জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে যারা ভুনা হয়েছে (ঈমানের কল্যাণে) তাদেরকে জাহান্নাম হতে নাজাত দেয়া হবে। তারপর তাদের দেহে আবে হায়াতের পানি ঢালা হবে। অতঃপর তারা এমনভাবে নতুনরূপ ধারণ করবে, যেন, প্রবাহিত পানির উপর আবর্জনা স্তূপে নতুন চারাগাছ জন্মায়। অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ তাদের রূপের পরিবর্তন হবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুন্দর রূপ ধারণ করবে। —মেশকাত।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশের পর আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। সুতরাং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তাদের দেহ আগুনে জ্বলে-পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে নহরুল হায়াতে (আবে হায়াতের নহরে) ফেলা হবে।

—বোখারী, মুসলিম।

আর এক হাদীসে আছে, এরা সবাই আবে হায়াত হতে বের হয়ে মোতির ন্যায় উজ্জল রূপ ধারণ পূর্বক বেহেশতে প্রবেশ করবে। —বোখারী মুসলিম।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গুনাহের শাস্তিভোগের কারণে অনেকের দেহে আগুনে পোড়ার নিদর্শন থাকবে। আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় দয়া ও করুণায় তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে বেহেশতে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করা হবে। —বোখারী, মেশকাত।

এদেরকে হীন-তুচ্ছ ও অপমানিত করার উদ্দেশ্যে জাহান্নামী বলা হবে না, বরং আল্লাহ তাআ'লা যে, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা করেছেন, তা স্মরণ করবার জন্যই বলা হবে। যাতে তারা জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করে বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "জাহান্নামীদের দু'ব্যক্তি খুবই হৈ চৈ ও শোরগোল শুরু করবে। আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার হুকুম দেবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা এত হৈ চৈ করছ কেন? তারা বলবে, আমরা হৈ চৈ করছি এজন্য যে, আপনি যেন আমাদের প্রতি দয়া করেন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের প্রতি আমার দয়া ও করুনা হচ্ছে, জাহান্নামে তোমরা যে স্থানে ছিলে, সে স্থানে ফিরে যাও। অনন্তর তাদের একজন নিজেকে জাহান্নামের সে স্থানে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য জাহান্নামের আগুন শীতল করে দেবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়েই থাকবে, নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে না। আল্লাহ তাআ'লা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে না? সে বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি আশা করি, আপনি যখন আমাকে জাহান্নামে থেকে বের করে এনেছেন, তখন পুনরায় সেখানে ফেরত পাঠাবেন না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন যাও, তোমার আশা পূরণ করা হল। অতঃপর তাদের উভয়কে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

—তিরমিযী, মেশকাত।

সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ও সবচেয়ে নিচু স্তরের বেহেশতী ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি তাকে ভালভাবেই চিনি ও জানি, যে সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সবার শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সে পেটের উপর ভর করে ঘষতে ঘষতে জাহান্নাম হতে বের হবে। তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বেহেশতের দরজায় এলে তার কাছে মনে হবে, বেহেশত লোকে পূর্ণ হয়ে গেছে, একটুও খালি নেই। তখন সে আরয করবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি তো বেহেশত পরিপূর্ণ দেখছি, কোথাও তো খালি নেই, ভেতরে যাব কিভাবে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, প্রবেশ কর, বেহেশতে

তোমায় দুনিয়ার সমান এবং অনুরূপ আরো দশগুণ জায়গা দেয়া হয়েছে। একথা শুনে সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? অথচ আপনি তো রাজাধিরাজ।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী করীম (সঃ) একথা বলে হাসছেন, যার ফলে তাঁর দাড়ি মোবারকের তলদেশ পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সাহাবীদের মধ্যে একথা বলাবলি হতে লাগল যে, এ হবে সবচেয়ে নিম্নমানের বেহেশতী এবং সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী, তারপরও দুনিয়া এবং দুনিয়ার ন্যায় দশগুণ স্থান সে লাভ করবে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সবশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে সবার শেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে জাহান্নাম হতে বের হওয়ার সাহস নিয়ে চলতে থাকবে। চলতে চলতে কখনো পড়ে যাবে, কখনো আগুনের শিখা তাকে দহন করবে। এভাবে চলা ও পড়ার প্রক্রিয়ায় সে যখন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে সামনে চলে আসবে, তখন জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে বলবে, সে মহান আল্লাহ তাআ'লা খুবই বরকতময়, যিনি আমাকে তোমার থেকে নাজাত দিয়েছেন। বাস্তবিকই আল্লাহ তাআ'লা আমাকে এমন নেয়ামত দান করেছেন যা পূর্বের ও পরের কাউকে দেননি। এরপর এক বিরাট বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচর করা হবে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করুন, যাতে আমি তার ছায়া গ্রহণ এবং নিম্নদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, আমি যদি তোমাকে এ নেয়ামত দান করি, তবে বিচিত্র নয় যে, তুমি আরো পাওয়ার আবেদন করতে থাকবে। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! এমনটি হবে না। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এরপর আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা তখন তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন যে, সে মুহূর্তে তার এ নিয়ত থাকলেও পরবর্তীতে সে তা ঠিক রাখতে পারবে না। কেননা তখন তার সেই বস্তু পরিদৃষ্ট হবে, যা ছাড়া সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং তাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হবে এবং সে তার ছায়ায় গিয়ে বসবে ও সুশীতল পানি পান করবে।

এরপর তার দৃষ্টির সম্মুখে আর একটি গাছ তুলে ধরা হবে, যা প্রথমটি অপেক্ষা আরো সুন্দর ও মনোরম। তা দেখামাত্র সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এ গাছের কাছে পৌঁছে দিন, যাতে আমি তার তলদেশে প্রবাহিত পানি করতে পারি, এ ছাড়া আমি আর কিছু চাই না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ওহে আদম সন্তান! তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? আমি যদি তোমাকে উক্ত গাছের নিকটবর্তী করি তবে বিচিত্র নয় যে, পুনরায় তুমি অন্য কিছু চাওয়া শুরু করবে। সে অঙ্গীকার করে বলবে, এছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। এ

অবস্থায় আল্লাহ তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন। কেননা এরপরও সে এমন জিনিস দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। অতঃপর তাকে ঐ বৃক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে এবং সে তার সুশীতল ছায়ায় বসে পানি পান করবে।

এরপর বেহেশতের দরজার সন্নিকটে আর একটি বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচর করা হবে, যা পূর্বের বৃক্ষ দু'টির তুলনায় খুবই চমৎকার ও সুন্দর হবে। এবারো সে আরয করবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাকে এ বৃক্ষের কাছে পৌঁছে দিন, যাতে তার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তার তলদেশে প্রবাহিত পানি পান করতে পারি। এছাড়া আমি আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হে আদম সন্তান তুমি কি অঙ্গীকার করনি যে, আর কিছু চাইবে না? সে বলবে, হে আল্লাহ! অঙ্গীকার তো করেছিলাম ঠিকই। (কিন্তু এবারের জন্য আমার আবেদন মঞ্জুর করুন) এছাড়া আর কিছু চাইব না। আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিরূপায় নিরূপণ করবেন। কেননা এরপরও সে এমন বিষয় দেখবে, যা না পাওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। অনন্তর তাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হলে সে বেহেশতীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে। (এতে তার লোভ হবে) তাই সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে বেহেশতের অভ্যন্তরে পৌঁছে দিন। আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, হে আদম সন্তান! কি পেলে তোমার চাহিদা মেটবে? সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমান আরো (বেহেশত) দিলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে আল্লাহ! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? অথচ আপনি হচ্ছেন জগৎ আলমের পালনকর্তা। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এ পর্যন্ত বর্ণনা করে হাসলেন। আর সমবেতদেরকে বললেন, তোমরা কেন জিজ্ঞেস করছ না আমি কেন হাসছি? সমবেতগণ বললেন, বলুন কেন হাসছেন? তিনি বললেন, কেননা নবী করীম (সঃ) এ হাদীস বর্ণনা করে এভাবে হাসতেন, (তাই আমি হাসছি।) সাহাবা (রা)গণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হাসছেন কেন? নবী করীম (সঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের হাসিতে আমার হাসি এসেছে। বান্দা যখন বলে, হে প্রতিপালক! আপনি কি আমার সাথে কৌতুক করছেন? আল্লাহ তখন বলেন, আমি তোমার সাথে কৌতুক করছি না বরং বাস্তবিকই আমি তোমাকে এ পরিমাণই দিয়েছি। আমার যা ইচ্ছা তাতেই আমি পুরাপুরি সক্ষম। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবু হোরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকেও এ ঘটনার খুইই কাছাকাছি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু হোরায়ারা (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষে উল্লেখ হয়েছে, (ঐ ব্যক্তি বারংবার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে।) তখন আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমরা মনে যা চায় তাই নিয়ে নাও। (সে যা-ই চাইবে তা-ই পেতে থাকবে।) অবশেষে তার কোন ইচ্ছাই আর বাকী থাকবে না, তার সব আকাংক্ষা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআ'লা তখন বলবেন,

তুমি কামনা কর এখনো তো অমুক নেয়ামত বাকী রয়েছে, মনে মনে বসনা কর এখনো তো অমুক নেয়ামত বাকী রয়েছে, মনে মনে বাসনা কর, অমুক জিনিস তো রয়ে গেছে। এভাবে আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে একের পর এক কামনা বাসনার কথা বলবেন, আর তা পূরণ হতে থাকবে। কামনা বাসনা সব শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা কিছু কামনা করেছিলে, তা সবই দেয়া হয়েছে এবং তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি দেয়া হয়েছে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তুমি যা চেয়েছিলে তা সবই এবং তার চেয়ে আরো দশগুণ বেশি দেয়া হয়েছে। এরপর সে বেহেশতী গৃহে প্রবেশ করলে আয়তলোচনা দু'জন হুর তার কাছে আসবে। তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ তাআ'লার জন্য, যিনি তোমাকে জীবিত রেখেছেন এবং তোমার জন্য আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন। তখন সে বলবে, আমি যে নেয়ামত লাভ করেছি, এরূপ আর কেউ লাভ করেনি। —মুসলিম, মেশকাত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সবশেষে যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে বলবেন, দাঁড়াও এবং বেহেশতে প্রবেশ কর। এ কথা শুনে সে মুখ বেজার করে বলবে, সেখানে জায়গা কোথায় যে, প্রবেশ করব? আমার জন্য কি কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন? আল্লাহ্ তাআ'লা বলবেন, হাঁ, (তোমার জন্য অনেক কিছুই আছে।) তোমার জন্য এত বিশাল স্থান রয়েছে, যতদূর বিস্তৃত স্থানে সূর্য উদয় ও অস্ত যায়।—তাবারানী, আততারগীব অততারহীব।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, সে-ই হবে নিম্নতম বেহেশতী, যার আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তার জন্য মোতি এবং যবরজদ্ ও ইয়াকুত পাথরে নির্মিত এমন এক অট্টালিকা থাকবে, যা দৈর্ঘ্য প্রস্থে জবীয়া (নামক স্থান) হতে সানায়া পর্যন্ত পথের সমান বিস্তৃত। —তিরমিযী, আততারগীব অততারহীব।

হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি তাকে ভালভাবেই জানি ও চিনি, যে সবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং সবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। হাশর ময়দানে তাকে উপস্থিত করে বলা হবে– তার ক্ষুদ্রতম গুনাহ্গুলো তার সামনে পেশ কর.এবং কবীরাগুনাহ্ গুলো গোপন রাখ। অনন্তর তার সামনে ক্ষুদ্র গুনাহগুলো পেশ করে বলা হবে, তুমি অমুক দিন অমুক অমুক আমল করেছিলে, অমুক দিন এই এই কাজ করেছিলে। তখন সে তা স্বীকার করবে, অস্বীকার করতে পারবে না। সে তখন মনে মনে ভয় পেতে থাকবে যে, না জানি আমার কবীরা গুনাহগুলোও উপস্থাপন করা হয়। তাকে বলা হবে, তোমার প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে এক একটি পূণ্য দেয়া হল। এ আশাতীত সৌভাগ্য দেখে সে বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমি তো আরো

অনেক গুনাহ করেছি, যা এ আমলানামায় দেখছিনা। (সেগুলোর পরিবর্তেও তো এক একটি পুণ্য পাব) বর্ণনাকারী বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে দেখলাম, একথা বলে তিনি হাসলেন। যার ফলে তাঁর দাড়ি মোবারকের তলদেশ প্রকাশ পেয়েছিল। —মুসলিম, মেশকাত।

উপরোল্লিখিত হাদীস দ্বারা একজন নিম্নস্তরের বেহেশতীর মান- মর্যাদা ও মাহাত্ম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। তার অবস্থাই যখন এত ব্যাপক, তখন ক্ষুদ্র হতে সর্ব্বোচ্চ এবং তাদের মধ্যবর্তীদের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও নেয়ামত সমূহ যে কত উচ্চ মানের ও বিপুল পরিমাণে হবে, তা এ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারাই অনুমান করা যায়। ক্ষুদ্রমানের বেহেশতী যা লাভ করবে, তার আলোচনায় কোন কোন হাদীসে আছে যে, এক হাজার বছর পথ চলার দূরত্বসম স্থানে সে তার নেয়ামতসমূহ দেখতে পাবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ক্ষুদ্রমানের বেহেশতী বেহেশতে যে স্থান লাভ করবে, তা হবে সমগ্র দুনিয়া এবং তার দশগুণেরও বেশি। কোন কোন বর্ণনায় অন্যভাবেও নিম্নস্তরের বেহেশতীর নেয়ামতের বিবরণ পাওয়া যায়। এ পার্থক্য নেয়ামতের পার্থক্য নয় বরং সমবেতদের বুঝার উপযোগী ভাষা প্রয়োগে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এটাও হতে পারে যে, ক্ষুদ্র দ্বারা সাধারণ ক্ষুদ্র বুঝান হয়নি, বরং ক্ষুদ্রামানের মধ্যেও বহু প্রকার হবে। এ কারণে পার্থক্য ও ব্যবধান অনুযায়ী স্থানের-বিস্তৃতি এবং নেয়ামতের ব্যাপকতা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মানুষ যা দেখে ও বুঝে, সে অনুযায়ী বুঝালেই অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তার কিছুটা অনুমান উপলব্ধি আসে। এ জন্যই তাদের কথাবর্তার নিয়ম অনুযায়ী বুঝানো হয়েছে। আসল বাস্তবতা তো সেখানে গিয়েই জানা যাবে। প্রত্যেকেই তখন স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারবে। শুনে শুনে ধারণা ও অনুমান করে তারা যা বুঝেছিল, সেখানে গিয়ে তার চেয়েও বেশি প্রাপ্ত হবে। বিরুদ্ধবাদী ধর্মদ্রোহীরা বেহেশতের প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে প্রশ্ন তোলে, এত বড় বেহেশত কোথায় হবে? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বেহেশত সে তো এখানো বর্তমান। হযরত আদম (আ) সেখানে অবস্থান করে এসেছেন। সংকীর্ণ দৃষ্টি ও বোধ জ্ঞানের মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধির বাইরে হলেও তা অবাস্তব নয়। বিজ্ঞান, সে তো আজো পর্যন্ত পৃথিবীর সব সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কেই তথ্য-সন্ধান দিতে পারেনি। তা নভোমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে পৌঁছলেও এমন সব সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ, যা আকাশ ও যমীনের স্বাভাবিকতার বাইরে। অতএব এটা অজানা থাকা আশ্চার্যের কিছু নয়। কয়েকশ' বছর আগেও আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই ছিলনা। মহান সৃষ্টিকর্তা যখন তা প্রকাশ করেছেন; তখনই মানুষ সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। মহা শক্তিমান সত্তা 'কুন' বা হও শব্দ প্রয়োগেই সব কিছু বানাতে

সক্ষম। আল্লাহ তাআ'লা কেবলমাত্র আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করতে সক্ষম, (তার বাইরে নয়) এমন ধারণা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির বিস্তৃতির সাথে কুঁয়ার ব্যাঙের তুলনা করা চলে। ব্যাঙ যেমন নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কুঁয়াকেই সবচেয়ে বড় জলাসয় বলে মনে করে, বিশাল বিশাল অথৈ জলের সমুদ্র সম্পর্কে থাকে অজ্ঞ। তেমনি সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সন্ধানীগণ সে সব বিষয় স্বীকার করতে চায় না, যা তাদের বুঝ জ্ঞানের বাইরে। বেহেশত অস্বীকার কারীরা নিজেদের অহমিকা ও দুর্ভাগ্যের কারণে বেহেশত থেকে বঞ্চিত থাকবে। এবং প্রবেশ করবে জাহান্নামের অতল গহবরে। তাই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

لَا يَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى *

"নিতান্ত দুর্ভাগা তারা, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মুখ ফিরিয়ে থাকে। তারা ছাড়া কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" নিঃসন্দেহে বেহেশত এক বিশাল স্থান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছু বেহেশতের নেয়ামতসমূহের তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। সেখানকার প্রশস্ততার কথা কে ভাবতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا *

"যখন তুমি দেখবে, তখন দেখবে, বিপুল নেয়ামতপূর্ণ বিশাল এক সাম্রাজ্য।"

সুতরাং এ সাম্রাজ্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে কতটুকু হবে, তা একজন ক্ষুদ্রমানের বেহেশতীর প্রাপ্ত নেয়ামত ও জায়গা দ্বারাই অনুমেয়।

বেহেশতে চিরকাল অবস্থান করবে, সেখানে মৃত্যু ও ঘুম আসবেনা

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও অসৎ কাজ করে, তারাই সৃষ্টিকুলের উত্তম সৃষ্টি। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান হচ্ছে এমন বেহেশত, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে বসবাস করবে। আল্লাহ তাআ'লা তাদের প্রতি, আর তাঁরাও আল্লাহ তাআ'লার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এ বেহেশত হবে তাঁদের জন্য, যারা তাঁদের প্রতিপালককে ভয় করে।" —সূরা বায়্যেনাহ।

উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাঁরা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে' একথার মর্মার্থ– তারা স্বীয় প্রতিপালকের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। তাদের প্রতিটি ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহ দানের জন্য তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকবে।

সূরা দোখানে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে সর্বপ্রকার ফল ফলারি প্রার্থনা করবে। জাগতিক মৃত্যু ছাড়া সেখানে তাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে নিরাপদ রাখবেন। এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। আর এ-ই হচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।" —সূরা দোখান- ৩য় রুকু।

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা যখন বেহেশতীগণকে বেহেশতে, আর জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে প্রবেশ করান শেষ করবেন, পরিশেষে জাহান্নামে এমন কেউ থাকবে না, যাকে শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে যেতে হবে। তখন এক ঘোষক উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করবে, ওহে বেহেশতীগণ ! তোমাদের মৃত্যু নেই। ওহে জাহান্নামীগণ! তোমাদেরও মৃত্যু নেই। তোমরা আজ যে যেখানেই আছ, তাকে সেখানেই চিরকাল অবস্থান করতে হবে। —বোখারী, মুসলিম।

হযরত জাবের (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতীগণ কি নিদ্রা যাবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর ভাই, আর বেহেশতীদের কখনো মৃত্যু হবে না (অতএব তাদের নিদ্রাও হবেনা)।

—বায়হাকী, মেশকাত।

রোগ-ব্যধি, দুর্বলতা ও পরিশ্রম করার কারণেই নিদ্রা আসে। বেহেশতে যেহেতু রোগ-ব্যাধি,অবসাদ -দুর্বলতা ও পরিশ্রম বলতে কিছুই থাকবে না। তাই নিদ্রারও কোন প্রয়োজন থাকবে না এবং তা আসবেও না। দুনিয়াতেও নিদ্রা কারো নিজস্ব স্বভাবজাত পছন্দনীয় উদ্দেশ্য নয়। অবসাদের কারণে ঘুমালে যেহেতু শরীর হালকা হয় ও সুস্থবোধ করে, দেহে সচেতনতা ও চাঙ্গা বোধ করে, একারণেই মানুষ নিদ্রা পছন্দ করে। কোন কারণে ঘুম না এলে ঔষধ সেবন করে ঘুমানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যেখানে অবসাদ থাকবে না সেখানে কেউ ঘুমাতে পছন্দ করবে না। সেখানে নিদ্রা যাওয়া কেউ পছন্দ করবে না। কেননা তখন নিদ্রায় গেলে যত সময় ব্যয় হবে, ততো সময় আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করা হতে বঞ্চিত হবে।

বেহেশতে সবকিছু ইচ্ছাও বাসনা অনুযায়ী হবে ঃ

কোরআন মজীদে আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ *

"আর মনে যা চাইবে এবং যা দেখে নয়ন জুড়াবে, তা সবই সেখানে (বেহেশতে) থাকবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা এখানে চিরকাল অবস্থান করবে।" —সূরা যুখরাফ -৭ম রুকু।

সব কিছু যখন মনের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যাবে, কাজেই সেখানে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার কষ্ট ক্লেশের নাম গন্ধও থাকবে না। দুনিয়ায় কেউ যত বড় লোকই হোক না কেন, তার অপছন্দনীয় অনেক বিষয়ই তাকে সইতে হয়। যত বড় ধনশালী কিংবা রাজা-বাদশাই হোক না কেন, তার সকল কামনা বাসনা কখনো পূরণ হয় না। দুনিয়াতে তা কখনো সম্ভবও নয়। কে-বা পায়াখানয় যেতে চায়? কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাকে সেখানে যেতেই হয়। একমাত্র বেহেশতেরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেখানে ইচ্ছার পরিপন্থি কিছুই হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ *

"তোমাদের মনে যা চাইবে, তোমাদের জন্য সেখানে তাই রয়েছে। আর তোমরা যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য সেখানে তাও আছে।"

—সূরা হামীম সেজদা -৪র্থ রুকু।

বেহেশতীগণ বেহেশত থেকে বেরুতে চাইবে না এবং বের করা ও হবে না

সূরা হিজর এ আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন ঃ

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ *

"সেখানে তাদেরকে দুঃখ কষ্ট বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করাও হবেনা।" —সূরা হিজর – ৩য় রুকু।

সূরা কাহাফের শেষাংশে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে, তাদের আতিথেয়তার জন্য ফেরদৌস বা বেহেশতী বাগান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, সেখান থেকে কোথাও যেতে চাইবেনা।" —সূরা কাহাফ -২য় রুকু।

বেহেশতে যেহেতু দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধও নেই এবং মনের সব চাহিদাই পূরণ করা হবে, তাই সেখান থেকে কোথাও যেতে মন চাইবে না। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনও পড়বে না, সব কিছুই সেখানে উপস্থিত থাকবে। সেখানে পারস্পরিক মেলামেশা, ভালবাসা, অন্তরঙ্গতা এবং প্রিয়জন নিকটাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব সবই থাকবে। আর আল্লাহ তাআ'লাও থাকবেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এসব ছেড়ে বাইরে যেতে চাওয়ার কোন অর্থই হয় না।

আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির ঘোষণা ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা যখন বেহেশতীদেরকে আহবান করবেন, তখন তারা আরয করবে, হে

আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার আদেশ পালনে সমুপস্থিত, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই নিহিত। এরপর আল্লাহ তাআ'লা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনি যখন আমাদেরকে এমন এমন নেয়ামন দান করেছেন, যা আপনার সৃষ্টিকুলের আর কাউকে দেননি, তা পেয়েও আমরা সন্তুষ্ট হব না কেন? পুনরায় আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, তোমাদের কি এর চেয়েও উত্তম নেয়ামত দান করবো? তারা বলবে এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? আল্লাহ তাআ'লা বলবেন, ভালভাবে জেনে রাখ! আমি সব সময়ের জন্য তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছি। তোমাদের প্রতি আমি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। —বোখারী, মুসলিম।

বেহেশতে যা কিছু থাকবে তার চেয়ে সর্বাপেক্ষা বড় পাওয়া হবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং সব সময়ের জন্য তাঁর সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা দেবেন। একজন ভদ্র ও অনুগত গোলামের জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে যে, তার মনিব তার প্রতি সন্তুষ্ট। সব কিছু পাওয়ার পরও যদি মনিব তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে, কিংবা অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন নেয়ামতের ব্যবহারে হৃদয়ে শান্তি আসে না, মন ও স্বভাবে অশান্তি অস্থিরতা বিরাজ করতে থাকে। আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের প্রতি চির সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা দিয়ে চিরদিনের জন্য তাদেরকে নিশ্চিন্ত করবেন। বেহেশতীগণ আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির ঘোষণা শুনে আন্তরিকভাবে এতটা খুশি হবে, এ জগতে যার কোন উদাহরণ নেই। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর বেহেশতীগণও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ সেখানে কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। মনে কোন কুণ্ঠা বোধ সৃষ্টি হবে না। যা পাওয়া যাবে, তাতেই মন পরিতৃপ্ত হবে। আল্লাহ পাকের দান-দক্ষিণা, পুরস্কার পেয়ে তারা মনে প্রাণে পরিতুষ্ট থাকবে।

বেহেশতের শ্রেণী স্তর

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, তার জন্য সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে দেশান্তরি হোক অথবা জন্মভূমিতেই অবস্থান করুক না কেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা কি এ সুসংবাদ মানুষের কাছে পৌছে দেব? নবী করীম (সঃ) বললেন, নিঃসন্দেহে বেহেশতে শত স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাআ'লা তাঁর পথে জেহাদকারীদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক দু'দরজার ব্যবধান হচ্ছে, আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান। অতএব আল্লাহ পাকের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে, ফেরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা

ফেরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত স্তরের বেহেশত। তার উপরেই মহান আল্লাহ তাআ'লার আরশ স্থাপিত, সেখান থেকেই বেহেশতের চারটি নহর প্রবাহিত।

ফাতহুল বারী গ্রন্থকার লিখেছেন, এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, বেহেশতের শত স্তর হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য। কিন্তু একথা বলা হয়নি যে, যারা মুজাহিদ নয় তাদের জন্য এ শত স্তর ভিন্ন দ্বিতীয় কোন স্তর রয়েছে, যা মুজাহিদগণের স্তরের তুলনায় নিম্নমানের।

এ হাদীসটি ইমাম বোখারী (র) কিতাবুতাওহীদে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুলবারী লিখেন, এখানে যদিও একশ'র কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বেহেশতে শ্রেণী বা স্তর শুধুমাত্র একশ'তেই সীমাবদ্ধ। কেননা একশ'স্তরের উল্লেখ করায় তার চেয়ে বেশি হওয়া নিষিদ্ধ হয় না। যেমন আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হেব্বানে উদ্ধৃত নিম্নের হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

"কেয়ামতের দিন কোরআন পাঠকারীগণকে বলা হবে, পাঠ করতে করতে ঊর্ধ্বে গমন করতে থাক। দুনিয়াতে যেমন করতে, তেমনিভাবে বিশুদ্ধ ও তারতীলের সাথে কোরআন পাঠ কর। তোমর মনজিল সেখানে, যেখানে তুমি শেষ আয়াত পাঠ করে থামবে।"

এ হাদীসে জানা গেল যে, বেশি বেশি কোরআন পাঠকারী এমন বেহেশতী যত আয়াত পাঠ করবে, সে পরিমাণ ঊর্ধ্বস্থানে সে গমন করতে পারবে। কোরআন মজীদের আয়াত সংখ্যা সর্বসম্মত মতে ছয় হাজার দু'শ'। ওয়াকফ ও আসলের স্থানসমূহ সম্পর্কে এখতেলাফ থাকার কারণে এ সংখ্যার চেয়ে যা কিছু বেশি হয়, সে সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। যা হোক এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে স্তর বা শ্রেণীর সংখ্যা হচ্ছে কোরআনে করীমের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমাণ। —ফাতহুল বারী।

বেহেশতের সুউচ্চ মহল

মহান আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন, " তাদের ধৈর্যধারণের প্রতিদান স্বরূপ জাঁকজমকপূর্ণ মনোরম মহল দেয়া হবে। আর (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) তাঁরা লাভ করবে শান্তিময় শুভেচ্ছা সম্ভাষণ। তাতে তাঁরা চিরকাল অবস্থান করবে। তা কতইনা উত্তম গন্তব্য ও আবাসস্থল।" —সূরা ফেরকান-২য় রুকু।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতীগন তাদের উপরিস্থিত মহলগুলোর অধিবাসীদের এমনভাবে অবলোকন করবে, যেমন তোমরা ভোরের আলো প্রকাশের পর পূর্ব কিংবা পশ্চিমাকাশের উজ্জ্বল তারকা দেখতে পাও। আর বেহেশতীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তাদের এসব

মহলের মধ্যেও শ্রেণী পার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বেহেশতীগণ এমন সুউচ্চ ও উন্নততর মহলে অবস্থান করবেন, সাধারণ বেহেশতীগণ যা বহু দূরে দৃশ্যমান তারকার ন্যায় দেখতে পাবে। সাহাবী (রা)গণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব মহল তো নবী রাসূলদের জন্য, যেখানে তাঁরা ছাড়া আর কেউ পৌঁছতে পারবে না। নবী করীম (সঃ) বললেন, যার আয়ত্তে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! নবী রাসূলগণ ছাড়াও অনেকেই এসব সুউচ্চ মহলের অধিকারী হবে, যারা আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ঈমান আনে এবং নবী রাসূলগণের সত্যারোপ করে।

—বোখারী, মুসলিম।

এসব সুউচ্চ মহলের মধ্যে মানগত অনেক পার্থক্য থাকেব। কেননা মহলের উপরও মহল হবে। নবী রাসূলগণের মহলগুলো হবে সর্বাপেক্ষা উন্নততর। সূরা ফোরকানের প্রথম দিকে সালেহীন ও মোত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষের দিকে সুউচ্চ মহল লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর সূরা যুমারেও মুত্তাকীগণের সুউচ্চ মহল লাভের কথা আলোচিত হয়েছে। অতএব এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, উচু দরজার লোকদেরই এসব মহল লাভের সৌভাগ্য হবে।

হযরত আবু মালেক আশআ'রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে এমন অনেক সুউচ্চ মহল রয়েছে, যেগুলো শিল্পকর্মে এত স্বচ্ছ যে, তার বাইরে থেকে ভেতর এবং ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআ'লা এগুলো তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যারা কোমল ভাষায় কথা বলে এবং অতিথি ও অভাবগ্রস্থদেরকে পানাহার করায়। অধিকাংশ সময় রোযা রাখে এবং রাতের শেষ ভাগে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে এরা তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। —শোয়াবুল ঈমান, বায়হাকী, মেশকাত।

বেহেশতের শিবির ও গম্বুজ

হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মুমিনদের জন্য এমন সব শিবির থাকবে, যা মস্তবড় এক মোতি দ্বারা নির্মিত, মোতিটি ভেতরের দিকে ফাঁকা থাকবে।এ শিবির দৈঘ্যে (আর এক বর্ণনায় প্রস্থে) ষাট মাইল ব্যাপি দীর্ঘ হবে। এর প্রত্যেক প্রান্তে থাকবে মোমীনদের জন্য নির্ধারিত সেবক ও স্ত্রীবৃন্দ। আর প্রান্তগুলোর দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এক প্রান্তে দাড়িয়ে অপর প্রান্তের কাউকে পরিদৃষ্ট হবে না। তাঁদের কাছে অপরাপর মোমীনগণ যাতায়াত করবে। অতঃপর রাসূল (সঃ) বলেন, তাঁদের জন্য এমন দু'টি পুষ্পোদ্যান থাকবে, যার সবকিছু হবে রৌপ্য নির্মিত। আরো দু'টি পুষ্পোদ্যান থাকবে স্বর্ণের, যার অভ্যন্তরের সব কিছুই হবে স্বর্ণ নির্মিত।

—বোখারী, মুসলিম।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, নিম্নস্তরের বেহেশতী হবে সে, যার আশি হাজার সেবক এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তাঁকে এমন এক গম্বুজ বা মিনার দেয়া হবে, যা বহু মোতি এবং যবরযদ ও ইয়াকুত পাথরে নির্মিত। এসব গম্বুজের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ব্যবধান হবে যাবীয়া হতে সানায়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।

বেহেশতী মৌসুম

মহান আল্লাহ পাক ঘেষণা করেন, "ঈমানের প্রতি অটলতা এবং ধৈর্য ধারনের প্রতিদান স্বরূপ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পুষ্পোদ্যান ও রেশমী পোশাক প্রদান করবেন। সেখানে তারা তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা থাকবে, আর গরম ও শীত বলতে তারা কিছুই অনুভব করবে না।

—সূরা দাহার-২য়রুকু।

তাফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যায় লিখেন, বেহেশতে ঠাণ্ডা ও গরম কিছুই থাকবে না। সেখানকার আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ্ণ। এরপর লিখেন, নিঃসন্দেহে বেহেশত নিজেই দীপ্তিময়, স্বীয় প্রতিপালকের নূরের আলোয় আলোকিত। আলোর জন্য সেখানে চাঁদ সুরুযের কোন প্রয়োজন নেই।

অনন্তর তিনি ইমাম বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে শোয়ায়েব ইবনে জায়হানের বর্ণনা উল্লেখ করেন, শোয়ায়েব বলেন, আমি এবং আবুল আলিয়াহ (র) ফজর নামাযান্তে সূর্যোদয়ের পূর্বে জনপদ থেকে বের হলাম। তখনকার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে হযরত আবুল আ'লিয়াহ (র) বললেন, এখনকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে হৃদয়কাড়া নাতিশীতোষ্ণ ও আলোছায়ার যে পরিবেশ বিরাজমান, বেহেশতের ব্যাপারেও এরূপ পরিবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। একথা বলে আবুল আলিয়াহ (র) কোরআন মজীদের وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াত পাঠ করলেন।

তাফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার লিখেন, আবুল আলিয়া (রঃ) বেহেশতের পরিবেশকে প্রভাতকালীন আলোর সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করে প্রকৃত আলোর সাথে তুলনা করেননি। কেননা প্রভাতের আলোর সাথে আঁধারেরও সংমিশ্রণ থাকে। সুতরাং তাঁর কথার মর্মার্থ হচ্ছে, প্রভাতকালীন আলো যেভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে বেহেশতের আলোও চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকবে।

তবে কথা হল, এখানে যে সাদৃশ্য দেখান হয়েছে, তা প্রভাতকালীন সময়ের সাথে দেখান হয়েছে, প্রভাতের আলোর সাথে নয়। সুতরাং আবুল আলিয়ার বক্তব্যর মর্মার্থ হল, প্রভাত কালের পরিবেশ যেরূপ উপভোগ্য থাকে এবং প্রাণ জুড়ান সমিরণ প্রবাহিত হয়ে হৃদয় মনকে প্রফুল্ল করে তোলে, চতুর্দিকে কেবল উজ্জ্বলতর ছায়াই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তার আলো এতটা তীক্ষ্ণ হয় না যে, তাতে

চোখ ঝলসে যায়। তেমনিভাবে বেহেশতেও সর্বদা ছায়া বিরাজ করবে, সেখানকার পরিবেশ সৌন্দর্য সংযত উপভোগ্য, সর্বপরি সেখানে বিস্ময়কর এক মোহাবিষ্টকর সৌম প্রকৃতি বিরাজ করবে। আলোতে কোন গরম উত্তাপ থাকবে না, তা যতই প্রখর হোকনা কেন তাতে ছায়ারও অবসান ঘটবে না, দৃষ্টিকেও ব্যাহত করবে না।

আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন, "মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্য যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তার প্রকৃতি হচ্ছে, অট্টালিকা ও বৃক্ষরাজীর তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, আর ফলফলারি এবং ছায়াও থাকবে সার্বক্ষণিক। — সূরা রায়দ-৫ম রুকু।

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হল যে, বেহেশতে সর্বদা ছায়াসম্পন্ন পরিবেশ বিরাজ করবে। পবিত্র কোরআন মজীদের সূরা নেসায় বেহেশতের ছায়াকে ظِلًّا ظَلِيْلًا নিবিড় ছায়াঘন ছায়া বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অতি সত্বর আমি তাদের এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে থাকবে স্রোতস্বিনিসমূহ সদা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আর তাদের জন্য থাকবে পুতঃপবিত্র স্ত্রীগণ। আমি তাদেরকে ঘনছায়াঘেরা বেহেশতে প্রবেশ করাব।"

—সূরা নিসা-৮মরুকু।

আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) ظِلًّا ظَلِيْلًا -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এমন ছায়া, যা হবে প্রগাড় ও শোভাময়।

বেহেশতে রয়েছে কেবল আরাম আর আরাম, সেখানে অবসাদ ও দুর্ভোগের কিছু নেই

আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতকে করেছেন সর্বদিক দিয়ে সুখ ও শান্তিময়। সেখানে নেই পরিশ্রম-ক্লান্তি, শোক, দুঃখ-বেদনা এবং নেই কোন কিছুর অভাব। আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেছেন ঃ

"বেহেশতীগণ বলবে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার জন্যই, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বেদনা অপসারিত করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক মহা প্রদাতা ও যথার্থ নিরুপণকারী। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে এমন এক আবাসালয় দিয়েছেন যেখানে দুঃখ-বেদনা আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না, আর স্পর্শ করতে পারে না কোন অবসাদ।"

—সূরা ফাতির-৪র্থ রুকু।

তাফসীরে ময়ালীমুত তানযীলের গ্রন্থকার লিখেছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে প্রবেশের পর উপরোক্ত কথাগুলো বলবেন। আল্লাহ আমাদের দুঃখ-বেদনা অপসারিত করেছেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্টের যেসব উপসর্গ ও কার্যকারণ থাকে, তার কোনটিই বেহেশতে নেই। কখনো

অসন্তুষ্ট হওয়ার মত কোন কথা এবং দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় পতিত হওয়ার মত কোন বিষয় থাকবে না। দুঃখ কষ্টের সম্ভাব্য সবধরনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আজ না আছে ভূসম্পত্তির চিন্তা, না আছে রুজি রোজগারের ধান্দা। না আছে মৃত্যুর ভয়, না আছে বার্ধক্যের আশংকা। না আছে রোগব্যাধি, না আছে অর্থ ব্যয়। সম্মুখে নেই কোন কবর, নেই কোন হাশর ময়দানের ভয়। নেই অশুভ পরিণতির আশংকা, নেই নেয়ামত বিলুপ্তির ভয়। দুনিয়া সুসজ্জিত করার নেই কোন ব্যস্ততা, পরকালের উন্নতির জন্য এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হওয়ার নেই কোন নির্দেশ। সুতরাং সবদিক দিয়ে, দুশ্চিন্তা মুক্ত শান্তি আর শান্তি। দুনিয়া ও পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট যে ভয় ভীতি চিন্তা অস্থিরতার উপসর্গ ও কার্যকারণ ছিল, তা সবই পেছনে ফেলে চিরস্থায়ী বাসস্থানে চলে এসেছে। যেখানে নেই কোন বিপদাপদ, নেই কোন সময়, নেই কোন পরিশ্রম ও কষ্ট। এমন স্থানকেই তো দারুল মাকামা বা আবাসালয় বলা চলে। যেখান থেকে তারা কখনো বের হবে না এবং বের হওয়ার ইচ্ছাও জাগবে না, কেউ বের করবেও না। প্রত্যেকেই হবে ইজ্জত ও মহা সম্মানের অধিকারী। সেখানে রয়েছে বিনা পরিশ্রমে পরিপূর্ণ বিলাসিতা ও অফুরন্ত নেয়ামত।

বেহেশতীদের আলোচনা বৈঠক

বেহেশতীগণ পরস্পরে মনের সুখে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "অনন্তর (তারা যখন একত্রিত হবে) তখন একে অপরের প্রতি মনোনিবেশ করে কথোপকথন করবে। একজন বলবে, পার্থিব জীবনে আমার এক সাথী ছিল। সে (বিস্ময় প্রকাশ করে) আমাকে বলত, তুমি তো কেয়ামতে বিশ্বাসীদের একজন, মৃত্যুর পর আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব, কেবলমাত্র আমাদের হাড় অবশিষ্ট থাকবে, তখন কি তুমি তোমার কর্মের প্রতিদান প্রাপ্ত হবে"? —সূরা সাফফাত ২য় রুকু।

এর পর ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاۤءِ الْجَحِيْمِ *

"অতঃপর সে বেহেশতী স্বীয় সাথীদেরকে বলবে, তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? অনন্তর তারা জাহান্নামে উঁকি মেরে জাহান্নামের মধ্যস্থানে তাকে দেখতে পাবে।" —সূরা সাফফাত-২য় রুকু।

বেহেশতী ব্যক্তি তার দুনিয়ার সাথীকে জাহান্নামের ভেতরে দেখে আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সে বলবে ঃ "আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছিলে, আমার প্রতি বিশ্ব প্রভুর অনুগ্রহ না হলে অবশ্যই আমি তোমার মত জাহান্নামীদের মধ্যে গন্য হতাম।

—সূরা সাফফাত-২য় রুকু।

বেহেশতীদের পারস্পরিক কথাবার্তা সম্পর্কে সূরা তুরে আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তারা একে অপরের দিকে ফিরে কথোপকথন করবে। তারা বলবে, এর পূর্বে আমরা জাগতিক ঘরবাড়িতে বসবাস করতাম এবং পরলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে খুব ভয় পেতাম। সুতরাং মহান আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি এহসান করেছেন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। এর পূর্বে আমরা অনুগ্রহ প্রার্থনা করতাম, বাস্তবিকই আল্লাহ তাআ'লা মহা উপকারী ও দয়ালু।"

—সূরা তুর-১ম রুকু।

বেহেশতীদের পারস্পরিক সালাম সম্ভাষণ

বেহেশতীগণ পরস্পর দেখা সাক্ষাতে একে অপরে সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানাবেন। আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেন ঃ "যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, তাঁদের প্রতিপালক বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাদেরকে নেয়ামতপূর্ণ বেহেশতে পৌঁছে দেবেন, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবাহিত। (বেহেশতে প্রবেশ করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে) সে বলবে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ "হে আল্লাহ! আপনি পুতঃ পবিত্র।" (বেহেশত কতইনা নেয়ামতপূর্ণ ও সুন্দর স্থান। অতঃপর সেখানে একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাত করবে।) এবং (আস্‌সালামু আ'লাইকুম বলে) সালাম সম্ভাষণ জানাবে আর পার্থিব নানাবিধ মুসীবতের স্মৃতিচারণ করে তার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা বিচার শেষে) তাদের বিবৃতি হবে– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআ'লার জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।"

—সূরা ইউনুস–২য় রুকু।

উপরোক্ত অনুবাদ তাফসীরে বয়ানুল কোরআনের আলোকে করা হয়েছে। তাফসীরে মুয়ালেমুত্ তানযীলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, বেহেশতীগণ যখন কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন বলবে, সুবহানাকাল্লাহুম্মা। একথা শুনে তাদের সেবকগণ দস্তরখানায় খাবার পরিবেশন করবে, পানাহার শেষে তারা বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

"সমস্ত প্রশংসা পরওয়ার দেগারে আ'লমের জন্য।"

وَتَحِيَّتُهُمْ سَلَامٌ-এর ব্যাখ্যায় লেখেন, বেহেশতীগণ পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সময় একে অপরকে সালাম সম্ভাষণ জানাবেন। একথাও লিখেছেন, ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম জানাবেন। আর এও লেখেন যে, ফেরেশতাগণ তাঁদের কাছে আল্লাহ তাআ'লার সালাম পৌঁছে দেবেন। এ তিন ভাবেই এর ব্যাখ্যা হতে পারে। মোফাসসীর ইবনে কাছীর (র) ইবনে জারীর থেকে বর্ণনা করেন, বেহেশতীদের পাশ দিয়ে যখন কোন পাখী উড়ে যাবে, তাঁরা তখন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলবেন। অমনি ফেরেশতাগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী পাখী

নিয়ে সমুপস্থিত হবেন এবং সালাম করবেন। তারাও সালামের প্রত্যুত্তর দেবেন। تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ আয়াতে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আর বেহেশতীগণ আহার শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবেন। যা وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এ ব্যক্ত হয়েছে।

এরপর আল্লামা ইবনে কাছীর লেখেন, সুফিয়ান সওরী (র) বলেছেন, বেহেশতীগণ কোন কিছু পেতে চাইলে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বলবেন, আর তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে তা উপস্থিত বা পরিবেশিত হবে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ইবনে জারীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে পাখীর কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে উদাহরণ বিশেষ। কেননা বেহেশতীগণ প্রত্যেক বস্তু লাভের ইচ্ছা প্রকাশেই সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলবেন। আর যে বলেছেন– ফেরেশতারা পাখী নিয়ে উপস্থিত হবেন, তা সবসময়ে নয় বরং বিশেষ বিশেষ সময়ে হবে। কেননা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে আছে, পাখী নিজেই বেহেশতীগণের সামনে এসে পরিবেশিত হবে।

বেহেশতের পূর্ণ অবস্থা দুনিয়াতে বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়

শুনে ও পাঠ করে বেহেশত সম্পর্কে যা কিছু বোধগম্য হয়, সেখানে প্রবেশের পর তার চেয়ে বহুগুণে বেশি পাওয়া যাবে। প্রথমত এ কারণে যে, কোরআন-হাদীসে বেহেশতের নেয়ামত সমূহের যে আলোচনা বিদ্যামন, তাছাড়াও সেখানে আরো অনেক বেশি থাকবে। দ্বিতীয়ত, কোন জিনিস স্বচক্ষে দেখে এবং ব্যবহারের পর যে বাস্তব উপলব্ধি অর্জিত হয়, শুধু শুনে বা বই পাঠ করে তা হয় না। সুতরাং এ দুনিয়ায় বসে বেহেশতী নেয়ামতসমূহের আসল তত্ত্ব উদঘাটন সম্ভব নয়।

হযরত আবু হোরায়ারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন এমন বিষয় তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, এমনকি কেউ তা কল্পনাও করেনি।" অতঃপর নবী করীম (সঃ) বলেন, কোরআন দ্বারা যদি এটা প্রমাণ করতে চাও, তাহলে এ আয়াত পাঠ কর ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ *

"বেহেশতীদের নয়ন জুড়ানোর জন্য যা গোপন রাখা হয়েছে, তা কেউ জানে না।"
—বোখারী, মুসলিম।

মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত আর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবৃত করা শেষে বলেন, বেহেশতীদের জন্য এমন কিছু নেয়ামত রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করেননি। অর্থাৎ কোরআন হাদীসের মাধ্যমে বেহেশতের যে সব নেয়ামতের কথা বিবৃত হয়েছে, তাছাড়াও

যা থাকবে, তা হবে আরো বেশি। ইমাম নব্বী (রঃ) বলেন, এর অর্থ-তোমাদেরকে যা জানান হয়নি তা হবে আরো চমকপ্রদ।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতের এক কোরা সমান স্থান সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার চেয়ে অনেক উত্তম। —বোখারী, মুসলিম।

নবী করীম (সঃ) আরো বলেন, ধনুকের অর্ধাংশ পরিমাণ রাখতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন পড়ে, বেহেশতের ততটুকু স্থান পৃথিবীর সূর্য উদয়াস্তের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। —বোখারী, মুসলিম।

যানবাহন হতে অবতরণের সময় বাহন স্থীর রাখার জন্য সওয়ারী প্রথমে স্বীয় চাবুক মাটিতে ছুড়ে মারে। (অর্থাৎ প্রথমে খুটা গেড়ে নেয়।) আর পাঁয়ে চলা ব্যক্তি যখন বসে তখন প্রথমে তীর ধনুক (স্বীয় আসবাব পত্র) মাটিতে রেখে নেয়, তারপর আসন নেয়। নবী করীম (সঃ) বেহেশতের মর্যাদা ও মহত্ত্ব বুঝাবার জন্য এরশাদ করেন যে, বেহেশতের এতটুকু স্থান যাতে একটি চাবুক কিংবা ধনুকের অর্ধাংশ রাখা যায়, সমস্ত দুনিয়ার দৈর্ঘ্য প্রশস্থতা হতে অনেক উত্তম। যদিও বেহেশতের প্রশস্থতার তুলনায় সহস্র সহস্র দুনিয়া কিছুই নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, পার্থিব দ্রব্যাদির কোনটিই বেহেশতে নেই। কেবলমাত্র নামের সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। —বায়হাকী, আততারগীব।

অর্থাৎ বেহেশতী নেয়ামতসমূহের আলোচনায় যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মোতি, রেশম, গাছ-পালা, ফলমূল, আসন, কাপড় ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইহলৌকিক নয় বরং পারলৌকিক বিষয়। সে জগতের মান অনুসারেই তার সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। পার্থিব কোন কিছূই বেহেশতী বস্তুর সাথে তুলনীয় নয়।

বেহেশতের সুঘ্রাণ

বেহেশত সুঘ্রাণে পরিপূর্ণ। সে সুঘ্রাণের প্রকৃত অবস্থা ও গুণাগুণ এ দুনিয়ায় বসে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সেখানকার সুঘ্রাণ অতুলনীয়, প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠতর ও সুতীব্র সুগন্দিময়।

এক হাদীসে আছে, বেহেশতের সুঘ্রাণ শত বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে। অন্য এক হাদীসে এর চেয়ে কম বেশি দূরত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মুফাস্‌সিরগণ লিখেন, দূরত্বের কম-বেশি হওয়া বেহেশতীদের শ্রেণী ও মর্যাদার ব্যবধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

বেহেশতের প্রস্তুতি গ্রহণের কেউ আছে কি?

এ যাবত আমরা বেহেশতবাসীও বেহেশতের নেয়ামতসমূহের বিবরণ সম্পর্কে মোটামুটি অবগত হলাম। সেখানে সবারই যেতে ও থাকতে মনে চায়। তার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনাও করে থাকি।

প্রত্যেক মুসলমানেরই তা পাওয়ার প্রত্যাশা ও ব্যাকুলতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও ব্যকুলতার সাথে সাথে নেক আমলের পুঁজিও অর্জন করা চাই। বেহেশত প্রত্যাশী কখনো নেক আমলহীন হতে পারে না। যারা বেহেশতের আশা করে, কিন্তু পাপের কাজ থেকে বিরত থাকে না, এবং নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করে না, তারা নির্বোধ ছাড়া কিছুই নয়। কোরআন মজীদের ঘোষণা দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআ'লা বেহেশতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। সুতরাং মুমিন বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে শরীয়তের দাবী পূরণে জান ও মাল নিয়োজিত করে বেহেশত লাভের উপযুক্ততা অর্জন করা। আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ *

"বেহেশত প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আল্লাহ তাআ'লা মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।"

অথচ আমাদের অবস্থা হচ্ছে, মুয়াজ্জিনের আযান হলে আমরা নিদ্রায় পড়ে থাকি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততায় নামায ছেড়ে দেই। যাকাত ফরয হলে নানা অজুহাত এনে দাঁড় করাই। রমযানের রোজা এলে দিনের বেলা পানাহার করি। হজ্জ ফরয হলে সম্পদ ব্যায়ের ভয়ে হজ্জ না করেই কবরে চলে যাই। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ে হারাম হালালের সমান্যতম খেয়ালও করি না। অপরের অর্থ সম্পদ লুটপাট করা ও মেরে দেয়া বড় বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। কোরআন হাদীস পড়া ও পড়ান লজ্জাজনক ও অর্থ হীন মনে করি। দুর্বলদের প্রতি জুলুম জরি। গরীব ও মেহনতী মানুষকে অতিরিক্ত খাটিয়ে যথার্থ পারিশ্রমিক দেই না। সুদের লেন-দেন না করা নির্বোধের কাজ মনে করি। এতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে হরণ করি এবং মিরাসী সম্পদ সঠিক নিয়মে বন্টন করি না। নফল আদায় সময়ের অপচয় মনে করি এবং আল্লাহর স্মরণ হতে দূরে সরে থাকি। এরপরও আমরা বেহেশত লাভের উচ্চাশা পোষণ করি। এটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়, শরীয়তের বিধান পালনে মনের অনিচ্ছা চেঁপে রাখতে হয়। হাদীসে আছে,

حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ *

"প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নাম, আর মনের অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারা বেহেশতকে পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে।" —মুসলিম, মেশকাত।

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, এবাদতে কষ্ট স্বীকার করা, সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তাআ'লার বিধানের অনুগত থাকা এবং হারাম বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, এসবই মনের ভাল না লাগা বিষয়। এ ভাল নালাগার পেছনেই রয়েছে বেহেশত। প্রবৃত্তির এ অপছন্দকে মেনে নিতে পারলেই বেহেশত লাভের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে যে প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে, হালাল-হারামের ব্যাপারে যে বাছ বিচার করে না; তার কামনা-বাসনা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে।

আর এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, "সচেতন ব্যক্তি সে-ই, যে তার নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং পারলৌকিক জীবনের জন্য সৎকর্ম করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে সময় ক্ষেপণ করে এবং নেক আমল না করে আল্লাহ তাআ'লার কাছে কিছু পাওয়ার দুরাশা পোষণ করে।

—তিরমিযী, মেশকাত।

যার মনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং বেহেশত লাভের আশা রয়েছে, সে কখনো পরকালের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে পারে না। সে কখনো বেহেশতের বিপরীতে জান ও মালকে মহব্বত করতে পারে না। সে নেক আমল যতই করুক না কেন তা খুবই স্বল্প মনে করে, আর পরকালের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ফরয ও নফল এবাদতে মশগুল থাকে। আসলে আমাদের পরকালীন জীবনের জন্য আদৌ কোন চিন্তা ভাবনা নেই। বেহেশত এক মহা মূল্যবান বিষয় একথার প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে এবাদত বন্দেগীতে কার্পণ্য করা খুবই নির্বুদ্ধিতার কাজ।

রাসূল (সঃ) বলেন, জাহান্নামের মত এমন কোন জিনিস আমি দেখিনি, যা থেকে পরিত্রাণকামী ঘুমিয়ে থাকে, তেমনিভাবে বেহেশতের মত মহামূল্যবান কোন বস্তুও আমি দেখিনি যার অন্বেষণকারী নিদ্রায় বিভোর থাকে।

—তিরমিযী।

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে– জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট, জালা-যন্ত্রণা সম্পর্কে আন্তরিক বিশ্বাস পোষণ সত্ত্বেও জাহান্নামে যাওয়ার কাজই করতে থাকে। আর বেহেশতের নেয়ামত প্রত্যাশী অলসতায় বিভোর থাকে এবং সৎ কর্মের চিন্তা-ভাবনা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। এটা বাস্তবিকই দুঃখজনক ও বিস্ময়কর ব্যাপার। এ জগতে এমন বহু লোকও রয়েছে, যারা অলসতার কারণে দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয়। নিজের আকাংক্ষিত বিষয়গুলো থেকে হয় বঞ্চিত। কিন্তু জাহান্নাম মুক্তিপ্রার্থী অলসতায় লিপ্ত আর বেহেশতপ্রার্থী হেলায় ফেলায় জীবন অতিবাহিত করা বাস্তবিকই অনুশোচনার ব্যাপার।

এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে এক ভ্রমণের স্থান বিশেষ। যার সর্বশেষ গন্তব্যস্থান হচ্ছে মুমিনের জন্য বেহেশত। তবে বেহেশত লাভের জন্য চাই মেহনত ও ত্যাগ স্বীকার। কেননা যা যত মূল্যবান; তা পেতেও প্রয়োজন হয় সেরূপ কঠোর সাধনার।

হাদীসে আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন, যার ভ্রমণে দূরত্ব ও দূর্গম পথের আশংকা থাকে, সে দিনের শুরুতেই যাত্রা শুরু করে। আর যে সত্বর যাত্রা শুরু করে, সে ঠিকই মনজিলে মক্‌সূদে গিয়ে উপনীত হয়। সাবধান! আল্লাহর পণ্যের মূল্য খুবই চড়া, সাবধান! সে পণ্য হচ্ছে বেহেশত (আর তার ক্রেতা হচ্ছে আল্লাহর বান্দাগণ)। —তিরমিযী, মেশকাত।

কারো যখন প্রয়োজনীয় কোন সফরে যেতে হয়, তখন সে অনেক আগে ভাগেই যাত্রা শুরু করে। আরাম-আয়েশ বর্জন করে হলেও যথা সময়ে এমনকি তারও আগে গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপনীত হয়। সুতরাং পরকালের যাত্রীকেও এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। নফসের আনুগত্য না করে বরং তাকে শরীয়তের বিধান পালনে বাধ্য করে পরকালীন যাত্রাকে সাফল্য মণ্ডিত করা প্রয়োজন। যাতে মহামূল্য বেহেশত হাত ছাড়া না হয়। পার্থিব আসবাবপত্র ও গাড়ী -বাড়ী গড়তে কতইনা অর্থ ব্যয় হয়, কতইনা যৌবন চলে যায়। এ জন্য কত স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ট জীবনের ঘটে দুঃখজনক অবসান। একজন মহিলাকে বিয়ে করতে কত ধরনের আনুষ্ঠানিক কষ্ট স্বীকার এবং কত অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং তুচ্ছ এ দুনিয়ার জন্যই যখন ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য-যৌবন ও মূল্যবান সময় বিনষ্ট করতে হয়, বড় বড় জীবন বিধ্বংসী কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত হতে হয়। অথচ এ পার্থিব জগৎ হচ্ছে ধ্বংসশীল, আর তা ছেড়ে যেতেই হবে। অতএব বেহেশতের ন্যায় উৎকৃষ্টতর চিরস্থায়ী নিবাস এবং সেখানকার নেয়ামতরাজি ও ভোগ-বিলস অর্জনের নিমিত্তে আরো অধিক পরিমাণে দৈহিক ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার এবং দৃঢ় ও কঠোর পরিশ্রম করা অত্যাবশ্যক। মহান আল্লাহ তাআ'লা বেহেশত লাভের জন্য আমাদেরকে সবধরনের প্রতিকুলতা জয় করে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং জান ও মাল ব্যয় করার যোগ্যতা প্রদান করুন।

পরিশেষে আমাদের আরযী, সকল প্রশংসা সারা জাহানের পালন কর্তা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এ গ্রন্থের সমাপ্তিলগ্নে তাঁর সমীপে অধমের আরো আকুতি- তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের পিতা-মাতা, উস্তাদ মাশায়েখ এবং সকল মুসলমান নরনারীকে বেহেশত নসীব করেন। আর এ ক্ষুদ্র লেখাকে কবুল করেন। আমিন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত